শিশমহল

সায়ন্তনী পূততুন্ড

‘নজ়ারে নে ভি কাম কিয়া ওয়াঁ নকাব কা
মস্তি সে হর নিগাহ্ তেরে রুখ্ পর বিখর্ গয়ে’
—মির্জ়া গালিব

এখানকার নিসর্গ দেখলে অবিকল একই মনোভাব হয় দর্শকের। সবুজাভ জলের টলটলে লেক। ঠিক তার উপরেই অদ্ভুত রঙের জলছবি! কোনও খামখেয়ালি চিত্রশিল্পী যেন মনের আনন্দে একের পর এক রঙের পোঁচ মেরে গেছেন ক্যানভাসে! হালকা সবুজ রঙের জলাশয়টিকে ঘিরে দু’দিক থেকে নেমে এসেছে ঘন সবুজের ঢল, ঘন সবুজ পাহাড়। দু’দিকে পাহাড়ের গায়ে

পাইনবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন সুষ্টুমি করে লাগিয়ে দিচ্ছে হালকা সোনালির ছোঁয়া। মনে হয়, দু'দিক থেকে একচাল সবুজ ভেলভেটের পরদা নেমে এসেছে লেকের দু'ধারে।

কিন্তু দু'দিকের সবুজের মাঝে অনাহত গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধ্যানগম্ভীর বরফে ঢাকা ধবধবে সাদা পর্বত। তার নীল শিরা উপশিরায় সূর্যালোকে রুপোলি রং ধরেছে। সবুজের যত চাপল্য, যত মুখরতা, সব স্থির হয়ে গিয়েছে মধ্যবর্তী তুষারাবৃত শৃঙ্গের গাম্ভীর্যে এসে। ঘন নীল আকাশকে পশ্চাৎপট করে গগনচুম্বী অহংকারে দাঁড়িয়ে আছেন গিরিরাজ। পাতলা-পাতলা সাদা পশমিনা মেঘ তার উদাসীন বুকে ছায়া ফেলে উড়ে-উড়ে যায়। আচমকা দেখলে মনে হয়, এই বুঝি উত্তুঙ্গ হিমগিরি থেকে নেমে এলেন কৈলাসবাসীরা। এই দৃশ্যের দিকে চোখ পড়লে বুক দুরুদুরু করে।

এই জন্যই একে ভূস্বর্গ নাম দেওয়া হয়েছে। মৌন-মুখরতায়, চাপল্যে-গাম্ভীর্যে অপরূপ কাশ্মীর। আর সেই কাশ্মীরেরই হৃদয় শ্রীনগর। রাজধানী শ্রীনগর। পিঙ্গল সবুজাভ জল সব সময়ই দাঁড়ের ঘায়ে খলখল করে হেসে উঠছে। বিখ্যাত ডাল লেককে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে বর্ণবহুল শিকারারা। যেন রঙিন প্রান্তসীমা এঁকে দিয়েছে। ডাল লেকের জল স্থির হওয়ার সময় পায় না। প্রচুর শিকারার অবাধ জল কেটে এগিয়ে যাওয়ার তালে তালে সেও যেন ছলাৎ-ছলাৎ করে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতে চায়। তার মধ্যেই শিকারার 'নাইয়া'দের সুরেলা কথোপকথন। দুই শিকারার নেয়ের দেখা হলেই শুরু হয় কাশ্মীরি বা পঞ্জাবি ভাষায় ব্যাখ্যালাপ। একজন হেঁকে আর একজনকে কাশ্মীরিতে বলে, "শু-খা থি-ক্ পঠ-অ?" অর্থাৎ, 'ভাল আছ?' অন্যজন হেসে মাথা নেড়ে কুশলবার্তা জানায়। চিলচিৎকার করে প্রতিপ্রশ্ন করে, "থি-ক পঠ। ও-ওয়াড়েছা সলিম থি-ক পঠ-অ?" 'বাড়িতে সব ভাল তো?'

অথবা কেউ পঞ্জাবিতে বলে, "কোথায় যাচ্ছ দাদা?"

যাকে প্রশ্ন করা হল সে হয়তো 'গর্মদিমাগ'। বেচারির রোজগারপাতি তেমন ভাল হয়নি। খেপে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "নরকে যাচ্ছি। সঙ্গে যাবি?"

প্রশ্নকর্তা হাসতে হাসতে হাত নাড়ে। ফিচলেমি মেরে উত্তর দেয়, "নু কোই মেরে পিয়ারে। হনা তুহানু ইকালে ভারানু যাড়া। মৈ চলি ইয়া পজাহা সাল বাদ তুহাড়ে নাল হোভোগা। ফির তক্ মৈনু মেরে সভারাগা দা আনাড় হৈ।"

বোঝো। বলে কী লোকটা। 'এখন বাপু তুমি একাই যাও। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর তোমার সঙ্গে নরকে দেখা করব। আপাতত আমি আমার স্বর্গেই মহানন্দে আছি।'

অন্য লোকটি দাঁত বিড়মিড় করতে করতে গালাগালি দেয়, "শালা মুরাখ। শৈ-দে-টর্কৈ।"

এমনই কখনও কাশ্মীরি, কখনও পঞ্জাবি ভাষায় সরগরম থাকে ডাল লেক। দুটো ভাষার কোনওটাই বোধহয় আস্তে বলা যায় না। অথবা আস্তে বলার নিয়ম নেই। শিকারার মেয়েদের জীবনে একটাই বিনোদন। একে অন্যের পিছনে কাঠি করা। তাই ডাল লেকে তারস্বরে চলতে থাকে কথোপকথন। তার মধ্যেই পর্যটকেরা মীনাবাজারে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন খরিদ্দারিতে। উচ্চকণ্ঠে দরাদরি চলে। এখানে জলের মধ্যেই প্রকাণ্ড হাট-বাজার বসে পড়েছে। ডাল লেকের মধ্যেই ঝাঁ চকচকে সব দোকান। সেখানে কাশ্মীরি শাল থেকে শুরু করে কেশর, পেস্তা, আখরোট সবই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় দুর্লভ মোনাক্কাও। জাতে মোনাক্কা কিসমিসের বড় ভাই, তবে দানাওয়ালা। রক্তাল্পতার রোগীরা দুধে এই দানাওয়ালা ফলটিকে ভিজিয়ে খান। সে জন্য মোনাক্কার দাম আকাশছোঁওয়া। আর কেশরের কথা না বলাই ভাল। কাশ্মীরি কেশর একচিমটি কিনতে গিয়ে ট্যুরিস্টের প্রায় ফতুর হওয়ার দশা। বাঃ, কাশ্মীরি কেশর যেমন-তেমন জিনিস নাকি? এমন রাজকীয় বস্তুটি কিনতে হলে গাঁটের কড়ি গচ্চা তো দিতেই হবেই।

এত আলো, এত শব্দ থেকে একটু দূরেই নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিশমহল। জায়গাটা ঠিক মূল ডাল লেকের উপরে নয়। অন্তত ডাল লেক বললে যে-দৃশ্য মনে পড়ে সে দৃশ্যের সঙ্গে শিশমহলের কোনও মিল নেই। তাই অনেকেই এই জায়গাটাকে ডাল লেকের এক্সটেনশন বলে অভিহিত করে থাকেন। মীনাবাজার থেকে একটু ভিতরের দিকে বাঁক নিলেই পরিবর্তনটা চোখে ধরা পড়বে। দু'একটা হাউসবোট ছাড়ানোর পরেই দেখা যাবে ডাল লেকের জল ঘোলাটে রং ধরছে। আশেপাশে জলজ গুল্ম, লম্বা-লম্বা ঘাসবনের উপস্থিতি এবং ঘন বাঁশবন দেখলে মনে হয়, এ আসলে ভূস্বর্গের ডাল লেক নয়, বরং তার পিছনে লুকিয়ে থাকা অন্য এক নারকীয় দুনিয়া। ঝলমলে সবুজাভ স্বচ্ছ জল এখানে বিনি-বিনি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন। নোংরা জলের উপরেই গড়ে উঠেছে সার-সার কাঠের বাড়ির কলোনি। বর্জ্যপদার্থের উৎকট গন্ধে, খাবারের উচ্ছিষ্টে এবং রান্নার ধোঁয়ায় জলমহল এখানে দূষিত।

যুদ্ধের সময় বহু উদ্বাস্তু পরিবার পালিয়ে চলে এসেছিল এখানে। তাদের মধ্যে যেমন পঞ্জাবি শিখ পরিবার আছে, হিন্দু পরিবার আছে, তেমন আছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও। তাদের অনেকেই কোনওভাবে রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করে থিতু হয়েছে কাশ্মীরের নানা জায়গায়। যারা ভাগ্যবান তারা কাশ্মীরের মাটিতে স্থান পায়। যাদের কপালে মাটি জোটেনি তারা জলেই বাসা বাঁধে। আবার পঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশ থেকে বহু দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী এখানে এসে সংসার পেতেছে। পাশাপাশি ১৯৪৭-এর ভারত-পাকিস্তান পার্টিশন থেকে শুরু করে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর ইন্দো-পাক যুদ্ধ, ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধে বহু মানুষ গৃহহীন হয়েছে। ওদিকে রাজায়-রাজায় যুদ্ধ চলছে, আর এদিকে উলুখাগড়াদের ঘর জ্বলছে। সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধগুলিতে। বহু নিরপরাধ মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সীমান্ত। ভারতীয় আর্মির সহায়তায় যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল, সেই সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলো একবস্ত্রে চলে গিয়েছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায়। তার মধ্যে শ্রীনগরের শিশমহলও রয়েছে। শিশমহলের বেশির ভাগ বাসিন্দাই তাই দরিদ্র। অথবা হয়তো দরিদ্র বলেই তাদের ঠাঁই হয়েছে শিশমহলে। জলের উপরেই গড়ে উঠেছে তথাকথিত উলুখাগড়াদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

এই শিশমহলেরই এক ক্ষুদে বাসিন্দা, কনোয়ালজিৎ শেরগিল... বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে কন্নু তার কাঠের বাড়ির বারান্দায় বসে পা দোলাচ্ছিল। এখন তার স্কুলে যাওয়ার সময়। মা বলেছে, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে। কিন্তু কন্নুর সেদিকে মন নেই। সে বারান্দায় বসে জলের দিকে তাকিয়েছিল। কচুরিপানা ভরতি জলে তার পায়ের আঙুলগুলো বিলি কাটছে। আফসানা চাচির পোষা হাঁসগুলো এখনই প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে জলে সাঁতরাতে নামবে। দুধসাদা মা হাঁসটা আগে আগে যাবে। পিছন-পিছন ছোটা হলুদ রঙের খুদকুড়ি ছানারা লেজ দুলিয়ে-দুলিয়ে লাইন করে সাঁতার কাটবে। তাদের চলার ভঙ্গিটা দেখে হাসি পেয়ে যায়। একবার এদিকে হেলে পড়ে, আর একবার ওদিকে। কন্নুর জন্য বাবা যেমন হলদে ক্যাম্বিস বল কিনে আনে, হাঁসের ছানাগুলো অবিকল তেমন দেখতে। যেন একগাদা ক্যাম্বিস বল জলের উপরে প্যারেড করতে-করতে যাচ্ছে।

রান্নাঘরে তখন ফ্যাচফোঁচ শব্দ। কন্নুর মা গুরপ্রীত রান্না করছে। অবশ্য ওদের রান্নায় তেমন বাহুল্য নেই। নিতান্তই সাদামাঠা শাক-ভাত। মাংস তো দূর, মাছও বড্ড দামি। তাই ওরা খেতে পারে না। মাছ-মাংস একমাত্র কোনও বড় ধরনের অনুষ্ঠান হলে তবেই বাড়ি ঢোকে। এখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় বেশি হলেও বড়া গোশ্ত বা বিফ খায় না। সরকার এখানে গোরুর মাংস নিষিদ্ধ করেছে। জম্মুর কাটরায় রয়েছেন বৈষ্ণোদেবী। এখানে শঙ্করাচার্য, অমরনাথ। অতএব গো-মাতাকে বধ করা যাবে না।

কন্নুর মনটা বেশ খুশি খুশি। কয়েকদিন পরেই ওর দিদি যসপিন্দর, বা যসসির 'খশুর', অর্থাৎ বিয়ে হবে। সেই উপলক্ষে পেট পুরে মাছ-

http://boierpathshala.blogspot.com

মাংস খাওয়া যাবে। ভেড়ার মাংস খেতে খুব ভাল। এর আগে কন্নু একবারই খেয়েছে। কী দারুণ খেতে! ভাবতেই জিভে জল চলে এল।

মাংসের কথা ভাবতে-ভাবতেই বোধহয় কন্নু একবার ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নেয়। আরও কিছু হয়তো ভাবতে যাচ্ছিল। তার আগেই রান্নাঘর থেকে মায়ের কড়া গলা শোনা গেল, "ক-ন্নু। এ-এ-এ কন্নু-উ-উ?"

কন্নু বিরক্ত হয়ে পিছন দিকে তাকায়। এখনই মা বকাবকি শুরু করবে। জিজ্ঞাসা করবে স্নান হয়েছে কিনা! তারপরই স্কুলে লেট হওয়ার ভয় দেখাবে।

"কি তুহানু ডি কিতা রয়ে হো? সকুল লাই দের্ চলে রা হানা?"

চিৎকার করে উত্তর দেয় কন্নু, "আউঁনা মা। এক মিনিট প্লিজ!"

এবার শুরপ্রীত রেগে যায়। এই ছেলেটাও যেন কী। কিছুতেই স্কুলে যাবে না। পড়াশোনায় একদম মন নেই। সর্বক্ষণ 'শিয়াতনিন্' (শয়তানি) করে বেড়াচ্ছে। কী যে ভাবে সবসময় কে জানে। তার কর্তব্বর আরও কয়েক ধাপ চড়ল। রেগে গেলেই শুরপ্রীত পঞ্জাবি ছেড়ে কাশ্মীরিতে কথা বলতে শুরু করে। কাশ্মীরি ভাষাই ওর মাতৃভাষা। তবে কন্নুর বাবার সঙ্গে প্রেম করার সময়, এবং বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সে পঞ্জাবিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শিশমহলের প্রায় সব বাসিন্দাই দুটো ভাষার সঙ্গে সমান অভ্যস্ত।

"কন্নু, শিয়াতনিন ক্যায়াজুক করন? শলাখ কড়াই!"

ওরে বাবা! মা এবার আড়ং ধোলাইয়ের ভয় দেখাচ্ছে। কন্নু জিভ কাটল, "মো-জি, বিছুস পাকান। ডরাও মত। আ রিয়া ছৈ। মে ন খোচনাও!" বলতে বলতেই জলে ঝাঁপ মারল সে। মাথায় থাক তার হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার মার্চিং। এখন গোটা কয়েক ডুব দিয়ে উঠতে পারলেই ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সকালের চা খেতে-খেতেই দৃশ্যটা দেখে কন্নুর বাবা ভরত শেরগিল মুচকি-মুচকি হাসে। সকাল-সকালই মা-ছেলের খণ্ডযুদ্ধ লেগে গেছে। কন্নুরও দোষ নেই। সকালে স্কুল করে এসে সে শ্রীনগরের একটা হোটেলে বিকেলের শিফটে ফাই-ফরমাশ খাটার কাজ করে। বিকেল থেকে রাত অবধি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পর আর পরদিন স্কুল যেতে ইচ্ছে করে না। ওদিকে তার মাও ছাড়বে না। এই নিয়ে দু'জনের খাঁটাখাঁটি লেগেই আছে। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কন্নু ভোম মেরে বসে থাকে। তার স্নান করতে ইচ্ছে করে না। স্কুলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুরপ্রীত ঝাঁঝালো গলায় ঠ্যাঙানির ভয় দেখালেই তটস্থ হয়ে উত্তর দেয়, 'মা, ভয় দেখাস না। এই তো আসছি'। পরমুহূর্তেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোজই এই এক দৃশ্য, এক ডায়ালগ!

ভরতের মুখের হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। সে করুণ দৃষ্টিতে নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কন্নু এখন ওই নোংরা জলেই গুবগুব করে ডুব দিচ্ছে। ওকে দেখলে কেউ বলবে যে, হতদরিদ্র এই ড্রাইভারের ঘরে জন্মেছে ছেলেটা? হাতির দাঁতের মতো সাদা স্নিগ্ধ রং ওর। নাক, মুখ কাটা-কাটা। একমাথা কুচকুচে ঢেউখেলানো রেশমি চুল, সামান্য ডিম্বাকৃতি মুখ, পাকা টমটসে আপেলের মতো লাল টুকটুকে গাল, পিচফলের মতো লাল ঠোঁট আর হালকা সোনালি আভাযুক্ত বাদামি চোখের রূপবান শিশুটিকে দেখলে রাজপুত্র বলে মনে হয়। অথচ সেই রাজপুত্র এখন জন্মের নোংরা জলে ডুব দিচ্ছে। ট্যুরিস্টরা এই জল দেখলে ঘেন্নায় কুঁকড়ে যায়। এত সতর্ক হয়ে পিঁটিয়ে শিকারায় বসে থাকে, যেন একফোঁটা জলও গায়ে লাগলে তাদের কুষ্ঠ রোগ হবে। ওদের দোষ নেই। এই জল গায়ে লাগলে 'আমির আদমি'দের সযত্ন রক্ষিত ত্বকে চর্মরোগ অবধারিত। শিশমহলের অঘোষিত সেপটিক ট্যাঙ্ক তো এটাই। তাদের মল, মূত্র, থুতু, কফ— সমস্ত রকমের বর্জ্য জিনিসে ভরপুর। এছাড়াও প্লাস্টিকের প্যাকেট, তামাকের প্যাকেট, কয়েক দিনের পচা উচ্ছিষ্ট— সবই বোধহয় পাওয়া যাবে এই জল কালচার করলে। কিন্তু কন্নু, ভরত, আফসানা, গুলজার, যসপিন্দরদের কিছুই হয় না। দারিদ্র নামের রোগে যে ভোগে, তাকে বোধহয় মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও রোগ ধরে না— জলে বাস করা কিছু ফাঙ্গাস বা জীবাণু তো তুচ্ছ জিনিস!

"অ্যা-ল্লো। নাশতা।"

শুরপ্রীত একটা থালায় 'নাশতা' নিয়ে এসেছে। থালায় শোভা পাচ্ছে চুড়ো করে সাজানো সত্তা চালের মোটা ভাত আর শাকের ঝোল। ভরত গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারে— শাকের ভিতরে সামান্য একটু ঘিও দিয়েছে শুরপ্রীত। তার মন খুশিয়াল হয়ে ওঠে। আঃ, 'চাওয়াল, সাগ ঔর ঘি'— কী সুস্বাদু খাবার।

গৃহিণীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় ভরত। শুরপ্রীত এখনও রেগে আছে। রেগে গেলে অপূর্ব সুন্দরী লাগে ওকে। একেবারে যাকে বলে হুরি-পরি। তার মুখ ফসকে প্রশংসাবাক্য বেরিয়ে পড়ে, "ওয়-হোয় সৌড়িয়ো। আজ আগ লানি ছি কী?"

শুরপ্রীত মুখভঙ্গি করে, "আহো। মেরে নাল কিলোলাঁ না করো।"

সর্বনাশ। বউয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করাও চলবে না। হল কী শুরপ্রীতের। অন্য সময়ে তো দিব্যি ফাজলামি করে। আজ কী হল?

"কিউ?"

"আপানে পুত্তর নু পুছো! উসা নে ইক আলাসি বিল্লি হৈ।"

কন্নু ততক্ষণে জল থেকে উঠে এসেছে। ভরত আড়চোখে দেখল, সে একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে গা-মাথা মুছছে। তার হাঁপ পায়। অলস বিড়াল। শুরপ্রীতও জানে কন্নু কী হাড়ভাঙা পরিশ্রমই না করছে। সামনেই দিদির বিয়ে। বাড়িতে প্রথম পুত্র বা কন্যার বিয়ে হলে একটু ধুমধাম করে বিয়ে দিতে হয়। প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করে ভূরিভোজ খাওয়াতে হবে। মাছ, মাংস— কাবাব, বিরিয়ানি ছাড়া চলবে কী করে? তাছাড়া মেয়েকে কি খালি হাতে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে? গয়না গড়াতে হবে। এছাড়াও 'শগুন'-এর খরচ-খরচা আছে। একা ভরতের রোজগারে তা সম্ভব নয়। তাই শুরপ্রীত আর কন্নুও হাত লাগিয়েছে। আপাতত 'যসসি' ওর 'চাচা দা ঘর', অর্থাৎ কাকার বাড়িতে আছে। সে এমনিতে তার মায়ের মতোই সুন্দরী! তবু এই মুহূর্তে ওর একটু বাড়তি যত্ন, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া দরকার। 'সগাঈ', কাশ্মীরি ভাষায় যাকে বলে 'গাড়বোছই', বা তথাকথিত আশীর্বাদের সময় মেয়ের রূপ খোলতাই হওয়া জরুরি। 'মাহরিন'-এর সৌন্দর্যে 'মাগরাজ'-এর চোখ ঝলসে গেলে তবেই না চার চোখের মিলন শুভ হবে। অগত্যা যসসি এখন কাকার বাড়িতে দুধ, মাখন, ঘি, বাদাম খেয়ে আরও সুন্দরী হচ্ছে। 'রোকা'র আগে ফিরবে। তাই আপাতত সংসারের ভার একা শুরপ্রীতের ঘাড়ে। ওরা যে যার কাজে চলে যাওয়ার পর শুরপ্রীত সমস্ত কাজ মিটিয়ে আফসানা 'বহিন'-এর সঙ্গে নৌকোয় করে বেরিয়ে যাবে গোলাপফুলের ঝুড়ি নিয়ে। ওরা ট্যুরিস্টদের ফুল বিক্রি করে।

কন্নুকে আড়চোখে দেখে ভরত বলল, "পঢ়াই শঢ়াই নেই করেঙ্গা তান মেরে ভকর্ডা ডেরাইভারি হি করেঙ্গা। নু সমঝিয়াঁ?"

কন্নু বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায়। ভরত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছেলেটার বড্ড পরিশ্রম হচ্ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি হোটেলে চাকরি করার ধকলও কম না। সে ছেলেটার কষ্ট বোঝে। কিন্তু উপায় কী?

কোনও মতে নাকে-মুখে দুটো শাক-ভাত গুঁজে কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হল সে। কন্নু তৈরি হল স্কুলে যাওয়ার জন্য। ভরতের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়বে ও। এখন ভরত ওভারটাইম কাজ করে চলেছে। ওর মালিকের তিনটে গাড়ি। একটা গাড়ি ছোট ট্রিপের ভাড়ার জন্য খাটে। শ্রীনগর আর আশেপাশে ট্যুরিস্টদের সাইট সিয়িং-এর জন্যই ছোট গাড়িটা খাটত। সেই গাড়িটাই চালাত সে। কিন্তু সম্প্রতি লং ট্রিপগুলোও ধরেছে। মালিকের বাকি দুটো গাড়ি কাটরা থেকে পহেলগাঁও, পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগর, কিংবা শ্রীনগর থেকে জম্মুর লম্বা জার্নিগুলো নেয়। আজ ভরত পহেলগাঁও থেকে এক ট্যুরিস্টপার্টিকে আনতে যাবে।

সে বিড়বিড় করতে করতে 'ওয়াহেগুরুর' নাম নিল। 'ইক ওঙ্কার সতনাম, কর্তা পুরাখ, নির্ভা-আ-ও, নির্ভৈর, আকা-ল মুরত আজুনি সৈভ গুরপরসাদ জাপ....'। গাইতে গাইতে ভরত নৌকোর দাঁড় টানতে শুরু করেছে। কন্নুও বিড়বিড় করে বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। আজ ক'ঘণ্টার জার্নি হবে কে জানে। একটু বেশি মাত্রার 'নেওলা'র প্যাকেট, অর্থাৎ খৈনি নিয়ে যেতে হবে। না নিয়ে গেলে এতটা লম্বা সময় গাড়ি

টানতে পারবে না। একেই রাস্তার এমন অবস্থা, তার ওপর ট্যুরিস্টদের আদিখ্যেতার শেষ নেই। গুলমার্গে গিয়ে কেউ ঘোড়ায় বা খচ্চরে চড়বে। গোটা গুলমার্গ ঘুরে দেখতে আরও দু'ঘন্টা গেল। তার ওপর আবার খিলানমার্গও আছে। ভরত ভেবে পায় না লোকগুলো বরফ দেখে এত আহ্লাদিত হয় কেন! বরফ দেখবি তো নিজের ফ্রিজ খুলে দেখ। বরফ আবার একটা দেখার জিনিস হল! দেখে দেখে তো তার নিজের চোখ পচে গিয়েছে! প্রতি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বরফ পড়ার চোটে গোটা ডাল লেকই জমে যায়। তখন অবশ্য আর নৌকো লাগে না। দিব্যি হেঁটে-হেঁটে লেক পার করা যায়। আজব শুধু বরফই দেখে এল সে, আর বরফ মানেই কষ্ট। বরফ মানে রোজগারপাতি বন্ধ। বরফ মানে একবেলার শাক-ভাত জোগাড় করতেই লবেজান হওয়া। অথচ ট্যুরিস্টরা সেই বরফ দেখেই এমন লাউঘন্ট হতে শুরু করে যেন পারলে ওখানেই ইগলু বানিয়ে থেকে যায়। কী অদ্ভুত আদিখ্যেতা।

"...কিভ সচি আ-রা হোইয়েই কিভ কূঢ়াই টুটে পাল/ হুকম রাজা-ই চালনা নানক লিখিয়া নাল...।"

সমস্বরে গাইতে-গাইতেই নৌকোটা একদিকে ভিড়িয়ে দিয়ে ওরা পিতা-পুত্র ডাঙায় উঠে আসে। ভরত নিজের জন্য কয়েক প্যাকেট খৈনি কিনে নিল দোকান থেকে। সেই সঙ্গে কন্নুকে টিফিনে খাওয়ার জন্য 'শ্কীরা' কিনে দেয়। কাশ্মীরি 'শ্কীরা' বা শশার আকৃতি একটু অন্যরকম। চেহারায় দশাসই শশাগুলোর বিচিগুলোও প্রমাণ সাইজের। কিন্তু খুব সুস্বাদু। পেটে অনেকক্ষণ থাকে। আর এখানকার শশায় প্রচুর জল থাকার জন্য আলাদা করে জল না খেলেও চলে। কামড় দিলেই মুখ জলে ভরে যায়। নুনঝাল দেওয়া 'শ্কীরা' আর 'তরবুঁজা' তাই এখানকার দরিদ্র মানুষের প্রিয় জলখাবার। দিব্যি পরতায় পুষিয়ে যায়।

"পাপা, মৈঁম যা রিয়া হৈ। রাতানু তুহানু মিলানা। বাই।"

কন্নু স্কুলের দিকে পা বাড়ায়। ভরত হেসে ছেলের দিকে সস্নেহে তাকাল। আলতো হাত নাড়ে। তারপর লম্বা-লম্বা পায়ে নিকটবর্তী গ্যারাজের দিকে এগিয়ে যায়। ওখানেই তার মালিক কর্তার সিংহ-এর গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্য দিনের মতো আজও অভ্যাসবশত নিজের গাড়িটার দিকেই প্রথমে চোখ পড়ে তার। আর গাড়িটাকে দেখেই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল। কে যেন তার গাড়ির কাচের উপরে বড়-বড় অক্ষরে কী সব লিখে দিয়েছে...। কোনও মতে বানান করে পড়তে-পড়তেই ভরতের চোখদুটো ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। কাঁপা গলায় কোনও মতে বলল সে—"ওয়া-হে-গু-রু।"

গাড়ির কাচে পঞ্জাবি অক্ষরে কে যেন লিখে গিয়েছে—'সওয়াগতা হৈ জিহাদি।' অর্থাৎ 'ওয়েলকাম জিহাদি'।

দুই

'সুখ মেঁ তেরে সাথ চলেঙ্গে, দুখ মেঁ সব মুখ মোড়েঙ্গে
দুনিয়াওয়ালে তেরে বন কর, তেরা হি দিল তোড়েঙ্গে
দেতে হ্যাঁ ভগওয়ান কো ধোঁকা, ইনসাঁ কো ক্যায়া ছোড়েঙ্গে।'

গাড়ির মিউজিক সিস্টেমে গানটা শুনতে শুনতে চোখটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল তার। কী নিষ্ঠুর, অথচ কী ভয়ানক সত্যি কথা। কথাগুলো যে মর্মে-মর্মে সত্যি, তা এই মুহূর্তে তার চেয়ে ভাল কে জানে!

"স্বরাজ, তুহা কী সোচা রয়ে হ্যানা?" ড্রাইভারের সিটে বসা লোকটা হেঁকে বলল—"কী ভাবছিস ক্বাকে?"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এখন তার নাম স্বরাজ। পৈতৃক নামটা ব্যবহার করারও অধিকার হারিয়েছে সে। কী জন্য, কার জন্য মূর্খের মতো সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে অনির্দিষ্টের পথে চলেছে তাও জানা নেই।

"ইতনা সোচিও মৎ।" সামনের লোকটার নাম হয়েছে আব্দাদ। সে হাসতে হাসতে বলে— "নেহি তো ইক দিন তুহান কবি হোভেগা।"

বেঁচে থাকলে তো কবি হবে। তাছাড়া কবি হওয়ার শখও নেই তার। সে এক দরিদ্র যুবক হয়েই আনন্দে ছিল। দারিদ্র শকুনের মতো বারবার ভাগ্যাকাশে উড়ে-উড়ে গিয়েছে। দেখে গিয়েছে, খুঁটে খাওয়া মানুষগুলো মরল কিনা। তখনও হাল ছাড়েনি। ভেঙে পড়েনি। অথচ আজ যখন দারিদ্র ঘুচতে চলেছে, যখন তার ব্যাগে তিন লক্ষ টাকা কড়কড় করছে, তখন সে বাজপড়া গাছের মতো বিধ্বস্ত। টাকাগুলো একবার দেখতেও ইচ্ছে করছে না। চোখ বুজলে কোনও সুদিনের স্বপ্ন দেখছে না স্বরাজ। বরং এ ক'দিন দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেরিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর চোখ। 'লালা'র চোখ। আর কানে বেজে চলেছে তার সেই নির্মম আদেশ...।

"এখন থেকে তোর নাম হল স্বরাজ।"

কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে লালা নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে। এমনিতেই লোকটার চোখ বিড়ালের মতো। তার ওপর সবসময় একগাদা সুর্মা লাগিয়ে রাখে চোখে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই সুর্মা লাগায়, আবার শিখরাও কেউ কেউ লাগিয়ে থাকে। তাই সে শিখ না অন্য কিছু বোঝা মুশকিল। তবে সুর্মা পরলে ওর কটা চোখদুটো আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। মনে হয় মানুষ নয়, হিংস্র নেকড়ে তাকিয়ে আছে।

বলাই বাহুল্য যে, 'লালা' নামটা আদৌ আসল নাম নয়। লোকটার আসল নাম যে কী তা কেউ জানে না। কোন ধর্মের লোক, তাও অজানা। ওর বাড়িতে কোনও দেবদেবীর মূর্তি নেই। ও নামাজও পড়ে না। কোনও দরগায় যায় না। ওকে সবাই 'লালা' বলে ডাকে। খাতির করে। কারণ লোকটার প্রচুর পয়সা। ক্ষমতাও প্রচুর। তিন-তিনটে জাফরান খেতের মালিক লালা। তাছাড়াও কিছু কালো ধান্দা আছে। অঢেল পয়সা।

লালা একটু থেমে কাশ্মীরি ভাষায় বলল, "তোর মনে হতে পারে আমি গুনাহ করছি। কিন্তু পরে বুঝবি এর নাম আসলে জিহাদ। জিহাদিদের সবাই ভুল বোঝে। আতঙ্কবাদী বলে। কিন্তু পরে একদিন আমাদের খুঁজে করবে সবাই। বলবে, বিপ্লবী। আব্দাদির সেনানী। আমরা কাশ্মীরের ক্ষতি চাই না। আব্দাদি চাই।"

এই মুহূর্তে যার নাম হল স্বরাজ, সে অবাক হয়ে লালার কথা শুনছিল। আব্দাদি। কিসের আব্দাদি? সে সভয়ে লালার দিকে তাকায়। দু'দিন ধরে এর হাতেই বন্দি হয়ে রয়েছে তার পরিবার। লালার পোষা গুন্ডারা ওর মা, বাপ, বোনের কপালে এ কে ফর্টি সেভেন ঠেকিয়ে রেখেছে। গত দু'দিন ধরে লোকটার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে স্বরাজ। লালা কোনও কথা শোনেনি ওর। প্রথমে ভয় দেখিয়েছে। বলেছে— "বল, কাজটা করবি কিনা। করলে একা তুই মরবি। না, ঠিক মরবি না। শহিদ হবি। বাকিরা বেঁচে যাবে। আর যদি না করিস, তবে এখানেই চারজনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।" তারপর একটু নরম সুরে বলেছে— "ভেবে দেখ, এর জন্য তোকে তিন লাখ টাকাও দেব। আব্দাদির সওগাত। কিন্তু কাজটা তোকে করতেই হবে। চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম। পুলিশের কাছে যাওয়ার বেকুবি করবি তো সব ক'টাকে 'ভুনে' দেব। ভেবে দ্যাখ। চারজনই একসঙ্গে মরবি? না একা তুই?"

কাজটা মোটেই সহজ নয়। তখন থেকে লালা 'আব্দাদি', 'আব্দাদি', করছে বটে, কিন্তু কতগুলো নিরীহ, অসহায় মানুষকে গান পয়েন্টে রেখে কোন আব্দাদির কথা বলছে সে, তা বুঝে উঠতে পারে না স্বরাজ। কার আব্দাদির জন্য স্বরাজের মতো একটা সাধারণ 'ভুট্টা বেচনেওয়ালা'কে মানব-বোমা হতে হবে তাও তার বুদ্ধির অগম্য। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে যে, তাকে একটা আস্ত বোম নিজের পেটে বহন করতে হবে। যদিও টেকনিক্যাল টার্মগুলো তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবু 'মানব-বোমা' জিনিসটা কী তা সে বোঝে। লালা তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছে। তাকে প্রথমে জম্মুতে যেতে হবে একটা অপারেশনের জন্য। কোনও ডাক্তারসাহেব তার পেট কেটে ঢুকিয়ে দেবেন একটা মারাত্মক বিধ্বংসী বোমা। কতগুলো মানুষের অজ্ঞাত স্বার্থে পেট ফেটে মরতে হবে তাকে।

স্বরাজ জানে না, এই জাতীয় বোমার সংক্ষিপ্ত নাম— 'সিড', (SIED) অর্থাৎ সার্জিক্যালি ইমপ্ল্যান্টেড ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। ডাকনাম হল 'বি.সি.বি', বডি ক্যাভিটি বম। এ জিনিস নতুন

BanglaBook.org

নয়। 'টেররিজম রিসার্চ সেন্টারের' ডঃ রবার্ট বাক্তারই প্রথম এই 'বডি ক্যাভিটি বমের' ঘোঁৎঘাঁত প্রকাশ্যে আনেন। পুরুষেরা পেট, পায়ু এবং নারীরা ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টস-এর সাহায্যে কখনও স্তনের ভিতরে কখনও জরায়ুতে এমনকী, যোনিতেও এই ধরনের বিস্ফোরক সহজেই বহন করতে পারে। এখনও পর্যন্ত বহু মানুষের প্রাণ নিয়েছে এই জাতীয় বিস্ফোরক। এমনকী, ২০০৯ সালের ২৮ অগস্ট স্বয়ং সৌদি আরবের শাহজাদা মহম্মদ বিন নায়েফের ওপরও এরকম একজন মানব-বোমা আত্মঘাতী হামলা করেছিল। কপালজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন প্রিন্স। কিন্তু আত্মঘাতী মানব-বোমা, আবদুল্লাহ-আল-আসিরি ওখানেই টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে। এমনভাবে মুহূর্তের ভগ্নাংশে ধোঁয়া হয়ে গিয়েছিল লোকটা যে তার দেহের অবশিষ্টাংশ খুঁজে বের করাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নন-মেটালিক, এবং দেহ-অভ্যন্তরস্থ হওয়ার দরুন মেটাল-ডিটেক্টরেও ধরা পড়ে না এ জাতীয় বিস্ফোরক।

এত কিছু জানত না স্বরাজ। শুধু এইটুকু জানত তার মৃত্যুর মূল্য নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং মা, বাবা ও বোনের প্রাণ! তিন লক্ষ টাকা! অত টাকা সে কোনওদিন চোখেই দেখেনি। বাবার হার্ট অপারেশন ওই টাকায় সম্ভব। চিকিৎসার অভাবে রোজ একটু-একটু করে ধুঁকতে-ধুঁকতে মরবে না লোকটা। আইবুড়ো বোনের বিয়েও হয়ে যেতে পারে সহজেই। বুড়ি মা'টাকে আর মুখে রক্ত তুলে মজুরের কাজ করতে হবে না। নিজের বন্দি পরিবারের ভয়ার্ত শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে পড়েছিল তার। হয়তো সুখের মুখ দেখবে ওরা, কিন্তু স্বরাজ নিজে সেদিনটা দেখার জন্য এ দুনিয়ায় থাকবে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেল সে। লালা তার পিঠ চাপড়ে দেয়—"সাবাশ। এই না হলে মর্দ কা বাচ্চা!" তারপর সব কিছু বুঝিয়ে দিল তাকে। কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি। জম্মু থেকে অপারেশন করিয়ে চলে যেতে হবে শ্রীনগরের 'শিশমহলে'। সেখানে কিছু দিন থাকতে হবে। ওখানে লালার এজেন্ট আছে, তার বাড়িতেই থাকবে ওরা। বিশেষ একটি দিনে তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের মন্দিরে যেতে হবে স্বরাজ ও আব্বাদকে। সেখানে সেই দিনটিতে একজন গণ্যমান্য অতিথি আসবেন। অতিথির নামধাম জানার দরকার নেই। শুধু হলিয়া জানলেই যথেষ্ট। তাকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে লোকটার একদম পাশে। বাকিটা বুঝে নেবে এই 'আব্বাদ'। ওর হাতেই থাকবে বোমার ট্রিগারটা। এই মুহূর্তে সেটা খুব সাবধানে আব্বাদের ব্যাগের এক গোপন খুপরিতে লুকিয়ে আছে। অবিকল একটা ছোটদের খেলনা লাল মোবাইলের মতো দেখতে যন্ত্র। তার লাল বোতামটা টিপলেই সব শেষ।

যে গণ্যমান্য অতিথির কথা বলছিল লালা, তার সম্পর্কে স্বরাজ কিছুই জানে না। লোকটা ওর কোনও ক্ষতি করেনি। অথচ ওকেই শেষ করে দিতে হবে। কী জন্য, কেন—সবই অজানা। জানার প্রয়োজনও নেই। ওই লোকটা ওর পরিবারের কেউ নয়। তাই ওকে বাঁচানোর কোনও দায়িত্ব নেই তার। এসব ভেবেই ক্রমাগত নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে সে। তবু বুকের জ্বালা কমে না।

"তোর কী ধারণা? কাশ্মীরে সবাই খুব ভাল আছে?" লালা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, "আমাদের নিজের জমিতে আমরা পরাধীন। যা, নিজের চোখে দেখ, শিশমহল কত বড় নরক। নিজেদেরই জমিন, কিন্তু জায়গা হয় না। লোকগুলো গাদাগাদি করে জলের উপরে থাকে। দেখে আয়, আমাদের কৌমের কী অবস্থা। আমাদের ভাইরা কী গরিবিতে দিন গুজরান করে। যখন নিজের চোখে দেখবি তখন বুঝবি কেন আমরা কাশ্মীরের আজাদি চাই!"

কার ভাই। কোন কৌম! লালা নিজে টাকার কুমির। 'গরিবি'র কথা সে কী জানে? নিজের দেশকে যে নিজের মনে করে না, তার কিসের ভাইবোন? এতই যদি ভাই-বোনদের প্রতি দরদ, তবে লালা নিজের অঢেল টাকা তথাকথিত তার কৌমের ভাইবোনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেই পারে। নিজে তো দিনরাত চর্ব্য-চোষ্য গিলছে। অন্যদের গোটা কয়েক রুটির ব্যবস্থা করে দিলে ক্ষতি কী? লালার নিজের তো আটটা ভাই! কাশ্মীরের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য তাদের কাউকে কি এমন করে মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে দিতে পারবে? পারবে না। লালা কি আদৌ জানে এই মাটিতে কোন-কোন ধর্ম নিজের রং মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে কি জানে কাশ্মীরের মাহাত্ম্য? এই 'কাশ্মীর' নামটা যে সংস্কৃত— উর্দু পুশতু নয়— জানে কি?

স্বরাজ অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি। কিন্তু মাথাটা চিরকালই খুব পরিষ্কার। যে-কোনও জিনিস একবার শুনলেই সে হুবহু তেমনভাবেই মনে রাখতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে, শৈশব থেকেই শ্রুতিধর। ছোটবেলায় সে বাবার সঙ্গে চন্দনওয়াড়িতে ভুট্টার ঠেলা লাগাত। সেখানে এক 'প্রফেসর সাব' একবার এসেছিলেন। ভদ্রলোক ইতিহাস নিয়ে প্রচুর নাড়াঘাঁটা করেছেন। তিনিই গল্পচ্ছলে জানিয়েছিলেন, 'কাশ্মীর' শব্দটা সংস্কৃত। অনেক বছর আগে কাশ্মীর নাকি একটা বিরাট হ্রদ ছিল! 'কা' অর্থাৎ জল, এবং 'শিমিরা' শব্দের অর্থ 'শুকিয়ে যাওয়া'। 'কাশ্মীর' শব্দটার অর্থ, যে ভূমি জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে উত্থিত হয়েছে।

অন্য কিংবদন্তিতে বলা হয় একসময়ে কাশ্মীরের নাম ছিল 'সতীশর'! দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী 'সতী'র নামে নামকরণ হয়েছিল এই জলাশয়ের। কল্হন বলে এক মহান পণ্ডিত তাঁর বই 'রাজতরঙ্গিনী'তে নাকি কাশ্মীরের নাম মাহাত্ম্যের অন্য বর্ণনা দিয়েছেন। 'রাজতরঙ্গিনী'তে বলা হয়েছে যে, 'সতীশরে' 'জলোদ্ভব' নামের জলদানবের উপদ্রব বন্ধ করতে কশ্যপ মুনি তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যার ফলেই সতীশরের জল পাথর ফাটিয়ে একাধিক প্রণালীর মাধ্যমে নিচের দিকে নেমে যায়। জলদানবেরা মারা পড়ে। জলমুক্ত করার পরে যে-ভূমি উত্থিত হয় তাকে ঋষি কশ্যপের নামেই নাম দেওয়া হয়েছিল— 'কশ্যপমীর'। সেই 'কশ্যপমীরই' নাকি সংক্ষিপ্ত হয়ে 'কাশ্মীর' হয়েছে।

প্রোফেসর সাব ছোটখাট একটা লেকচার প্রায় দিতে যাচ্ছিলেন। স্বরাজের বাবার অবশ্য কাশ্মীরের গল্প শোনার খুব ইচ্ছে ছিল না। তিনি তখন ভুট্টা বিক্রি করতেই ব্যস্ত। সেটা লক্ষ করেই ভদ্রলোক নিরুৎসাহ হয়ে উলটো দিকের পথ ধরেন। আচমকা একটা ছোট্ট হাত তাঁর ওভারকোট টেনে ধরল। ছোট্ট স্বরাজ চোখ গোলগোল করে জানতে চাইল— "তারপর?"

একটি শিশুর উৎসাহ দেখে প্রোফেসর সাব ফের পূর্বোদ্যমে গল্প বলতে শুরু করে দিলেন...

শুধু কল্হনই নন, বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-ও কাশ্মীরের কথা বলতে গিয়ে আর এক কিংবদন্তির কথা বলেছেন। দুই কিংবদন্তি অবশ্য গল্পের দিক দিয়ে বেশ কাছাকাছি। 'মধ্যান্তিকা' নামে বুদ্ধের এক তিব্বতি শিষ্য এখানেই এক ভয়ংকর ড্রাগন বধ করেন। এবং হ্রদের জলকে প্রণালীর মাধ্যমে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর পাঁচশত শিষ্যকে ওখানেই রেখে যান বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রবর্তনের জন্য। তিব্বতিরা যে এখানে এসেছিলেন, তার প্রমাণ 'লেহ' আর 'লাদাখ' নাম দু'টি। কাশ্মীরে অন্যান্য জায়গার নামগুলো লক্ষ করলেই দেখা যায় কিছু নাম উর্দুঘেঁষা, কিছু সংস্কৃত। কিন্তু 'লেহ' ও 'লাদাখ' ব্যতিক্রম।

অনেকে আবার বলেন, আর্যরা এখানে এসে হাজির হওয়ার পর আর্যদের দলপতি 'ইন্দো' বা 'ইন্দ্র' পাহাড়ের পাথর ফাটিয়ে 'সতীশর'এর সব জল নিষ্কাশিত করে দেন। যার থেকে তৈরি হয় 'সরস্বতী' নদী। আশ্চর্য নয়? 'সতীশর' হয়ে গেল 'সরস্বতী।' 'ইন্দো' বা 'ইন্দ্র' মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব পেয়ে গেলেন। 'ইন্দো' থেকেই সম্ভবত 'হিন্দু' শব্দটা এসেছে। আর সেই হিন্দু পুরাণেই ইন্দ্র হয়ে গেলেন দেবরাজ। কী মজা।

সেদিনও প্রোফেসর সাবের গল্প শুনে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল পুঁচকি স্বরাজ। আজ এত দুঃখেও আবার তার একইরকম হাসি পেয়ে গেল। লালা তার সুর্মা পরা চোখ পাকিয়ে যে তথাকথিত 'কৌম'-এর দোহাই দিচ্ছে, সত্যি বলতে কী, তেমন কোনও নির্দিষ্ট 'কৌম' ছিল না কাশ্মীরে। নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম ছিল না। একদম প্রাথমিক ঘটনাবলি সম্পর্কে ইতিহাস অবশ্য নীরব, কিন্তু পুরাণে কিছু উল্লেখ আছে।

'রাজতরঙ্গিনী'তে বলা হয়েছে, প্রথমদিকে কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন অনার্য এক রাজা। প্রথম গোনন্দ। সময়টা ২৪৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব।

গোনন্দ 'মহাভারত' খ্যাত জরাসন্ধের বংশধর ছিলেন। পরবর্তীকালে গোনন্দের ছেলে প্রথম দামোদর কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হওয়ায় কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে নেয় পাণ্ডববংশ। হ্যাঁ, মহাভারতের বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডবের বংশধররাই কাশ্মীরাধিপতি হয়েছিলেন। অনার্য শাসককে সরিয়ে আর্য শাসন প্রথম পদক্ষেপ রাখল ভূস্বর্গে। অনার্য-আর্য সংস্কৃতির মিলন হল। শুরু হল হিন্দু ধর্মের সাম্রাজ্য।

কিন্তু এরপরই পালটে যায় প্রেক্ষাপট। হিন্দু ধর্মের একচ্ছত্র প্রভাব ব্যাহত হল বৌদ্ধ ধর্মের হস্তক্ষেপে। এখান থেকেই ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে। সন ২৬৮ খ্রিষ্টপূর্বে কাশ্মীরের রাজদণ্ড চলে গেল সম্রাট অশোকের হাতে। ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী শুনতে পেল কাশ্মীর। গড়ে উঠল বহু 'বিহার' এবং 'স্তূপ'। কিন্তু অশোকের সন্তান জালুক আবার ভয়ংকর শৈব ছিলেন। এবং তৎপরবর্তী সম্রাটরাও শৈব ধর্মকে অনুসরণ করতেন। ফলস্বরূপ করুণাঘন তথাগতর প্রভাবকে অকরুণভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করল শৈবশক্তি। প্রচণ্ড উগ্র শৈবধর্ম কাশ্মীরকে গ্রাস করতেই চলেছিল, কিন্তু আবার কুষাণ বংশের হাত ধরে নম্র অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ করল বৌদ্ধধর্ম। সম্রাট কণিষ্ক ফিরিয়ে আনলেন বৌদ্ধধর্মকে। এবং তাঁর আমলেই বৌদ্ধধর্ম দারুণ বিস্তৃতি লাভ করে।

"আবার চুপ করে গেলি যে ইয়ারা?"

এতক্ষণ স্মৃতির ভিড়ে ডুবে গিয়েছিল স্বরাজ। আজাদের কথায় এতক্ষণে হুঁশ ফিরল। পাহাড়ি পথে অন্ধকার নেমে এসেছে। সে লক্ষই করেনি। নিজের মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল।

"মুখটা অমন তোম্বা করে রেখেছিস যে?" আজাদ বলল, "ভয় পাচ্ছিস নাকি? আরে, ভয় কিসের? আজাদির জন্য শহিদ হতে কেউ ভয় পায়? তোর জায়গায় আমি থাকলে হাসতে-হাসতে যেতাম। হাসতে-হাসতে মরতাম।"

হাতে ট্রিগার থাকলে সকলেই অমন হাসতে পারে। কিন্তু যার পেটে একটা আস্ত বোমা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মুখে হাসি আসে কী করে? একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। তার বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। উলটোদিক থেকে একটা আর্মির গাড়ি আসছে না। এমন আর্মির গাড়ি জীবনে অনেকবার দেখেছে স্বরাজ। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। টের পেল, সে ঘামছে। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। মনে হচ্ছে, সীমান্তপ্রহরীর বেয়নেটের চেয়েও ধারালো দৃষ্টি যেন তার পেট ফুঁড়ে ঢুকে যাবে ভেতরে। এক্সরে দৃষ্টি দেখে নেবে ভিতরে লুকিয়ে থাকা বড়যন্ত্রটাকে।

তার আঙুল সামনের সিটে বসে থাকা আজাদের কাঁধ চেপে ধরল। কাঁপাস্বরে ফিসফিসিয়ে বলল সে, "আ-জা-দ। আর্মি আসছে।"

"তো?" নির্বিকারভাবে বলল আজাদ। "শা-লা ইন্ডিয়ান আর্মি। এই হারামজাদাগুলোকে ভয় পাই নাকি? ওদের জন্যই তো আমাদের এই অবস্থা। আমাদের কত ভাই ওদের গুলিতে 'ছাম্পি' হয়ে গিয়েছে। কত 'নওজোয়ান' 'গর্মখুন'কে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ করেছে। শা-লা কুত্তার বাচ্চা। উসকি আম্মাকো..."

সে পরম ঘৃণায় কিছু অশ্লীল শব্দ ও একদলা থুতু ছুঁড়ে দিয়েছে আর্মির গাড়ি লক্ষ করে। ভয়ে সিঁটিয়ে যায় স্বরাজ। কী করছে আজাদ। আর্মির পিছনে লাগছে। যদি গাড়ি থামিয়ে তেড়ে আসে। যদি ধরা পড়ে যায় ওরা।

কপাল ভাল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িটা তার আগেই হুশ করে বেরিয়ে গিয়েছে নাগালের বাইরে। গালাগালি কিংবা থুতু, কোনওটাই ওদের কাছে পৌঁছল না। স্বরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শরীরটাকে এলিয়ে দেয়। এই কয়েক মুহূর্তেই ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে গেছে। বুকের ভিতরটা এখনও কাঁপছে।

"জিহাদিরা কোনও কিছুকেই ভয় পায় না, বুঝলি?" আজাদ বিজ্ঞের মতো বলে চলে, "আমার জীবন তো কৌমের জন্য নিবেদিত।"

আবার সেই কৌম। আবার সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ। লালা কি এই সব কথা বলেই ওদের সবার ব্রেনওয়াশ করে রেখেছে? সে জন্যই কি ষোলো থেকে বাইশ বছরের সদ্য তরুণরা ভালবাসতে শেখার আগেই ঘৃণা করতে শিখে গিয়েছে?

সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। নাঃ, ছবিটা এমন ভাবতে পারলে বেশ ফিল্‌মি হত। কিন্তু এটা আদৌ সঠিক নয়। তবে এটা সঠিক যে, লালাও শিক্ষিত নয়। কুশিক্ষিত। অশিক্ষিত মানুষকে যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বোঝানো যায়। কিন্তু কুশিক্ষিত মানুষ নিজের দুষ্কর্মের পিছনে উদ্ভট-উদ্ভট অদ্ভুহাত তৈরি করে রাখে। গোঁয়ার্তুমি, অন্ধ বিশ্বাসের নিরিখে জরিপ করে সব কিছু। যুক্তি, বুদ্ধি, তার সামনে অসহায়। 'কৌম' সেখানে একটা খোঁড়া অদ্ভুহাত ছাড়া আর কিছুই না। এমনকী, তার দলের 'জিহাদি' তরুণদের মুখেও 'মজবুরি' ছাড়া কিছু খুঁজে পায়নি স্বরাজ। ব্রেনওয়াশ কয়েক মুহূর্তের জন্য রক্ত গরম করে দিতে পারে। কিন্তু এ কে ফর্টি সেভেন তুলে নিতে বাধ্য করে না। লালার বক্তৃতা শুনে দপ করে একবার তারও মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই স্তিমিত হয়ে যায় সে উত্তেজনা। এইসব দিয়ে কি পেট ভরবে? তাদের জীবনের একটাই জ্বালা। এই হতভাগা পেট, আর পেটের জ্বলন্ত খিদে।

"ও... স্তেরি।"

আচমকা একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল আজাদ। সঙ্গে-সঙ্গে কাচ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। স্বরাজ আত্মমগ্ন হয়ে আপনমনে ভেবে চলেছিল। কিছু বোঝার আগেই বাইরে থেকে সাঁই করে একটা বিরাট ইটের টুকরো এসে পড়ল তার মাথায়। মুহূর্তের মধ্যে চোখ রক্তে ভেসে গেল। ঝাপসা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে তার রক্ত হিম হয়ে আসে। একের পর এক আধলা ইট এসে পড়ছে আজাদের মাথা লক্ষ করে। জানালা ভেঙে কাচ ছড়িয়ে পড়েছে ওর কোলে। বুকে, পেটে ভাঙা কাচের তীক্ষ্ণ ফলা ফুটে গিয়েছে। আজাদ স্টিয়ারিং ছেড়ে এলিয়ে পড়েছে। গাড়িটা এবার গিয়ে ধাক্কা খাবে পাথরের গায়ে, কিংবা গোত্তা খেয়ে উলটে পড়ে যাবে।

স্বরাজ কিছু ভাবার আগেই গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেল পাথরে। তারপরই একটা ভল্ট খেয়েছে... সামনে আর একটা গাড়ি...

গাড়ির স্পিকারে তখনও গান বেজে যাচ্ছে—

'কাম অগর ইয়ে হিন্দু কা হ্যায়,
মন্দির কিসনে লূটা হ্যায়?
মুসলিমকা হ্যায় কাম অগর ইয়ে,
খুদা কা ঘর কিউ টুটা হ্যায়?
যিস মজহব মেঁ যায়জ হ্যায় ইয়ে,
উয়ো মজহব তো ঝুঠা হ্যায়...!'

তিন

"ভ্রাজি, তুসসি কিদ্দান হো? কি চলদা প্যা হৈ?"

উলটোদিকের পরিচিত ট্রাকড্রাইভারটির কুশল প্রশ্নের উত্তরে বিষণ্ণ হাসে ভরত—"ধান্দা ঠিক নৈল হৈ ইয়ারা! ইস মেহন্নাই নে তান আসান। গরিবান নু মার দিত্তা।"

"সহি দস্যা!"

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ড্রাইভারটি ট্রাক হাঁকিয়ে চলে গেল। তার এখন দাঁড়ানোর সময় নেই। সে যাচ্ছে জম্মুর দিকে। আর ভরত জম্মু থেকে শ্রীনগর ফিরছে। একটু আগেই ক্রস করেছে বানিহাল। সামনেই অনন্তনাগের রাস্তা। ন্যাশনাল হাইওয়ে ওয়ান-এ বরাবর মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে সে। কাল রাতে বেরিয়েছিল। একদল ট্যুরিস্টকে জম্মুতে নামিয়ে দিয়ে ফেরার পথ ধরেছে। সারারাত গাড়ি চালিয়ে এখন ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। খিদেও পেয়েছে খুব। এই মুহূর্তে দরকার শুরপ্রীতের শাক-ফেনাভাত স্পেশ্যাল। একটা হাঁড়িতে 'চাওয়াল', 'সাগ' একসঙ্গে বসিয়ে ফুটতে দাও। ঘরে ঘি থাকলে শাক-ভাত নামানোর আগে সামান্য ঘি দিয়ে দাও। কী যে অপূর্ব স্বাদ তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

এমনিতে পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব মাত্র ৯৮ কিলোমিটার। যেতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু ট্যুরিস্টদের নিয়ে ফেরার পথটা বড় লম্বা হয়ে যায়। বেশির ভাগ ট্যুরিস্ট কোম্পানিই আবার পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগর যাওয়ার পথে মাঝখানে গুলমার্গ টু মারার প্রোগ্রাম

www.boiRboi.blogspot.com

রাখে। ওদিকে পহেলগাঁও থেকে গুলমার্গ যাওয়া অত্যন্ত চাপের ব্যাপার। পহেলগাঁও থেকে গুলমার্গের পথ ১৪২ কিলোমিটার লম্বা। আবার গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর ৫৬ কিলোমিটার। ফেরার সময় কমসে কম সাড়ে তিন ঘন্টা তো লাগবেই, এমনকী, দ্বিগুণ সময় লাগাও আশ্চর্যের নয়। যারা পাহাড়প্রেমী তাদের একবার কাশ্মীরের রাস্তার বিখ্যাত ট্র্যাফিক জ্যামে পড়া উচিত। জীবনে দ্বিতীয়বার আর কাশ্মীরে আসার নামও করবে না।

পাহাড়ি রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম। শুনতে আশ্চর্য লাগে বটে, কিন্তু কাশ্মীরের পথে এটাই স্বাভাবিক দৃশ্য। উপায় নেই, ওপর থেকে মিলিটারি কনভয় ক্রমাগত একের পর এক নামছে। পাহাড়ের গায়ে একচিলতে সরু সর্পিল পথে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে যায় বাকি গাড়িগুলো। তেমনই নিয়ম। আর্মির গাড়ির এ পথে অগ্রাধিকার। তাই যতক্ষণ না পুরো কনভয় নেমে যাচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে। তার উপর কয়েকদিন ধরেই নিয়ম করে বৃষ্টি নামছে। আজও যদি নামে তো হয়ে গেল। দু'দিন আগেই এমন একটা ট্র্যাফিক জ্যামে প্রায় চার ঘন্টা ফেঁসে ছিল ভরত। যে ক'দিন ট্রিপে গিয়েছে, কোনও দিনই ১২ ঘন্টার কম সময়ে ফিরতে পারেনি। আজ কখন গিয়ে পৌঁছবে কে জানে!

"তবু ভাল, আজ খল্লা খাঁ'র সপুতরা কম নামছে। ওদের বাপের রাস্তা কিনা! একবার নামলে আরও কয়েক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখত!"

ওর পাশের সিটে গুলজার আহমেদ চুপচাপ বসেছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল। 'খল্লা খাঁর সপুত'— মানে আর্মি। গুলজার মধ্যবয়স্ক পুরুষ। পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে। কিন্তু চোখে দেখে বোঝা অসম্ভব। কাশ্মীরিরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই অপরূপ সুন্দর। কিন্তু যদি সবাইকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তবে কোনও মুখই আলাদা করে নজর কাড়বে না। কারণ কাশ্মীরি সৌন্দর্য একইরকম। সেই এক পাতলা লম্বাটে মুখ, সেই একই একহারা পাতলা পাতলা চেহারা, লম্বা নাক, টানা চোখ, ধবধবে ফরসা রং, টুকটুকে ঠোঁট। কিন্তু কাশ্মীরি খাঁটি আর্য সৌন্দর্যের সঙ্গে যদি পাঠান পুরুষের উদ্ধত ও অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব মিলে যায় তবে কী মিরাকল হতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গুলজার। তার মা কাশ্মীরি ছিলেন, বাবা পাঠান। গুলজারের পুরো নাম, গুলজার আহমেদ পাঠান। কিন্তু ও নিজেকে গুলজার আহমেদ বলতেই ভালবাসে। কয়েকশো রূপবান তরুণ কাশ্মীরি পুরুষের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেও দর্শকের চোখ প্রথমে ওকেই দেখবে। এবং চোখের মালিকটি যদি নারী হয়, তবে সে ওখানেই মরল। লম্বা সুগঠিত চেহারা। হিলহিলে নয়, বরং মজবুত, মেদহীন কাঠামো। নিষ্কলঙ্ক শ্বেত পাথরের উপরে বিধাতা হয়তো অনেক সময় নিয়ে প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে খোদাই করেছেন। যখন বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, মনে হয়, লোকটা খুব উদ্ধত। যখন হেঁটে যায়, মনে হয় তেজি ঘোড়া যাচ্ছে। সবচেয়ে সুন্দর তার চোখ। এমন স্নিগ্ধ নীলাভ এবং ভাষাময় চোখ দুর্লভ। সুর্মার টান তাকে আরও আকর্ষক করেছে। যখন তাকায়, তখন অনেক মেয়েরই হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। দাড়িগোঁফ কামানো মুখে সবসময় নীলাভ আভা। শুধু মাথাঠাসা কাঁচাপাকা চুল দেখলেই বোঝা যায় সে যুবক নয়। কিন্তু ওই কাঁচাপাকা চুলই তাকে আরও সর্বনেশে করেছে। অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্বে ঘেরা বিষণ্ণতা তাকে অন্যদের থেকে একদম আলাদা করে রেখেছে। সব মিলিয়ে পার্ফেক্ট 'লেডিকিলার'।

কিন্তু ঈশ্বর তার কপালে অতুল রূপের সঙ্গে অসীম দুঃখও লিখেছিলেন।

গুলজারভাই শিশমহলের আর এক কপালপোড়া বাসিন্দা। তার আদি বাড়ি ছিল খেমকরণে। খেমকরণ প্রথমে লাহোরের অংশ ছিল। ভারত বিভাজনের পরে প্রাথমিকভাবে অমৃতসরের অংশ হয়। সেখানেই দিব্যি ঘর করছিল ওরা। কিন্তু ১৯৬৫-এ আচমকা পাকিস্তানি ট্যাঙ্কবাহিনী দখল করে নিল খেমকরণ। পাকিস্তানি ও ভারতীয় ট্যাঙ্কবাহিনীর যুদ্ধে ওদের ঘর, পরিবার সব ধ্বংস হয়ে গেছে। গুলজারভাইয়ের মা-ভাই-দিদি, প্রায় সবাই একদিন ভোর রাতে এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল! গুলজারভাইরাও যেত। আগুন ওদেরও ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু কোথা থেকে 'ফরিশতা'র মতো এক ভারতীয় জওয়ান এসে হাজির। নিজের প্রাণ বাজি রেখে সেই যুবক ছ'বছরের গুলজার, ছ'মাসের শিশু আরিফা আর ওদের বাবাকে টেনে বের করে আনে। গুলজারভাইয়ের বাবা পুত্র-কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। তারপর নানা ঝড়-ঝাপটা সামলে রুজি-রোজগারের জন্য নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে পহেলগাঁওয়ে চলে আসেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাড়া করতে-করতে এত দূরেও এসে হানা দেবে তা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। গুলজারভাইয়ের আব্বা অমরনাথের পথে যাত্রীদের ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যেতেন। গুলজারভাই নিজেও অসম্ভব দক্ষ সহিস ছিল। অতি দুর্দান্ত, অবাধ্য ঘোড়াও তার হাতে পড়লে 'মোম' হয়ে যেত। ওটাই ছিল তার রুটি-রুজি। আরিফার স্বামী সলমনও তাদের সাহায্য করত। কিন্তু ২০০০ সালের পয়লা অগস্ট জঙ্গিদের আক্রমণে মারা পড়লেন গুলজারভাইয়ের আব্বু। গুলজারভাইয়ের ঘোড়া 'থকে' ছিল বলে সেদিন সে বাবার সঙ্গে যেতে পারেনি। তবে সলমন গিয়েছিল। উগ্রপন্থীরা তাকেও রেয়াত করেনি। অথচ আব্বা ও সলমনের 'জনাজা' তো দূর, মৃতদেহ চোখে দেখার সৌভাগ্যও হয়নি গুলজার-আরিফার! আব্বা ও সলমনকেও অজ্ঞাত কারণে পহেলগাঁও পুলিশ 'এনকাউন্টারে' নিহত জঙ্গির লিস্টে ফেলে দিয়েছিল। লাশ দাবি করতে গিয়ে হাজার আবেদন-নিবেদন, যুক্তি-বুদ্ধিতেও কাজ হয়নি। মৃতদের দলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যও ছিল। পুলিশ আর আর্মি তখন প্রতিহিংসায় অন্ধ। গুলজারভাই বলেছিল—"আমার আব্বা আর সলমনের লাশ দিয়ে দিন সাব! ওরা উগ্রপন্থী নয়! খুদা কি কসম!"

"শা-লা খুদা দেখাচ্ছে!" আর্মি অফিসার তার দিকে রাইফেল তুলে ধরেছিল, "এক্ষুনি তোকে ঝাঁঝরা করে দেব শালা মা....! তারপর রিপোর্টে লিখে দেব উগ্রপন্থী। তোর খুদা বাঁচাতে পারবে তোকে?"

আরিফা দাদার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার চোখ ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে। "ছেড়ে দাও দাদাকে। দাদা কোনও 'গুনাহ' করেনি।"

"তবে কে গুনাহ করেছে? তুই?"

প্রতিবাদ করার জন্য আরিফা আর গুলজারকে পহেলগাঁও পুলিশ ও আর্মি টেনে হিঁচড়ে জেরা করে হাজতে পুরেছিল। উগ্রপন্থীর আশ্বীয় হওয়ার অপরাধে জেরার নাম করে তিন দিন আটকে রেখেছিল। যখন ছেড়ে দেয়, তখন গুলজার বিধ্বস্ত। আর আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত আরিফাকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল তার সঙ্গে ঠিক কীরকম জেরা হয়েছে।

এই ঘটনার পরই আরিফার মাথাটা বিগড়ে গেল। একলা বসে কখনও বিড়বিড় করে, কখনও উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধরে। অনেক দরগার জল, মন্দিরের প্রসাদ খেয়েও সুস্থ হয়নি। গুলজারভাই পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরে চলে এল। কিন্তু কপাল মন্দ। প্রথম বউটা চিররুগ্ণ ছিল। অমরনাথ কাণ্ডের দু'বছর পরই মরে গেল। বুড়ো বয়সে অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। কিন্তু বুড়ো ঘোড়ার 'লাল লগাম' হওয়ার ফলে বউটা যত না সুন্দরী তার থেকেও বেশি মুখরা! তার চেয়েও ভয়ের আর লজ্জার কথা, মহিলা স্বামীকে রীতিমত সন্দেহ করেন।

একদিন দুঃখ করে বলেছিল গুলজারভাই, "ইয়ারা, ওপরওয়ালায় আমার আর বিশ্বাস নেই। মন্দির, মসজিদগুলোয় কতগুলো মূর্খ গিয়ে ফালতু মাথা ঠোকে। আমিও অনেক মাথা ঠুকেছি। আর ঠুকব না। আর নামাজ পড়ব না।'

ব্যস, ঈশ্বরের সঙ্গে সেইদিন থেকেই গুলজারভাইয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আর কোনওদিন অমরনাথের পথে ঘোড়া নিয়ে সওয়ারির অপেক্ষা করেনি ও। পহেলগাঁও ছেড়ে শ্রীনগরের শিশমহলে চলে এল। এখন শ্রীনগরেই একটা ছোট্ট ধাবায় রাজমা-চাওয়াল রান্না করে। ওর হাতের রাঁধা 'রাজমা-চাওয়াল' যে খেয়েছে, সে জীবনে তার স্বাদ ভুলবে না। মাঝে-মধ্যে ট্যুরিস্টপার্টির রান্নার দায়িত্বও নেয়। যে সব ট্যুরিস্টপার্টি বেড়াতে এসে কাশ্মীরি খাবার খেতে চায়, খুব স্বল্প টাকার বিনিময়ে তাদের কিচেনের দায়িত্বে থাকে গুলজারভাই। ওর রাঁধা 'রাজমা-চাওয়াল', 'ভেড়-বকরির' ঝাল-ঝাল মাংস, নানা ধরনের কাবাব,

বিরিয়ানি, মহাশোল আর 'ত্রোড়গড' তথা ট্রাউট মাছের ঝোল খেয়ে ট্যুরিস্টরা 'লোটপোট' হয়ে যায়। একবার এক ট্যুরিস্ট বলেই ফেলেছিল, "গুলজারভাই, আপনার হাতে স্বর্গ আছে।"

গুলজারভাইয়ের সপাট জবাব, "সাব, আমি 'দোক্তখের বাওয়ার্চি' হতে রাজি আছি। কিন্তু এভাবে আমায় গাল দেবেন না।"

এরকম উত্তর সম্ভবত বেচারি পর্যটক আশা করেনি। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। তারপর ভুলেও আর গুলজারভাইয়ের রান্নার প্রশংসা করেনি সে।

"নে," ডান হাতটা ভরতের দিকে এগিয়ে দিয়েছে গুলজারভাই। লোকটা খৈনি বানাতে ওস্তাদ। ভরত সাবধানে অনেকটা খৈনি নিয়ে মুখে পুড়ল। গত সাত ঘন্টা ধরে প্রায় চার প্যাকেট খৈনি শেষ করেছে সে। মুখে খৈনি পুরে বলল সে, "ভাইজান, তোমার ধাবায় আর কিছু হয়েছে? ওই ব্যাপারটার কী হল? কোনও খোঁজ পেলে? মালিক পুছতাছ করে কাউকে ধরতে পারল?"

গুলজারভাই বাকি তামাকটা মুখে ফেলে হাত ঝাড়ছে, "না রে ভাই। কোন ইবলিশের বাচ্চারা এসব করে বেড়াচ্ছে কে জানে। শালা, ওদের তো কিছু হবে না, পুলিশ ধরলে আমাদেরই ধরবে। গরিব মানুষের কথা হাওয়াও শোনে না, মানুষ তো দূর।"

"আহোঃ" ভরত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। প্রথমদিন নিজের গাড়ির কাচে ভয়ংকর শব্দগুলো দেখে সেও ভয় পেয়েছিল। আর কেউ দেখার আগেই দ্রুত জল ঢেলে মুছে দিয়েছিল কথাগুলো। কিন্তু ঘটনাটা সেখানেই থেমে থাকেনি। প্রথম ঘটনার কয়েকদিন পরই গুলজারভাই যে-ধাবায় কাজ করে, সেই ধাবার প্রত্যেকটা জানালায় একই লেখা দেখা গেল। সেই ভয়ংকর শব্দগুলো জ্বলজ্বল করছে জানালার কাচে— 'সওয়াগতা হৈ জিহাদি।' চোখে পড়া মাত্রই সঙ্গে-সঙ্গে মুছে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু সমস্যা তাতেও মিটল না। পরদিন ভোরে দেখা গেল, এবার আক্রমণ আরও ব্যাপক। শুধু ধাবাই নয়, তার আশেপাশে আরও কয়েকটা দোকানের শাটারে কে যেন রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি এসে লিখে গিয়েছে— 'সওয়াগতা হৈ জিহাদি।'

ভাগ্যিস এখনও পর্যন্ত ঘটনাটাকে চেপেচুপে রাখা গেছে। পুলিশ বা আর্মির চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকত না। হাজতে পুরে পিটিয়েই হাড়গোড় ভেঙে দিত এতক্ষণে। কিন্তু যেভাবে এই অযাচিত উৎপাত ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে তাতে শিগগিরিই নিরীহ ব্যবসায়ীগুলোকেও শ্রীনগর পুলিশ জঙ্গি বলে চিহ্নিত করল বলে।

"সাচামুচা চিতাতা দি বাত। খুব চিন্তার বিষয়," গুলজারভাইয়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। ১৯৬৫ সালের যন্ত্রণা সে জানে। ২০০০ সালের আতঙ্কবাদের ফল নিজের চোখের সামনে রোজই দেখছে। বাপের জন্যান্নার 'কন্ধা' দেওয়ার সৌভাগ্যও হয়নি তার। বিধবা, উন্মাদিনী বোনটাকে তিলে-তিলে শেষ হতে দেখছে। আর কত দেখবে? আর কত দেখতে হবে তাকে?

"যদি আর্মির কানে কথা যায়, আমাদের দানা-পানি জুটবে না।" তার ভয় পাওয়া অযৌক্তিক নয়। কাশ্মীরে সব সময়ই ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা ছাইচাপা। তাই কোনও ঘটনাই এখানে তুচ্ছ নয়। ওই সামান্য কয়েকটা শব্দ— 'সওয়াগতা হৈ জিহাদি'ই দাবানল লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য ভরত হেসে ওঠে, "আরে ক্যাকে, ইসা লাই চিতা না কর। রব দে উতে ভিস্বাস রাখিও। যব দাঁত নেহি থা তো দুধ দিয়া, যব দাঁত দিয়া হ্যায় তো অন্ন নেহি দেগা?" বলতে বলতেই কশুরি ভাষায় গান ধরেছে, "দশ্যোমাস বলিয়ারাস ইয়ারের লাগাভ/ তৈম দোপনাম বোজইন চুস কোন লাগাভ..."

এটা বিখ্যাত সুফি কবি সোচ ক্রলের লেখা গান। 'আমি প্রিয়তমকে ডেকে বললাম, বন্ধু হবে?/ সে বলল, শুনেছি তোমার কথা, চেষ্টা করে দেখা যাক।' কাশ্মীরবাসী বেশির ভাগ লোকই এখনও ইসলামধর্ম বলতে 'সুফিধর্মই' বোঝে। আর সুফি ধর্মের নিয়মানুযায়ী ঈশ্বরই আসলে 'প্রিয়তম'। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের 'মাশুক'-'আশিক' সম্পর্ক। এটা তেমনই একটা গান। কিন্তু গানটা শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল গুলজার আহমেদের। ঈশ্বরের নাম শুনলেই তার পিত্তি জ্বলে যায়। মুখভঙ্গি করে বলল, "হামকো মালুম হ্যায় জন্নত কি হকিকৎ লেকিন/ দিল কো খুশ রখনে কো, 'গালিব' ইয়হ খয়াল আচ্ছা হ্যায়।"

ভরত খোঁচা খেয়ে থেমে যায়। গুলজারভাইটা একেবারে যা-তা। দিল সব মাটি করে। সুফির উত্তরে গালিবকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোথায় সুফি গান শুনে মন শান্ত করবে, তা নয়, ফোড়ন কাটছে। সে বিরক্ত হয়ে বলে, "গয়া ওঁইস পানি মে। এত কষ্টের মধ্যেও এমন চমৎকার গান গেয়ে 'দিল খুশ' করছিলাম। বেরসিকের মতো দিলে সব বরবাদ করে। আরে সুফি না ভেবে, এমনি প্রেমের গান ভেবেও তো শুনতে পারো।"

"কালকে তোকে একবাটি 'পিলা' বিষ দিয়ে যাবো," গুলজারভাই নিস্পৃহ মুখে বলে, "পিলি 'দাল' ভেবে খেয়ে নিস।"

জোরে হেসে উঠতেই যাচ্ছিল ভরত। তার আগেই ব্যাঘাত। কখন যেন একটি কুচকুচে কালো পেল্লায় আকৃতির শিংওয়ালা চতুষ্পদ আচমকা তড়বড় করে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে। অন্ধকারে তার হাসি মাঝপথেই হেঁচকি মেরে থেমে গেল।

"বেড়া গর্গ। সর্বনাশ। গো-মাতা।" বলতে বলতেই ব্রেক কষল ভরত। প্রাণীটা যেমন এসেছিল, অক্ষত শরীরে তেমনই তড়বড় করতে করতে চলে গেল।

"গো-মাতা নয় রে ক্যাকে।" গুলজারভাই গম্ভীর মুখেই জানায়, "গো পিতা। যাও। সুফি গান না গেয়ে সামনের দিকে খেয়াল রাখ। তোর খুদা ট্র্যাফিক পুলিশ নয় যে, 'দিশা' দেখাতে আসবে।" একটু থেমে সে আবার বলে, "তার উপর অনন্তনাগ আসছে।"

অনন্তনাগের নাম শুনেই মুখ গম্ভীর হল ভরতের। অনন্তনাগ এমনিতে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমৃদ্ধ ও অপূর্ব সুন্দর শহর। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের বস্তু। কৃষি, আপেলের ব্যবসা, বয়নশিল্প ও অন্যান্য শিল্পেও এগিয়ে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকেই বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। রাস্তা গিয়েছে ভেঙে। প্রচুর ব্রিজ ও সরকারি অফিস ধ্বংস হয়েছে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ। এমনকী, আজও এখানকার বেশির ভাগ সাধারণ মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে। জীবিকা নেই। আপেলের ক্ষেতে বা অন্যত্র যেসব শ্রমিকরা খাটে তাদের একটা বিরাট অংশই স্থানীয় লোক নয়, অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসেছে। ওরা 'বিদেশি' মজুর, অনেক কম দামে খাটে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ওদের অঞ্চলে। গুটি কয়েক হাতে গোনা বনেদি পরিবার, আর কিছু মুষ্টিমেয় 'নব্য বড়লোক' ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। খুব স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্রের জ্বালা কারও-কারও মনে জন্ম দিয়েছে প্রচণ্ড ক্ষোভের। তাই অন্ধকার নামতে না নামতেই রাস্তার দু'পাশে একগাদা পাথর ও ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একদল মানুষ। ওদের মধ্যে বেশির ভাগই সদ্য কৈশোর অতিক্রম করা তরুণ। কেউ হয়তো একেবারেই বেকার। আবার কেউ বা গায়ের রক্ত জল করে 'বক্তরবন্দাগিরি' বা মেষপালকের কাজ করেও ভরপেট খেতে পায় না। ওরাই বুকে ভর দিয়ে পাথরের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আর গাড়ি দেখলেই শুরু হয়ে যায় ইট পাথরের বৃষ্টি। ওদের একদম সহজ দর্শন। তুমি শালা, কাচে মোড়া গাড়িতে বাদশাজাদা হয়ে ঘুরবে, আর আমি ছেড়ে দেব? বিশেষ করে ট্যুরিস্টবাহী গাড়িগুলোর উপর ভয়ংকর রাগ। কতগুলো অপদার্থ, মূর্খ লোক বেড়াতে যাওয়ার নামে হাজার-হাজার টাকা ছড়ায়। যে জিনিস ওদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, কতগুলো মাথামোটা লোক বিনোদন ও প্রমোদের পেছনে খোলামকুচির মতো তার অপচয় করছে দেখে কি মাথা ঠিক রাখা যায়?

অনন্তনাগের পথে এই অদ্ভুত আক্রমণের কথা অনেকেই জানে। তাই বেশির ভাগ ড্রাইভারই চেষ্টা করে সূর্যের আলো থাকতে-থাকতেই এই রাস্তাটুকু পেরিয়ে যাওয়ার। দৈবাৎ যদি অন্ধকার নামে, তবে গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ফুলস্পিডে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। এই শুনশান

রাস্তায় আক্রান্ত হলে ভগবানও বাঁচাতে আসবেন না! তাই এই সাবধানতা! বাসগুলোর অবশ্য সে উপায় নেই। তাই জম্মু-কাশ্মীর বা জম্মু-পহেলগাঁওয়ের বাসগুলোর জানালার বাইরে মোটা মোটা গরাদওয়ালা খাঁচা বসানো হয়েছে। যাতে ইট-পাথর ছুঁড়লেও যাত্রীদের গায়ে না লাগে।

ভরতও আলো নিভিয়ে দিল। তার স্নায়ু টানটান। তার গাড়িটার থেকে সামান্য এগিয়ে থাকা টাটাসুমোটা কিন্তু আলো নেবায়নি। তার ওপর ঝংঝং করে মিউজিক সিস্টেমে কী যেন একটা গান চলছে।

সে আপন মনেই সামনের গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করে, "আলো নেভায়নি কেন? শা-লা, মরওয়ায়েগা!"

গুলজারভাই হেসে ফেলল, "দ্যাখগে, হয়তো মাশুকার মুখ দেখতে দেখতে গাড়ি চালাচ্ছে! আলো নেভালে মাশুকার মুখ অন্ধকার হয়ে যাবে না?"

"মাশুকাকি তো এইসি কী তেইসি!" ভরত চটে গেছে, "এটা কি প্রেম করার সময়! আর সময় পেল না? একেবারে শ্রীনগরে গিয়ে মুখ দেখলেই তো হয়! এই কয়েক ঘণ্টায় কি প্রেমিকা বুড়ি হয়ে যাবে?"

বেচারি! সে নিজেও কয়েক দিন গুরপ্রীতের মুখ দেখেনি। তাই অন্যের প্রেমের গল্প শুনে চটে যাচ্ছে! উত্তেজিত হয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। খৈনি চাই। ভরত কোনও কারণে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলে বেশি-বেশি 'নেওলা' খেতে শুরু করে। গুলজার হেসে ফেলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই...

ঠং!

প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ! ভরত সচকিত হয়ে ওঠে। যা ভেবেছিল! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়! একটা ইটের বড়সড় টুকরো এসে পড়েছে গাড়ির জানালায়। তবে কাচ ভাঙেনি। কাচের বাইরে লোহার গরাদে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে। সে স্টিয়ারিং শক্ত করে চেপে ধরে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোরে চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হবে। গুলজারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইজান, তাগা বৈঠা! স্পিড বাড়াচ্ছি!"

"আ-হোঃ!"

দাঁতে দাঁত চেপে ভরত অ্যাক্সিলারেটরে চাপ বাড়াল। হয়তো পিছিয়ে দুষ্কৃতীদের পিছনে ফেলে খানিকটা এগিয়ে যেতেও পারত। কিন্তু তার আগেই বাধা! তাদের আগের গাড়িটার হঠাৎ যেন কী হয়ে গেল! ভরত দেখল ওই গাড়িটার ওপর রীতিমত ইটের বৃষ্টি হচ্ছে! মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারাল! টালমাটাল গতিতে আচমকা সশব্দে একটা মোক্ষম ধাক্কা খেল পাথরের গায়ে! এবং প্রচণ্ড শব্দে উলটে পড়ল। ভরত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল গাড়ির খোলা জানালা বেয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে। ড্রাইভারটা গেল বোধহয়!

"বেড়া গর্গ!" সজোরে ব্রেক কষল ভরত। ততক্ষণে উলটো দিক দিয়ে আর একটা বড়সড় সাফারি গাড়িও ফুল স্পিডে এসে পড়েছে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে উলটে যাওয়া গাড়িটার সামনে এসে কোনও মতে থামল! ভাগ্যিস ঠিক সময়ে ব্রেক মেরেছিল ড্রাইভার! নয়তো অ্যাক্সিডেন্টটা আরও মারাত্মক হতে পারত!

ইটবৃষ্টি তখনও থামেনি! একের পর এক আধলা ইটের টুকরো এসে পড়ছেই! ভরত এবার খেপে গেল। গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে।

"শা-লে হরামি! সুয়ার কে বাচ্চোঁ! ফিট্টে মুহ তেরি..." সে গর্জন করে ওঠে, "ডরপোক! পিছন থেকে মারছিস শালো! হিম্মত হৈ যে আগে আ! মৈম কী হৈ, তে কী, তুহানু দস্যোগা! বাহার আ শা-লে!"

অতবড় দশাসই চেহারার লোকটাকে দেখে হয়তো দুষ্কৃতীরা ভয় পেয়ে গেল। ভরতের দৈত্যের মতো চেহারা! তার উপর মোক্ষম একখানা বাজখাঁই গলা! অন্য গাড়িটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ও গাড়ি থেকেও লোক ছুটে আসছে এদিকেই! ফলস্বরূপ বেগতিক দেখে প্রতিপক্ষ রণে ভঙ্গ দিল।

ভরত ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে উলটে পড়া গাড়িটার দিকে! দৃশ্যটা দেখেই তার গা গুলিয়ে ওঠে। ড্রাইভার স্পট ডেড। তার মাথার ঘিলু

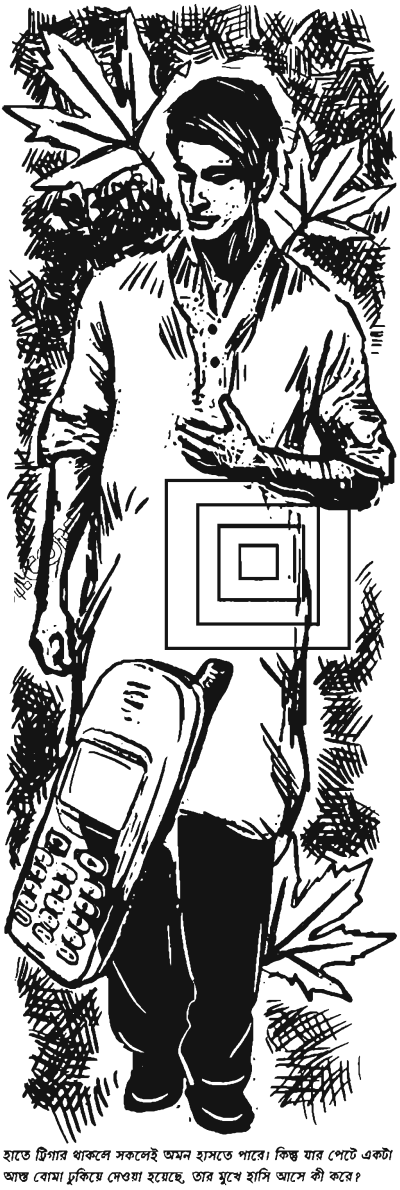

হাতে ট্রিগার থাকলে সকলেই অমন হাসতে পারে। কিন্তু যার পেটে একটা আস্ত বোমা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মুখে হাসি আসে কী করে?

ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। ভরতের অনুসন্ধানী চোখ দেখল পিছনের সিটে কাত হয়ে পড়ে আছে আর একজন। তার বুক কেঁপে ওঠে। লোকটা কি বেঁচে আছে? না এও...

"ঝেলি ফেঁসেঙ্গল শিমে? ইয়েকি দৌ হাউ হাও মা?"

কী? হউমাউ? ভরত বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছন দিকে তাকায়। একটি ফুটফুটে ফরসা ছোটখাটো চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও হাসছে। চ্যাপটা নাক টেনে, খুদে চোখ পিটপিটিয়ে বলল, "শি না জিয়েহয়ো সিঁলে মা?"

এবার তারও রাগ হয়ে গেল। পিছনের সিটের লোকটা বেঁচে আছে কিনা কে জানে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে উদ্ধার করতে হবে। আর এখন এই ভোঁতামুখো সাহেবের 'হউমাউ, মিশি, পিসি, বাপ মা' বলে ঠাট্টা করার শখ হয়েছে। এটা কোত্থেকে আমদানি হল এখানে? অবশ্য হাবভাব আর মুখভঙ্গি দেখে মনে হয় যে, বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করছে। হয়তো জানতে চাইছে, এখানে ঠিক কী হয়েছে? পিছনের লোকটা জীবিত না মৃত, তাই জানতে চাইছে বোধহয়।

ভরত উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তার চক্ষু ছানাবড়া। ও মা! ওই গাড়ি থেকে অবিকল একরকম দেখতে আর একটা লোক এগিয়ে এসেছে। যাব্বাবা। জুড়ুয়া ভাই নাকি? ইতিমধ্যেই গাড়ি থেকে ঝুপঝুপ করে আরও কয়েকজন নামল। এ কী। জুড়ুয়া নয়, তুড়ুয়াও নয়। সব ক'টাই তো একরকম দেখতে। শুধু সামনের সিট থেকে যে-লোকটা নামল, তার চেহারা অন্যরকম। সম্ভবত কাশ্মীরি।

ইতিমধ্যেই একরকম দেখতে লোকগুলো এসে গাড়িটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যথারীতি দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব মাসি পিসি বাপ মা বলে চলেছে।

"কা-ন... কা-ন..." ওদের মধ্যে একজন উত্তেজিত হয়ে বলল, "ঝে মিঙ নানজি শি হাও দে। তা ঝেন্জাই তা দে শৌঝি।"

"কী হয়েছে?" গুলজারভাইও ততক্ষণে শঙ্কিত হয়ে নেমে এসেছে, "লোকগুলো বেঁচে আছে? না সব মরেছে?"

একজন খোঁতামুখো সাহেব উত্তর দেয়, "বু বু! না রেন শি হুও দে। গুয়াও ব্যাংম্যাং মা?"

গুলজারভাই হাঁ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে। এরা কে? ভরতেরও তখন রীতিমত কান্না পাচ্ছে। লোকটা বলছেটা কী? বুবু আবার কে?

শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যেই এক সাহেব বাঁচাল। বলল, "দে তেল দ্যাত, ড্রাইভার ইজ দেদ। বাত দ্য ম্যান ইন ব্যাকসিত ইজ অ্যালাইড। হি ইজ মুভিং। নিদ হেল্প?"

সম্ভবত এই গ্রুপে একজনই অল্প ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। গুলজারভাই তবু কিছুটা ইংরাজি বোঝে। কিন্তু ভরতের কাছে ইংরেজি, চাইনিজ, জুলু— সবই সমান। এবার কাশ্মীরি লোকটি মুখ খুলল। কথাগুলো কাশ্মীরিতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতেই ভরত সম্মতি জানায়। আর সময় নষ্ট না করে সবাই মিলে হাত লাগিয়েছে। গাড়ির যা অবস্থা তাতে যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে। তবু প্রাণ হাতে করে পিছনের আহত ছেলেটাকে বের করার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু উলটে পড়ার দরুন গাড়ির দরজা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। শত টানাটানিতেও খুলছে না।

"এভাবে হবে না," গুলজারভাই ভরতের দিকে তাকিয়েছে, "গাড়িতে বরফ কাটার গাঁইতি-কোদল আছে? চাড় মেরে খুলতে হবে।"

সৌভাগ্যবশত সবই ছিল। অনেক সময় বরফ পড়ে রাস্তা সামরিকভাবে আটকে যায়। তখন কোদাল, শাবল বা 'আইস অ্যাক্স' দিয়ে বরফ পরিষ্কার করা হয়। তাই দিয়ে অতি সাবধানে পিছনের দরজা ভেঙে ফেলল সাহেবরা। আহত মানুষটাকে টেনে বের করে আনল বাইরে। ছেলেটাকে দেখলেই বোঝা যায় সে স্থানীয় ছেলে। ভরত অবাক হয়। স্থানীয় ছেলে হয়েও এত বড় ভুল করল কী করে? আলো নেভাল না, জানালাটাও হাট করে খুলে রাখল। ওর কি মরার শখ হয়েছিল?

যে সাহেব ইংরেজি জানে কপালগুণে সে আবার ডাক্তার। ড্রাইভারকে পরীক্ষা করেই বলে দিল, "হি ইজ দেদ। নো হোপ।"

"আর এই বাব্দা?" গুলজারভাইয়ের প্রশ্ন।

"দ্যাতস আ মিরাকল। হি ইজ পার্ফেক্তলি অলরাইত। ওনলি উন্দ হি গত, ইন হিজ হেদ। আই চেক। ব্রিং দ্য ফার্স্ত এইদ প্লিজ।" সাহেবের সম্ভবত নিজেরই ফার্স্ট এইড বক্স আছে। বলার অবশ্য দরকার ছিল না। তার বন্ধুদের একজন পরিস্থিতি বুঝে আগেই নিয়ে এসেছে ফার্স্ট এইড বক্স। সাহেব ছেলেটার মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। হাতের সামান্য চোট-আঘাতের উপর অ্যান্টিসেপ্টিকের বোতল প্রায় উলটে দিয়েছিল বললেন, "হি ইজ অলরাইত। বাত আ স্ক্যান নিদেদ। মাইন্দ ইত। বেত্তার তেক হিম তু হসপিতাল।"

গাইডের তর্জমা শুনে গুলজারভাই ও ভরত পরস্পরের মুখ দেখছে। এই সাহেবটা জানে না হাসপাতালে ভরতি করার কী হাঙ্গামা। অ্যাক্সিডেন্ট কেস। পুলিশ আসবে। আর যেই শুনবে ভরত আর গুলজারভাই পিছনের গাড়িতে আসছিল, অমনি ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। কী প্রমাণ আছে যে, অ্যাক্সিডেন্টটা ইট ছোড়ার ফলে হয়েছে? ওদের গাড়িই যে ঠুকে দেয়নি তার কী প্রমাণ? স্পটে এসে তদন্ত তো পরে করবে। তার আগেই দুই মূর্তিকে চেপে ধরে 'মামাবাড়ি'তে পাঠিয়ে দেবে। এই 'মাসি পিসি, ব্যাং চ্যাং'দের সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। এই অন্য গ্রহের প্রাণীগুলোকে নিয়ে গেলে, পুলিশের সঙ্গে ফাজলামি করার দায়ে কতগুলো কেস ঠুকবে তার ঠিক নেই।

গুলজারভাই একটু থেমে সাহেবদের ধন্যবাদ জানায়, "শুক্রিয়া।"

তার বডি ল্যাঙ্গোয়েজে কথাটা আস্তাজ করতে পেরেছে সাহেব। হেসে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "মেনশন নত। ত্যাঙ্ক ইউ।"

ওরা চলে গেল। যাওয়ার আগে ওদের কাশ্মীরি গাইডকে আহত ছেলেটাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল গুলজারভাই। কিন্তু গাইড সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব পর্যটকরা সুদূর চীন থেকে এসেছেন। একটা মুভি তৈরি করছেন কাশ্মীরের ওপর। মুভিটার নাম 'কেশেনমিয়ের, শেঙ্গু।' শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদ, শঙ্করাচার্য এবং পহেলগাঁও-এ অমরনাথ দর্শন সেরেছে। এর আগে ওরা লাদাখের লেহতে ক্যাম্প করে প্রায় উনিশ কিলোমিটার দূরে 'থিকসে' মনাস্টারির গুটিং করছিল। এখন যাচ্ছে জম্মু। গুলমার্গের সেন্ট মেরি চার্চ আর তারপর বৈষ্ণোদেবী কভার করবে। তাই এসব ঝুট-ঝামেলাতে ফাঁসতে চায় না।

"হুনা সানু কী করানা?" গুলজার মুখভঙ্গি করছে, "ওরা তো 'ঠেঙ্গা' দেখিয়ে চলে গেল।"

ভরত চিন্তায় পড়ে। এখানে আর কোনও গাড়ি পাওয়া মুশকিল। এলোপাথাড়ি ইট বর্ষণের ভয়ে কোনও গাড়ি এখানে দাঁড়ায় না। চতুর্দিক শুনসান। বাড়ি তো দূর, একটা পান-সিগারেটের দোকানও নেই। কার কাছে সাহায্য চাইবে? আমতা-আমতা করে বলল, "অনন্তনাগ পুলিশের কাছে নিয়ে যাব ছেলেটাকে?"

"পুলিশ।" সজোরে হেসে উঠল গুলজার, "ক্ষত্রি পুত্তর, কিস দা না মিওর। বহুত পুরাণ কাহাওয়াত। পুলিশ কারওর বন্ধু হয় না রে। নামেই 'পাবলিকের দোস্ত', আসলে দুশমন। যখন প্রশ্ন করবে লোকটা কে, কোথায় পেলি, কী করে অ্যাক্সিডেন্ট হল, তখন কী বলবি? তার ওপর আবার একজন মরেও গেছে। তারপর তদন্ত ছাড়াই যখন তোর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে খুনি বলে, তোরই বিরুদ্ধে অ্যাক্সিডেন্টের চার্জশিট তৈরি করবে, তখন কী করবি? চাক্কি পিসিং, পিসিং অ্যান্ড পিসিং?"

ভরত একটু ভাবে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। সে একটু থেমে বলে, "তবে আর্মি?"

গুলজার আরও জোরে হেসে উঠেছে। হাসতে-হাসতেই ফের আর একটা পঞ্জাবি প্রবাদকে একটু পালটে বলল, "আর্মি দা পুত/ কোই জিন, কোই ভূত/ সা-লে, খল্লা খাঁ দি সপুত।"

আর্মি নাকি ভূত! আসলে গুলজারভাই ভগবানের পাশাপাশি পুলিশ বা আর্মিকেও বিশ্বাস করে না। অগত্যা এ সমাধানটাও জলে গেল।

"তাহলে চলো শ্রীনগরের হাসপাতালেই ভর্তি করে দিই।"

AMARBOI.COM

"গধে দি পুত্তর," গুলজারভাই ধমক দেয়, "লোকটা সম্পর্কে কিছু জানিস? নাম, ধাম, কোথায় থাকে, কী করে— জানিস এসব? ডাক্তার যখন জানতে চাইবে, কী বলবি?"

তাও বটে। ভরত মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তবে একটা রাস্তা তো বাতলাও ভাইজান। ছেলেটা বেহোশ। এই অবস্থায় তো ওকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না। ওয়াহেগুরুর কাছে কী জবাব দেব?"

"নিকুচি করেছে তোর ওয়াহেগুরুর। পুলিশকে, হাসপাতালকে কী জবাব দিবি আগে ভাব।" গুলজারভাই একটু চিন্তা করল। একটু ভেবে বলল সে, "লোকটা নিশ্চয়ই খালি হাতে যাচ্ছিল না। লোকটার পকেটে মানিব্যাগ আছে কিনা দ্যাখ তো।"

ভরত ছেলেটার বুকপকেট, হিপপকেট সার্চ করে দেখে জানায়, "কিছু নেই ভাইজান।"

"পিছনের সিটটা দেখেছিস? ভিতরে কোনও ব্যাগ-ট্যাগ দেখলি? একটা কিছু তো সঙ্গে থাকবে। সেখানে যদি নামধাম কিছু লেখা থাকে..."

পরামর্শটা মনে ধরল ভরতের। মানিব্যাগ নেই বটে, তবে দুটো বড়-বড় প্রমাণ সাইজের ব্যাগ আছে। সে প্রায় অষ্টাবক্রমুনির মতো বেঁকে কোনও মতে ব্যাগদুটো টেনে হিঁচড়ে বের করল। প্রথম ব্যাগটায় গুচ্ছ টি-শার্ট আর জিনস। প্রাণপণে খুঁজেও কোনও ধরনের পরিচয়পত্রই পাওয়া গেল না। শুধু অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভিতরের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকে মোড়া বাচ্চাদের মোবাইল বেরিয়ে এল।

গুলজারভাই যথারীতি বিরক্ত, "খোদা পাহাড়, নিকলা চুহা। সা-লে বেড়াতে এসেছে, কোথায় পকেটে পরিচয়পত্র রাখবে, তা নয়, এই তিন পয়সার খেলনা মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কী যত্নে রেখেছে দেখ। যেন খেলনা মোবাইল নয়, হিরে-জহরত নিয়ে যাচ্ছে। ফেলে দে, ওটাকে ছুড়ে ফেলে দে।"

ভরতও বিরক্ত হয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেটসুদ্ধ মোবাইলটাকে অযত্নভরে মাটিতেই ফেলে দিল। এখন সে দ্বিতীয় ব্যাগটায় মনোনিবেশ করেছে। এটাতেও কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। চেন টেনে খুলছেই একগাদা জামাকাপড় বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিকর। এত জামাকাপড় নিতে পারল, অথচ একটাও কাজের জিনিস নিয়ে বেরোতে পারল না। মুরাখ...।

ভাবতে-ভাবতেই থমকে গেল সে। বিরক্ত হয়ে এতক্ষণ জামাকাপড় সরাচ্ছিল। কিন্তু এ কি! জামাকাপড়ের নিচে কড়কড় করছে...এগুলো কী? বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, বান্ডিল-বান্ডিল কড়কচ্ছাপ নোট। টাকা। এত টাকা। জীবনে এত টাকা কোনওদিন দেখেনি ভরত। এত টাকা নিয়ে লোকটা কোথায় যাচ্ছিল?

সে টের পেল, তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম! ঢোঁক গিলে কাঁপাস্বরে বলল, "ভাইজান, ইখে আও! ইসা নু দেখো!"

বলাই বাহুল্য, জামাকাপড়ের পাহাড় থেকে এবার 'চুহা' বেরোয়নি।

চার

তুষার। শুভ্র তুষার। শীতল সে মৃত্যুগহ্বর।

চতুর্দিকে শুধু সাদা বরফ। থাকে-থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে শুভ্র তুষারের ঢল। বরফের সাদা থাবা যেন গোটা পাহাড়কে হস্তগত করেছে। ওপর থেকে নেমে আসতে-আসতে যেখানে বরফের চাঙড় থমকে গিছে, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়েছে লিডার নদী। কোলাহৈ হিমবাহর গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে লিডারকে পুষ্ট করছে।

কাশ্মীরের আকাশকে বৃহদাকৃতি 'নীলা' বললে, লিডার নদীকে 'গলন্ত পান্না' বলতেই হয়। নদী নয়, প্রকৃতি যেন সবুজ বেলোয়ারি কাচের চুড়ি পরে, আপনমনেই চুড়িগুলোকে ঝামরে-ঝামরে আওয়াজ তুলছে। তার ছনছন শব্দ পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। দুরন্ত অথচ মসৃণ গতিতে তীব্র তরঙ্গ তুলে গর্বিত ভঙ্গিতে চলেছে লিডার। তার চলায় গর্ব থাকলেও ঔদ্ধত্য নেই। আত্মবিশ্বাসী, অথচ ভীষণ খামখেয়ালি! দেখলে মনে হয়, কোনও উদ্ভিন্নযৌবনা নাগকন্যা পথ ভুলে চলে এসেছে এই উপত্যকায়। স্বচ্ছ সবুজ পরিধানের আপাত গোপনীয়তায় অস্পষ্ট অথচ রহস্যময় মসৃণ, পেলব দেহের ভাঁজ। জীবন্ত প্রহেলিকা! কিছু দেখা যায়, কিছু যায় না! কিন্তু স্পষ্ট সমস্ত উত্থান পতন। তরঙ্গে-তরঙ্গে যেন অজস্র ফণা দংশনোদ্যত। কখনও সরলরেখায়, কখনও ঘূর্ণনে জল নেচে-নেচে ওঠে। সূর্যালোকের দুষ্টু হাসি জলের কোথাও একটু অন্রের চিকমিক, কোথাও ঝিকমিক এঁকে দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। লক্ষ-লক্ষ পাইনগাছ জলের আরশিতে মুখ দেখছে। কোথাও আবার দস্যু পাথর প্রেমিকের মতো জগদ্দল শরীর পেতে নদীকে আটকাতে চায়। লিডারের রেশমি দেহ প্রেমিক পাথরের কঠিন গায়ে ভরপুর লাস্যে এলিয়ে পড়ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদা ফেনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে খুনসুটি। উছলে-উছলে, উথলে-উথলে সে যেন হাসতে হাসতে চলেছে।

প্রফেসর সাব লিডারের বুকে একখানা পাথরের উপরে বসে আছেন। চশমার পিছনের গভীর চোখ দুটো অন্যমনস্ক। চশমার কাচে সুদূর অতীতের ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

"এরপর কাশ্মীরের জমিতে একটা অদ্ভুত খেলা শুরু হল। বৌদ্ধধর্ম আর শৈবধর্ম যেন লুকোচুরি খেলতে শুরু করল। নৃপতি বদলায়, বদলায় রাজবংশ। সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ধর্মমতও। কখনও শিবের পূজারিরা বৌদ্ধধর্মকে তাড়াতে উদগ্রীব। কখনও বা বৌদ্ধরা শৈবধর্মকে অগ্রাহ্য করে বয়ে নিয়ে চলেছে গৌতম বুদ্ধের পতাকা। কখনও ত্রিশূল হাতে উগ্রচণ্ড শৈবধর্ম কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করছে। কখনও বা একেবারে শাওলিন কুংফুর প্যাঁচে বৌদ্ধধর্ম শৈবদের মাটিতে পেড়ে ফেলছে। এই 'টুকি-ই-ই' আর 'ধপ্পা'র খেলা কত দিন চলত কে জানে। রক্ষা করলেন রাজা ললিতাদিত্য। 'কারকোটা' বা 'কর্কটা' রাজবংশের রাজত্ব চলাকালীনই পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কাশ্মীরে এসেছিলেন। তখনই তিনি লক্ষ করেছিলেন রাজা দুর্লভবর্ধন ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্টই উদারপন্থী। এর কিছু পরেই ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ললিতাদিত্য মুক্তিপদ কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শৈব ও বৌদ্ধধর্ম এবার হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলতে শুরু করল। এই প্রথম দুই ধর্ম কোনও রকম বিরোধিতা না করেই সুখী সহাবস্থানে বিরাজ করল গোটা কাশ্মীরে।

"এত সব কিছুর মধ্যেই অবশ্য ঘটে গিয়েছে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা। তখনও শৈব বা বৌদ্ধ ধর্মের কোনওটাই কাশ্মীরের মাটিতে জমিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারেনি। তার আগেই একজনের পবিত্র মানুষের পা চুপিচুপি স্পর্শ করেছিল কাশ্মীরকে," প্রফেসর সাহেব একখানা বহু পুরনো, হলদে হয়ে যাওয়া, মলিন বইয়ের পাতা খুললেন। সেখানে একটা আবছা হয়ে আসা ছবি। ছবির প্রেক্ষাপটটা ছোট্ট স্বরাজের চিনতে অবশ্য অসুবিধে হয়নি। কাশ্মীরেরই কোনও এক প্রত্যন্ত প্রদেশে বরফে ঢাকা এক প্রাচীন গুপ্ত গুহা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক অদ্ভুত শান্ত অথচ দীপ্তিময় পুরুষ। চেহারাটা চেনা-চেনা। অথচ চিনতে পারছে না।

"ইনি কে?"

প্রফেসর স্মিত হাসেন, "জেসাস ক্রাইস্ট। সাহেবদের ভগবান। চিনিস? নাম শুনেছিস?"

স্বরাজের ছোট্ট দেহে খেলে যায় বিদ্যুতের শিহরন। সে জেসাস ক্রাইস্টের নাম শুনেছে। এখানে অনেক সাহেবসুবো জেসাস ক্রাইস্টের কথা বলে। গুলমার্গের সেন্ট মেরি চার্চে সে জেসাস ক্রাইস্টকে দেখেছে। ফাদারের মুখে মানুষটার গল্পও শুনেছে। মানুষের হিতার্থে ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাসি মুখে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পিছ পা হননি। মানুষের মঙ্গলের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও দিয়ে গিয়েছেন। জেসাস ক্রাইস্টের কথা মনে পড়লেই বড় কান্না পায় তার। কোনও মানুষ কি এ কাজ করতে পারে?

সেই জেসাস ক্রাইস্ট, তথা গুরু ঈশাও এসেছিলেন কাশ্মীরে। ছোট্ট

স্বরাজ অভিভূত হয়ে বলে , "সত্যি?"

"হয়তো সত্যি, " প্রফেসর সাব একটু চুপ করে থেকে জানান, "যদিও এখনও তেমন স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। তবু অনেকেই বলে, উনিও এখানে এসেছিলেন।"

সে একটু চুপ করে থাকে, "তবে কাশ্মীরের আসল ধর্ম কী? কোন ধর্মের কথা বারবার আমাকে মনে করিয়ে দেয় ওরা প্রফেসর সাব? শুরু ঈশা মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণ নেননি। লালা মানুষের হিতার্থে আমার বলি চায়। শুধু আমি নই, অনেক বেকসুর মানুষও মারা যাবে। এত রক্ত ছড়িয়ে মানুষের কোন ভাল করতে চায় লালা? কোনও ধর্মেই লেখা নেই মানুষ খুন করে মানুষের মঙ্গল করা সম্ভব! তবে ওদের ধর্ম কী? লালার ধর্ম কী?"

প্রফেসর সাব দাড়িগোঁফের ফাঁকে শান্ত হাসলেন। স্বরাজ ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করল, "লালার কৌম কী? লালা, আক্কাদের ধর্ম কী প্রফেসর সাব?"

তিনি নিরুত্তর। লিডারের বুক থেকে উঠে আসছে ঘন সবজে ধোঁয়া। আস্তে-আস্তে তার অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে গেল ধোঁয়ায়। প্রফেসর সাবকে আর দেখা যাচ্ছে না! তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্দিকে এখন অদ্ভুত একটা ধোঁয়া।

সে অসহায় হাত বাড়িয়ে প্রফেসর সাবকে খুঁজছে। কাতর গলায় বলল, "প্রফেসর সাব! কোথায় গেলেন? লালার কৌম কী? লালার ধর্ম কী?"

তার চোখের সামনে থেকে প্রোফেসর সাবের অবয়ব মুছে যাচ্ছে। ধোঁয়াশাও কাটছে একটু একটু করে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় স্বরাজ। প্রথমেই কপালে একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ তার চেতনাকে অবশ করে দিল। অসম্ভব কষ্টে ককিয়ে উঠে বলল, "পানি।" তার অস্পষ্ট দৃষ্টির সামনে ঝুঁকে পড়েছে একটা মুখ। কার মুখ বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ঠোঁট দুটো ভিজে যাওয়ায় বুঝতে পারল আগন্তুক মুখে জল ঢেলে দিয়েছে। অতিকষ্টে ঢোঁক গিলে খানিকটা জল খেল সে। এতক্ষণ যা টের পাওয়া যাচ্ছিল না, এবার সেই অনুভূতিগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে। সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে। তবে দৃষ্টি আস্তে-আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে! স্বরাজ বিস্মিত, অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে এবার চারদিকটা দেখল। এটা কোন জায়গা? কোথায় আছে সে?

"ওয়াহেগুরুর অসীম কৃপা," তার সামনে ঝুঁকে পড়া মুখটা বিড়বিড় করে বলল, "শায়দ হোশ আ গয়ি।"

স্বরাজ বিহ্বল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকায়। একটা ছোট্ট খুপরি ঘরে শুয়ে আছে সে। ঘরের যা সাইজ, তাতে হয়তো একটা প্রমাণ সাইজের ডবল বেডও কষ্টেসৃষ্টে আঁটবে না। অথচ অন্তত দশ-বারোজন গুঁতোগুঁতি করে এই ঘরে উপস্থিত। প্রত্যেকেই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, উপস্থিত জনতার অধিকাংশই বুড়োবুড়ি। একজন তাকে নড়তে দেখে প্রশ্ন করে, "জিখে হৈ মারো গিফট! মেরে লিয়ে ক্যায়া লায়া হ্যায়?"

অন্যজন প্রশ্ন করে, "তুই অমরজিতের পুত্তর না? কেমন আছে তোর বাপ?"

স্বরাজ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকে! এটা কোন জায়গা? সে কীভাবে এখানে এসে পড়ল? যন্ত্রণায় মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে। আঃ! কষ্ট হচ্ছে, তবু আস্তে-আস্তে কিছুক্ষণ আগের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করে। কী হয়েছিল? তারা জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথে যাচ্ছিল। আচমকা একটা অ্যাক্সিডেন্ট! গাড়িটা উলটে গেল। সামনের সিটে আক্কাদ এলিয়ে পড়েছে... গাড়িটা ভল্ট খাচ্ছে...

দৃশ্যটা মনে পড়তেই আঁতকে ওঠে সে। আক্কাদ কোথায়। সে কি বেঁচে আছে? এরা কারা? অমরজিতের পুত্তর, গিফট— কী বলছে।

"এখন কেমন লাগছে?" সামনের লোকটা আলতো স্বরে জানতে চায়, "তুমি খুশকিসমত যে বেঁচে গেছ। তোমার বন্ধু বাঁচেনি। বেচারা ওখানেই খতম।"

"কী হৈয়া?" এক বৃদ্ধ তাকে খোঁচা মারল। বাচ্চাদের মতো আবদেরে সুরে বলল, "আমার গিফট কোথায়? মৈনু মেরে দাতা দে— এ না।"

"আঃ। দাদাজি।" অপরিচিত উদ্ধারকারী আলতো ধমক দেয়, "অসুস্থ ছেলেটাকে পরেশান না করলে চলছে না তোমার? আগে সুস্থ হোক, তারপর গিফট দেবে।"

ধমক খেয়ে বুড়োবুড়িদের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায়। তারা আপনমনেই বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে। সে একঝলক তাদের দেখে হেসে ফেলে, "সব বুড্যা বুড্যি, বুঝলে? এঁরা আমার দাদা-পরদাদা। লম্বি উমর। ভগওয়ান ওঁদের নিতে চায় না। আর ওঁরাও স্বর্গে যেতে চান না! তাই এখানেই রয়ে গিয়েছেন। পাত্তা দিও না! কী যে বলেন, আর কাকে বলেন নিজেরাই জানেন না। ওঁদের সবার ভুলে যাওয়ার বিমারি আছে। কিছু মনে কোরো না ভাই।"

স্বরাজ তখনও বিস্ময়ের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কী বলল লোকটা? আক্কাদ অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে? বলাই বাহুল্য এই মুহূর্তে যেটা সে অনুভব করছিল, সেটাকে কোনও মতেই দুঃখ বা শোক বলা যায় না। বরং প্রথমে অদ্ভুত একটা স্বস্তি পেল। কাঠবিড়ালির মতো একটা চাঞ্চল্য, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল তার মস্তিষ্কে! যাক, তাহলে এখন তার উপর নজর রাখার কেউ নেই। যোগাযোগের জন্য একটা মোবাইল ছিল আক্কাদের পকেটে। অ্যাক্সিডেন্টে সেটাও হয়তো গিয়েছে। এই মুহূর্তে লালা কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারবে না তাকে। জানতেও পারবে না যে আক্কাদ মরে গিয়েছে। স্বরাজও তার হাতের বাইরে। এখন সে কী-কী করতে পারে? তিন লাখ টাকা নিয়ে যেখানে খুশি পালিয়ে যেতে পারে। বোমের ট্রিগার, অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোলটাকে নষ্ট করে ফেললেও কেউ বাধা দিতে আসবে না। কিংবা কোনওভাবে তার পেটের বোমাটাকে বের করেও ফেলতে পারে। কিন্তু কীভাবে? স্বস্তির মধ্যেই এবার আতঙ্কের ছায়া পড়ল। যতটা স্বস্তিবোধ করছিল তার চেয়েও প্রবলভাবে এবার নখ-দাঁত বের করল ভয়! সত্যিই কি নজর রাখার কেউ নেই? লালা যদি জানতে পারে। লালা যদি বুঝে ফেলে যে, স্বরাজ গদ্দারি করেছে, তবে কি ছেড়ে কথা বলবে? তার বাবা-মা-বোনকে ওখানেই শেষ করে দেবে! স্বরাজও বাঁচবে না। লালা নিজেই জানিয়েছিল,

"গদ্দারির কথা ভুলেও একদম ভাববি না। আমার হাত কত লম্বা তোর ধারণাই নেই। আমার লোক সব জায়গায় আছে। কোথাও পালিয়ে পার পাবি না।"

তার মনের অবস্থা তখন কাউকে বোঝানোর মতো নয়। এই অদ্ভুত যন্ত্রণা কেউ বুঝবে না। মনটা পেন্ডুলামের মতো একবার বিশ্বাস ও আশার দিকে ঝুঁকছে, পরক্ষণেই অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের দিকে হেলে পড়ছে। সেকেন্ডের কাঁটার মতো হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে। চরম নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। এরা যে লালারই লোক নয়, তাই বা কে জানে? হয়তো এই লোকটাই...

"আরে ভাই, নাম তো দস্যো!" মানুষটা হাসল, "আমি ভরত শেরগিল। তোমায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে আমরাই তুলে নিয়ে আসি। তোমার কাছে কোনও পরিচয়পত্র ছিল না বলে সাহস করে হাসপাতালে দিতে পারিনি। তাই..."

এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহের কাঁটাটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। পরিচয়পত্র খুঁজে না পাওয়াই স্বাভাবিক। লালা অবশ্য স্বরাজের নকল পরিচয়পত্র সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ব্যাগে ছিল না। আক্কাদ গাড়ির কাগজপত্রের সঙ্গে সেটাও গাড়ির লকারে ঢুকিয়ে রেখেছিল। লোকগুলো হয়তো তোবড়ানো লকার অবধি পৌঁছতে পারেনি। অথবা খুলতে পারেনি। সে ইতস্তত করতে করতে কাশ্মীরী ভাষায় জানায়, "আমি স্বরাজ কাটরা। জম্মুতে থাকি। শ্রীনগরে আমাদের রিশতেদারের কাছে যাচ্ছিলাম। কিন্তু..."

কথাগুলো বলে ফেলেই সে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছে। সে কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলে ফেলেছে। 'কাটরা' টাইটেলটা জম্মুর উঁচুজাতের হিন্দু ব্রাহ্মণদের পদবি। তারা কখনও কশুরি ভাষায়

AMARBOI.COM

কথা বলে না। শুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলে। কেউ কেউ আবার ডোগরিতেও কথাবার্তা চালায়। কিন্তু কশুরি বলে না। লালা পইপই করে বলে দিয়েছিল কশুরিতে কথা না বলতে। কিন্তু দুর্ঘটনার ধাক্কায় ভুলে গিয়েছিল।

ভরত শেরগিল হাসল। স্বরাজ আশ্চর্য হয়। লোকটা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেনি। হয় সে অত্যন্ত সরল, নয়তো...

"তবে রবজি তোমার উপর মেহেরবান। এই মুহূর্তে তুমি শ্রীনগরেই আছ। শ্রীনগরে কোথায় থাকেন তোমার রিশতেদার?"

"শিশমহল।"

স্বরাজ জায়গাটার নাম মনে করে বলে। এই নামটাই বলেছিল লালা। বলেছিল, "শিশমহলে আমাদের লোক আছে। আব্বাদ লোকটার নাম-পাতা সব জানে। ও তোকে ওর কাছে ঠিক নিয়ে যাবে। ওখানে গেলে দেখবি কাশ্মীরের মানুষ কী প্রচণ্ড কষ্টে আছে। বুঝবি, কেন আমরা জিহাদ করছি।"

"শিশমহল।" ভরতের চক্ষু ছানাবড়া, "বলো কী। কী ইত্তেফাক! রবজি তোমাকে একেবারে ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছেন। এটাই তো শিশমহল। কার বাড়ি যাবে তুমি? তোমার আত্মীয়ের নাম কী পুত্তর? কোনও কাটরা এখানে থাকে বলে তো জানি না।"

এবার প্রমাদ গুনল স্বরাজ। অবিশ্বাসের পাল্লা ভারী হচ্ছে! অ্যাক্সিডেন্টের পর যেখানে খুশি গিয়ে পড়তে পারত সে। কোনও উদ্ধারকারী দল তাকে জম্মুতে নিয়ে যেতে পারত। অথবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত পহেলগাঁওয়ে। অথবা সে পড়ে থাকতে পারত অনন্তনাগেই। কিন্তু তাকে এসে পড়তে হল সেই শিশমহলেই। এ কি শুধুই ইত্তেফাক? কাকতালীয় ঘটনা? শিশমহলের লোকটার পরিচয় শুধু আব্বাদই জানত। কিন্তু সে নেই। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করা যাবে না। কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। এদের মধ্যে যে-কেউ লালার চর হতে পারে।

সে অবার ভুল শুধরে নিয়ে শুদ্ধ হিন্দিতেই বলে, "নাম তো ঠিক জানি না। আসলে আমার নয়, আমার দোস্ত আব্বাদের রিশতেদার থাকে এখানে। তার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু আব্বাদ..."

দুঃখিত হয়ে মাথা ঝাঁকায় ভরত। কী আশ্চর্য! লোকটা এরকম একটা খোঁড়া যুক্তিও নির্বিবাদে বিশ্বাস করে ফেলল! ও আদৌ কি এতটাই সরল? নাকি অন্য কিছু...?

"বদনসিব।" সে বিমর্ষ মুখে বলে, "একটা ফালতু অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণ গেল বেচারার। যাক গে, তুমি যখন শিশমহলের কারওর মেহমান, তখন আমাদের সবার মেহমান। আপাতত এখানেই আরাম করো। পরে খুঁজে বের করব তোমার বন্ধুর রিশতেদারকে।"

স্বরাজ বুঝতে পারে না কী বলবে। কী করে বোঝাবে যে, আব্বাদের তথা লালার বন্ধুকে খুঁজে বের করার ইচ্ছে তার আদৌ নেই। বরং এখান থেকে পালাতে পারলেই সে বাঁচে। কিন্তু পালানোর কি আদৌ কোনও পথ আছে?

ভরত শেরগিল চলে যাচ্ছিল। স্বরাজ সচকিত হয়ে বলে, "আমার ব্যাগগুলো?"

মানুষটা মৃদু হেসে ইশারায় তার পিছন দিকটা দেখায়। স্বরাজ এতক্ষণ লক্ষ করেনি। এবার চোখে পড়ল, যেখানে সে শুয়েছিল ঠিক তার পিছনেই কাঠের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা আছে তার ব্যাগদুটো। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগদুটোও এসেছে। সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ভরতের দিকে তাকিয়ে ব্যাগগুলো টেনে নেয় কাছে। এক মুহূর্তের জন্য ভরতের মুখে একটা শঙ্কা মৃদু ছাপ ফেলল যেন! তারপরই সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

"চল হট বাওড়ো।" এক বুড়ি কথা নেই বার্তা নেই এক বুড়োকে আচমকা ঠ্যালা মেরে বলে, "মুঝে শাদি নহি করনি।"

"ওয় মিঠাড়ি," বুড়ো চোখ পিটপিট করে বলল, "চুড়িয়াঁ লাকে দু? পায়েল নিবি?"

'মিঠাড়ি', অর্থাৎ সুইটহার্ট। বুড়ি লজ্জায় উড়নি ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে। যৌবনে হয়তো ঠিক এমন করেই লজ্জা পেয়ে এই অগ্নিবর্ণা কাশ্মীরি সুন্দরী দাঁতের ফাঁকে ওড়না চেপে ধরেছিল। কিন্তু এখন সম্ভব নয়। কারণ সব দাঁতই পড়ে গিয়েছে। তবু ফরসা রঙে লজ্জার রক্তিমাভা চমৎকার ফুটল। ফোকলা হাসিতে লজ্জার অপরূপ প্রতিভাস। বুড়ো আদর করে তার থুতনি নেড়ে দেয়, "সৌড়িয়ো, বল দেখি, কাশ্মীরের বরফিলি হাওয়ায়, ঝিলের পাশে বসে হীর রাঞ্ঝাকে কী বলেছিল?"

বুড়ি খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর বুড়োকে বলল, "উল্লুকে পাঁটঠে, হিরো মত বন। সোয়েতারা পরে নে।"

এত দুঃখেও হাসি পেয়ে গেল স্বরাজের। এরা দু'জনেই বোধহয় ভুলে মেরেছে যে, বহু বছর আগেই ওদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন নাতি-নাতনি, পুতি-পুতনিতে ঘর ভরে আছে। বার্ধক্যকে ভুলে গিয়ে দিব্যি যৌবনেই থমকে গেছে ওরা। এখনও কী সুন্দর রোম্যান্স করে চলেছে! সব মানুষ যদি এমন করেই বর্তমানকে ভুলে যেতে পারত। তার মনে হল 'ভুলে যাওয়ার' অসুখটা আদৌ অভিশাপ নয়। আশীর্বাদ। যদি স্বরাজও ওই অ্যাক্সিডেন্টে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যেত! যদি ভুলে যেত লালার কথা, তার 'মিশন'-এর কথা, পেটের বোমাটার কথা... তবে এই মুহূর্তে সেও জীবনের ভরপুর আস্বাদ নিতে পারত।

কিন্তু ভুলে যাওয়ার মতো 'খুশনসিব' সে নয়। মাথাটা এখনও যন্ত্রণায় দপদপ করছে। তবু পাত্তা দিল না স্বরাজ। সে ব্যাগ খুলে প্রথমে টাকার বান্ডিলগুলো এক ঝলক দেখে নেয়। নাঃ, ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন বান্ডিল খুলে-খুলে গুনে দেখার মানসিকতা নেই তার।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাগের ভিতরের পকেটে হাত দিতেই যেন আচমকা দপ করে মাথার যন্ত্রণাটা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে, মাথার ভিতরে কেউ কয়েকশো ভোল্টের বৈদ্যুতিক হ্যাঁকা দিয়ে চলেছে। ঝনঝন করে উঠল তার মাথা। একী! সেই ছোট্ট খেলনার মতো দেখতে মোবাইল ফোনটা তো নেই! ওটাই তো ওর পেটে লুকিয়ে থাকা বোমার ট্রিগার! যতদূর মনে পড়ছে ব্যাগের একদম ভিতরের পকেটে, প্লাস্টিকে মুড়ে খুব সযত্নে রেখেছিল আব্বাদ। অথচ সেখানে নেই!

উন্মাদের মতো দুটো ব্যাগ ঝেড়েঝুড়ে দেখল স্বরাজ। আঁতিপাতি করে খুঁজছে। ওদিকে ব্যাগের সমস্ত জামাকাপড় যে মেঝেতে ধুলোর মধ্যে অযত্নে গড়াগড়ি খাচ্ছে, বুড়োবুড়ি মনের আনন্দে সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখছে, সেদিকে খেয়ালই নেই তার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল ওই ট্রিগারটা। ওই ছোট্ট যন্ত্রটাই এখন তার বাঁচা বা মরার নির্ণায়ক।

কোথাও নেই। অসহায়ের মতো মাথার চুল খামচে ধরেছে সে। এই মুহূর্তে যে কেউ তাকে দেখলে পাগল ভাববে। চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছে, বারবার ব্যাগ হাতড়াচ্ছে। অসহায়ের মতো দু'পা ছড়িয়ে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে অনির্দিষ্টের উদ্দেশে তাকিয়ে থাকল, তারপরই আবার প্রাণপণে পাগলের মতো খুঁজছে। একটা অসহায় কান্না দলা পাকিয়ে উঠে আসতে চাইছে শ্বাসনালী বেয়ে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না। অসহ্য উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছে সে। তবু হাল ছাড়ছে না। পেতেই হবে। খুঁজে পেতেই হবে ওই মারাত্মক যন্ত্রটা। যে কোনও মূল্যেই হোক... জিনিসটা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। নেই... কোথাও নেই। হয় হারিয়ে গিয়েছে, নয়তো...

অদ্ভুত অসহায়তায়, আতঙ্কে হা হা করে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

পাঁচ

"তুই দুশমন।"

আরিফা দু'চোখ লাল করে তাকাল গুলজার আহমেদের দিকে, "তুই শয়তান। ইবলিশের বাচ্চা, দোজখেও তোর জায়গা হবে না এই বলে দিলাম! মরবি, সব মরবি।"

গুলজার আড়চোখে একবার বিবির দিকে তাকায়। বউয়ের মুখে ততক্ষণে লালচে আগুনের আভা। চোখ দুটো দপদপ করছে। আচমকা

AMARBOI.COM

আরিফাকে ঠাস করে এক থাপ্পড় কষিয়ে খনখনে গলায় কাশ্মীরিতে বলে, "শ ছক শৈতান। তুই নিজে আস্ত শয়তানি। শ ক্যায়জড় ছেক ন্যুয়ে মরণ। রাতদিন জ্বালিয়ে খাচ্ছিস। তুই নিজে মরিস না কেন?"

চড় খেয়ে আরিফা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তার চোখ-মুখ-ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। গুলজারভাইয়ের আর সহ্য হল না। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, "কী বলছিস নার্গিস? শ ক্যায়া ছেক ওয়ানন। চে ছুয়া দেমাগ ঠিক! ক্যায়া শ ছা পাগল তাম সুইনটি! ও পাগল। তুইও কি ওর মতো পাগল হলি?"

"সেয়ানা পাগল।" জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নার্গিস চোখ রাঙায়, "তুমি আর ওকালতি করতে এসো না। এই শয়তানিটার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক বুঝি না আমি? রোজ রাতে কী করতে ওর ঘরে চুপিচুপি যাও তুমি? হ্যাঁ? আমি জানি না ভাবো? সব জানি।" গুলজার স্তম্ভিত। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এই সন্দেহের কি কোনও শেষ নেই? কোনও রকমে ব্যথিত স্বরে বলল, "নার্গিস! আরিফা আমার বোন।"

"বোন! এমন অনেক বোন দেখেছি আমি।" বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল নার্গিস, "এই হারামজাদিটা সবসময় আমাকে বদদুয়া দিয়ে চলেছে। তারপরও তুমি ওকে কিছু বলো না, আমাকে পঞ্চাশটা কথা শোনাও। কই, এই শয়তানিটাকে তো..." বলতে-বলতেই অসহ্য রাগে আরিফাকে আর একটা চড় কষাতে যায় সে। আরিফা ভয়ে চিৎকার করে গুলজারকে জড়িয়ে ধরেছে। কাঁপতে-কাঁপতে তার বুকে শিশুর মতো মুখ গুঁজে দিয়েছে।

"নার্গিস!" গুলজারভাই খপ করে ধরে ফেলে নার্গিসের হাত, "বস বহুত হয়েছে। নিজের ঘরে যা।"

নার্গিস অগ্নিদৃষ্টিতে দু'জনকে দেখে নিয়ে উঠোনের দিকে চলে গেল। তার বুকের ভিতরে তখন দাবানলের আগুন জ্বলছে। আরিফা আর গুলজারকে একসঙ্গে দেখলেই আজকাল তার আপাগাস্তলা জ্বলে যায়। বোন! কিসের বোন! যে-মরদ রোজ রাতে বউকে বিছানায় একা ফেলে বোনের ঘরে ঢুকে বন্ধ দরজার পিছনে রাত কাটায় সে কি 'বোন' শব্দটার মর্ম বোঝে? নার্গিসের আগের 'শওহর'টাও তো এক-একদিন এক-এক বোনের বাড়িতে রাত কাটাত। লম্পট, চরিত্রহীন পুরুষ। শেষমেশ 'তালাক' দিয়ে বাঁচল সে। গুলজার আহমেদকে দেখে ফিদা হয়েছিল বলেই না ইশক-মোহব্বত করে বসল। গুলজারের হাঁটুর বয়সি নার্গিস! সবাই বারণ করেছিল। কিন্তু শোনেনি।

এখন মনে হয়, আবার 'নিকাহ' করাটাই তার ভুল হয়েছে! কোন সুখটা কপালে জুটেছে তার? নোংরা জলের উপর বাস করে। ঘর বলতে যে-জিনিসটা আছে, সেটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়। একজন অতিকষ্টে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারে ওই ঘরে। দু'জন হলেই গাদাগাদি। কপালে ভাল-মন্দ খাওয়া জোটে না। অথচ গুলজার হোটেলের বাড়তি রান্না মাঝেমধ্যেই বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু সব ওই সোহাগী বোনের পেটে যায়। সোহাগ দেখলে গা জ্বলে যায়। চরিত্রহীন পুরুষ কোথাকার।

"এই নার্গিস, কী করছিস?"

আফসানার ডাকে সম্বিৎ ফিরল তার। আফসানা সকাল সকালই ফুলের চুপড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কাঠের নৌকা বাইতে বাইতে এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দার একহাত দূরে। একগাদা ফুলের মধ্যেই চুপ করে ফুটে আছে তার তিন বছরের ছোট্ট শিশুপুত্র আজান। বেচারির ঘুমের রেশ এখনও কাটেনি। নার্গিসের দিকে তাকিয়ে সে একটা পেল্লায় হাই তুলল।

"এ ল্লে!" মজার ভঙ্গিতে রোজকার মতোই আফসানা একখানা লাল গোলাপ এগিয়ে দেয় নার্গিসের দিকে, "দিনের পেহলি গুলাব কুবুল কিজিয়ে নার্গিসজান-এ-আদা!"

"কুবুল," নার্গিসের মুখ থেকে তখনও রাগত ভাবটা যায়নি। তবু সে মৃদু হেসে গোলাপটা নিয়ে নেয়। এমন গোলাপ শ্রীনগরে আর কোথাও ফোটে না, একমাত্র আফসানা বোনের বাগান ছাড়া। সে এক অদ্ভুত বাগান। অনেক শৌখিন মানুষ কোটি-কোটি টাকা খরচ করেও আফসানা বোনের মতো গোলাপ ফোটাতে পারবে না। অথচ এ বাগানে কোনও যত্ন লাগে না। দামি বীজ, সার তো দূরের কথা। কচুরিপানায় ভরতি নোংরা জলের মধ্যেই ছোট-ছোট গাছে চতুর্দিক লালে লাল করে ফুটে থাকে গোলাপফুল! আফসানা নিজে গাছ লাগায়নি। প্রশ্নই ওঠে না। ওই শ্যাওলা ভরতি জলের উপর মানুষ বাঁচতে পারে। কিন্তু গোলাপের মতো শৌখিন ফুল তো মোগল বাদশার বাগানে থাকবে, এই কটু ধুম-পচা শ্যাওলা, পুতি গন্ধযুক্ত নরকে কি তাদের বাঁচার কথা? অথচ সমস্ত নিয়মভঙ্গ করে জলের নিচের মাটি আঁকড়ে ধরেই একগাদা বুনো ঘাসের মধ্যেই দিব্যি উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপগাছগুলো! একে বিধাতার বিচিত্র খেয়াল ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। আর সে কী গোলাপফুল! লোকে দেখলে ট্যারা হয়ে যাবে। যেমন তার রং, তেমন আকৃতি, তেমনি সৌরভ। শ্রীনগরের বাজারে প্রচুর দামে বিকোয় এই গোলাপ।

সে কথা বললেই আফসানা হাসে, "কর লো বাত। গোলাপের খুবসুরতি দেখে যারা লোটপোট হয়, তারা যদি একবার গোলাপগুলোর জন্মস্থান দেখে যায়, তবে জীবনে কিনবে না রে!"

আফসানার কথা সত্যি। এত অযত্নে, নোংরা জলের মধ্যে যে এমন গোলাপ ফুটতে পারে ভাবাই যায় না। অথচ গাছগুলো আফসানার জলজ বাগানে মহানন্দে আছে। আফসানা বড় লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। হাঁস পালছে। তার কৃপায় মাছ মাংস কপালে না জুটলেও মাঝেমধ্যে হাঁসের ডিম কপালে জুটে যায় ওদের। আফসানার হাতের 'আন্ডাভুর্জি' শিশমহলে বিখ্যাত। বিশেষ করে গুলজারের খুব পছন্দের খাবার। নিজের ঘরের চালের উপর চমৎকার সবজি ফলিয়েছে সে। লাউ, কুমড়োর লতা ফনফনিয়ে উঠেছে লাল টালিকে বেড় দিয়ে। কী বহর তাদের। এই বড়-বড় সাইজের সব তরকারি। লোভনীয় চকচকে সবুজ চেহারা দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। তবে শিশমহলে কেউ কারওর জিনিস চুরি করে না। বরং আফসানাই তার তরি-তরকারি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সযত্নে উপহার দিয়ে থাকে।

"আজানবাবা। ইধার আয়।"

ছোট্ট আজান টুকটুক করে নড়বড়ে নৌকোর উপর দিয়ে হেঁটে ওপ্রান্তে মায়ের কাছে চলে গেল। অন্য কেউ এ দৃশ্য দেখলে আঁতকে উঠবে। ভাববে টলমলে নৌকো থেকে বাচ্চাটা যদি পিছলে পড়ে যায়। যদি জলে ডুবে মরে যায়! কিন্তু শিশমহলের শিশুরা হয়তো জন্ম থেকেই এই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত। তাদের পা নৌকোর ওপর থেকে কিছুতেই পিছলে যায় না। জলে পড়েও তারা মরে না। জল তাদের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গী।

"একটু দেখিস," আফসানা আজানকে বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে হাসল। হাসলে চমৎকার দেখায় তাকে, "আমি দুপুর নাগাদ ফিরে আসব। ট্যুরিস্ট সিজন চলছে। ফুল বিক্রি হতে সময় লাগবে না।"

নার্গিস ম্লান হাসে। আজানকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "তুমি তো দিদি গুরপ্রীতজিকে সঙ্গে নিয়ে যাও। কখনও-কখনও আমাকেও তো নিতে পারো। দু'পয়সা হাতে পাই তবে। সময়ও কাটে।"

"তোর আবার পয়সার দরকার কী?" চটুল ভঙ্গি করে আফসানা, "তোর শওহর তো নামকরা বাওয়ার্চি। কত ভালবাসে তোকে। সবসময় চোখে হারায়য়"

"ছড্ডো উসকো! উচ্চে জাত কটোরা লাবেয়া পানি পি পি আফরে।"

আফসানার চোখে এবার বিরক্তি। বলে কী মেয়েটা। উঁচু জাতের জলপাত্র পেলে লোকে নাকি তেষ্টা না পেলেও পেট ফুলিয়ে জল খায়। অর্থাৎ ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকলে অমন লোক দেখানো প্রেম সবাই করে।

"তুই ফের ঝগড়া করেছিস গুলজারের সঙ্গে?"

নার্গিস তীক্ষ্ণ ভুরুভঙ্গি করে।

আফসানা আবার বলল, "অশান্তি কেন করিস? আরিফা বিমার। তাই গুলজার আরিফার দিকে একটু বেশি নজর রাখে। লাড, দুলাড় করে। এইটুকু মেনে নিতে পারিস না? অন্তত তোর মরদ তোর সঙ্গে

থাকে। প্যায়ার করে, সোহাগ করে। মর্দ ঘরে আছে, বশে আছে বলে বুঝিস না, বেওয়াফা মর্দের ঘর করা, তাকে সহ্য করা কী কষ্টের!" আফসানার কণ্ঠে অব্যক্ত যন্ত্রণা, "ভরে পেট, তো শক্তর কড়ি!"

বলতে বলতেই তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। সে কোনওমতে সামলে নিয়ে একটা স্টিলের টিফিনবক্স এগিয়ে দেয়, "নে, আন্ডাভুর্জি করেছি। খেয়ে নিস। গুলজারকেও দিস।"

আফসানা চলে গেল। নার্গিস আজানকে কোলে নিয়ে তার নৌকো বেয়ে চলে যাওয়া দেখে। কী জীবন মেয়েটার! ঘরে স্বামী আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের, নিজের শ্বশুর-শাশুড়ি আর আজানের পেট ভরাতে হয় তাকে। স্বামী এক নম্বরের 'নশেড়ি'। এক ছেলের বাপ, তার উপর এক ষোড়শী বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে। এখানকার ছেলেগুলোও যেন কী! অন্য প্রদেশের মেয়ে, বিশেষ করে বাঙালি মেয়ে দেখলেই যেন লাল ঝরতে শুরু করে। কলকাতার মেয়ে যেন হুরি-পরি। আর মেয়েগুলোরই বা কী আক্কেল? তোদের কলকাতায় ভাল ছেলে পাওয়া যায় না? তবে কাশ্মীরি বিবাহিত পুরুষগুলোকে ধরে টানাটানি করিস কেন! ওদের নখরা খুব ভাল ভাবেই জানা আছে। ডাইনির মতো পুরুষ খায়। গুলজারের মতো মধ্যবয়স্ক পুরুষকেও ছাড়ে না! কত ট্যুরিস্ট মেয়ে যে 'হসিন বাওয়ার্চি' গুলজারের উপর 'ফিদা' হয়, তাও ভালই জানে নার্গিস। ট্যুরিস্টদের তো বাদই দাও, শিশমহলের কত মেয়ের যে চোখ আর 'দিল' আছে এদিকে, সব খবর রাখে সে।

আফসানার বাড়ির একতলায় তার বর বিলাল বাঙালি বউটাকে এনে তুলেছে। সব টাকাপয়সা তার পিছনেই খরচ করে। তাতেও বাঙালি বউ সন্তুষ্ট নয়। মেয়েটা পয়সাওয়ালা ঘরের। এখানে তার পোষাবে কেন? তাই সর্বক্ষণ খিটখিট-কিটকিট চলছেই। ওরা দু'জন নিচের ঘরে থাকে। উপরের খুপরিতে আফসানারা চারজন গুটিশুটি মেরে কোনওমতে কাটায়। এমন পোড়া কপাল মেয়েটার যে, নিজের 'বেওয়াফা' স্বামী, সতীনকেও রেঁধে খাওয়াতে হয়! নয়তো কে খাওয়াবে? বাঙালি বউ! সে তো পটের বিবি!

আফসানা বলে গেল 'ভরে পেট, তো শক্তর কড়ি'। কার ভরা পেট? নার্গিস কী করে জানাবে যে, তার বুকেও জ্বলছে অন্তহীন জ্বালা! আজ এক বছর হল গুলজার তাকে ছুঁয়েও দেখেনি। একটা সন্তান ভীষণ ভাবে চেয়েছিল। গুলজার দেয়নি। নার্গিস চোখে আগুন জ্বেলে ভাবতে শুরু করল, সব মরদই কি এমন কমিনা হয়?

অন্য দিকে গুলজারের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে আরিফা। কান্নার গমকে-গমকে কেঁপে উঠছে তার দেহ। গুলজার সস্নেহে তার মাথায় হাত বোলায়।

"তুই কেন গেলি না ওদের সঙ্গে?" আরিফা কান্নাজড়ানো বিকৃত স্বরে বলে, "কেন তুইও মরলি না ওদের সঙ্গে? কেন তুই মরলি না ভাইজান?"

দু'হাতের ঘন আলিঙ্গনে আরিফাকে বুকে চেপে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুলজার। যদি সত্যি-সত্যি আব্বা আর সলমনের সঙ্গে সেও মরতে পারত! অথবা খেমকরণের অগ্নিকাণ্ডে শেষ হয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি হত! মাত্র ছ'বছর বয়স ছিল গুলজারের। কিন্তু এখনও মনে আছে জওয়ানটার মুখ। চতুর্দিকে লেলিহান আগুন... ছ'বছরের শিশুটা ভয়ে চিৎকার করে কাঁদছে... ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে পারছে না... আচমকা একটা মানুষ কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল তাকে! নিষ্পাপ শিশুর চোখ দেখেছিল তার রক্ষাকর্তাকে। যেমন দেখেছিল আরিফার উপরে অত্যাচার করা পুলিশ আর্মির লোকগুলোকে। মানুষ জীবনে দু'জন মানুষকে কখনও ভোলে না— জীবন যে দেয়, আর জীবন যে নেয়! গুলজার কাউকেই ভোলেনি।

গুলজারের বুকের উপরে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে কাঁদছে আরিফা। বারবার বলছে, "তুইও কেন গেলি না ওদের সঙ্গে? কেন তুই বেঁচে থাকবি? কেন মরলি না তুইও? দুশমন! দুশমন!"

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

গুলজ্জার আহমেদের চোয়াল শক্ত হয়। সে জানে কী জন্য সে এখনও বেঁচে আছে। একটা বিশেষ কাজের জন্য অপেক্ষা করছে গুলজ্জার। মিটে গেলেই কর্তব্য শেষ!

আচমকা জানালায় চোখ পড়তেই দেখল আফসানা নৌকো থামিয়ে তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছে। তার বক্ষলগ্না আরিফাকে দেখে তার চোখেও যেন একঝলক ঈর্ষা ছাপ ফেলে গেল। ও চোখের ভাষা খুব ভালই বোঝে গুলজ্জার।

সে আফসানার মুখের উপরই দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

'কিতনে খওফ হোতা হ্যায় শাম কে অন্ধেরোঁ মেঁ
পুছ উস পরিন্দোঁ সে, জিনকে ঘর নহিঁ হোতে।
...হাথোঁ কে লকিড়োঁ পে মত যা অ্যায় গালিব
নসিব উনকে ভি হোতে হ্যায়, জিনকে হাথ নহিঁ হোতে...!'

ছয়

একটা বিরাট ভারী ব্যাগ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল কন্নু। ট্যুরিস্টরা এত বড় বড়-ব্যাগে কী যে ভরে আনে কে জানে! একটা দশ বছরের বাচ্চার পক্ষে কি এত ভারী ব্যাগ টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? বেচারার এখন শুধু স্কুলব্যাগ বইবার কথা। তার বদলে এই মুহূর্তে এক হাতে একটা পেল্লায় সুটকেস। অন্য হাতে ট্রলি। জিনিসপত্রের ভারে একেবারে বেঁকে গেছে। ফরসা নাক-মুখ পরিশ্রমে লাল! সে হাতের জিনিসগুলো একটু রেখে দম নিচ্ছিল।

"এ কন্নু," হোটেলের ম্যানেজারের আলতো ধমক, "ইসে ইস দেরা? কত দেরি করবি? ট্যুরিস্টরা যে গাড়িতে বসে পড়েছে। গোটা দিনই লাগিয়ে দিবি নাকি?"

"আ রিয়া হৈ," কচি গলা চড়িয়ে উত্তর দেয় কন্নু। বেচারা এখন পুরো ত্রিভঙ্গমুরারি। এ হোটেলে লিফটও নেই। তিনতলার খাড়া সিঁড়ি দিয়ে টেনে-টেনে মালপত্র নিচে নামিয়ে আনতে বড্ড কষ্ট হয়। রাত্রে ঠিকমতো ঘুমোতে পারে না। সকাল-সকাল উঠে স্কুলে দৌড়তে হয়। তারপর এই অসম্ভব খাটুনি। ভীষণ কষ্ট হয় তার। এখনও হচ্ছে। কষ্টে তার মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। যেন নিষ্পাপ লাল টুকটুকে আপেলের গায়ে ভোরের শিশিরবিন্দু!

"এ কন্নু—উ-উ-উ!" নিচ থেকে মালিকের গর্জন ভেসে আসে, "কঁহা মর গ্যয়া রে?"

"আউঁ না।"

জবাবটা দিয়ে সে অতিকষ্টে সুটকেস আর ট্রলি টানতে-টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে থাকে। সুটকেসটা এত ভারী যে, টেনে তুলতেই পারছে না। ট্রলিটা ভীষণ অবাধ্য! কোনওমতে একটা ধাপ পেরোতে গিয়েই আচমকা পা পিছলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ধড়াম করে সপাটে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ল সে। হাতের সুটকেসটা ছিটকে কোথায় পড়েছে দেখেনি। কিন্তু ট্রলিটা গড়গড়িয়ে গড়াতে-গড়াতে এসে ঠাস করে আছড়ে পড়ল তার কপালে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল দশ বছরের বাচ্চাটি।

"কী হৈয়া! বেড়া গর্গ!" মালিক প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে। অবস্থা দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ, "সত্যনাশ! এ কী করেছিস! জিনিসপত্র তো সব ভেঙে গেছে। এবার ট্যুরিস্টপার্টিকে কী জবাব দেব আমি?"

কন্নুর মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছিল। টের পেল কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। ঠোঁট কেটেও গরম রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। তবু সে কোনওমতে সামান্য ঘাড় উঁচু করে পরিস্থিতিটা দেখল। সুটকেসের মধ্যে রাখা জিনিসপত্র সব চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছত্রাকার। কাচের দামি শো-পিস ভেঙেচুরে একসা। মনে মনে প্রমাদ গুনল কন্নু। মালিকের হাতে আর এক প্রস্থ মার কপালে নাচছে।

"কী হুয়া?"

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

সম্ভবত প্রচণ্ড আওয়াজ পেয়েই ট্যুরিস্টরা ছুটে এসেছে। যাদের সুটকেস আর ট্রলির এই হাল করেছে কন্নু তারা তখন পারলে মালিককে একহাত নেয়। তারপর তাদের গিফটের এই অবস্থা করেছে বলে কন্নুরও চোদ্দোগুষ্টির তুষ্টি করল। এই ভ্রমণার্থী দম্পতির পুরুষটি যথেষ্টই শক্তসমর্থ। এমন গোটা দুয়েক সুটকেস এক হাতে তুলে অনায়াসেই নিচে নামিয়ে নিতে পারে। এরপর গোটা রাস্তা তো নিজেই বোঝা টানবে। অথচ তিনতলা থেকে রিসেপশন অবধি নামিয়ে আনতে পারল না। বরং এই জগদ্দল বোঝা চাপিয়ে দিল ওই নড়বড়ে বাচ্চার ঘাড়ে। ট্যুরিস্টরা এমনই। ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়। এত বড় লোকটা বোঝেনি যে, কন্নুর মতো একটা দুবলা-পাতলা বাচ্চার পক্ষে ওই গন্ধমাদন বওয়া সম্ভব নয়।

কন্নু বিড়বিড় করে, "ধাখা খেখে তন, তে কওঢ় কুডরাঁ টে। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপায়। হুঁ।"

"চো-ও-ও-প।" মালিক ষাঁড়ের মতো চেহারাটা নিয়ে তেড়ে আসে, "বুড়বুড় করতা ইঁ? মারব এক চড়।"

অনেকক্ষণ উত্তেজিত কথোপকথনের পর ঠিক হল যে, মালিক ট্যুরিস্টপার্টির ভেঙে যাওয়া জিনিসপত্রের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে। তার বদলে কন্নুর মাইনে কেটে নেবে। ট্যুরিস্টপার্টি আর ঝামেলা বাড়ায় না। তারা ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে চলে গেল। বাচ্চাটার পেটের ভাতের চিন্তা কেউ করল না। একেই এখানে টিপ দেওয়ার নিয়ম নেই। টিপ নিলে মালিক মেরে পাট-পাট করে দেবে। তার উপর হকের টাকাটুকুও মার গেলে কারই বা সহ্য হয়। কন্নু কোনওমতে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ায়। কপালের, মুখের রক্ত মুছে নিয়ে বলে, "এ কেয়া কিয়া! এমনভাবে গরিবের পেটে লাথ মারছ কেন বাবু?"

মালিক মুখভঙ্গি করে, "তুই সা-লে জিনিসপত্র ভাঙলি কেন? হোটেল কি তোর বাপুর? হর্জানা কে দেবে? ঠিক হয়েছে! আন্নি পিসি, কুত্তি চট্টে!"

মন দিয়ে কাজকর্ম না করলে নাকি কিছুই পাওয়া যায় না, পয়সাও নয়। কন্নু আপনমনেই গড়গড় করে। দু'পয়সার কাচের সাজিয়ে রাখার জিনিসের জন্য তার পেটের ভাতের দিকেই সবসময় থাবা পড়ে। ওই কাচের জিনিসগুলো নিয়ে কী করত ব্যাটারা? বড়জোর ঘরে সাজাত। তারপর নোংরা হয়ে গেলে নিজেরাই হয়তো ফেলে দিত। অথচ ওই অর্থহীন কাচের শোপিসের জন্যই তার রুজি রুটির বারোটা বাজল। একটা শো-পিস ভাঙলে ট্যুরিস্টগুলোর কিছু হবে না। কিন্তু এক মাসের মাইনে না পেলে ওদের যে, কীরকম হা-ঘরে দশা হবে তা কন্নু নিজেও বোঝে। কিন্তু কে শুনবে সে কথা! এ দুনিয়ায় গরিবের কথা কেউ শোনে না। বাবা বলে, 'আমির দি মর গঈ কুত্তি, ওহ হর কিসসে পুছি— গরিব দি মর গঈ মা, ওহ্না কিসসে না লেয়া না।'

মনখারাপ করে কন্নু দুমদাম পা ফেলে হোটেলের বাইরের দিকে যায়। পিছন থেকে মালিকের গলা ভেসে আসে, "যেখানে যাচ্ছিস যা। কিন্তু আজ তোর নাইট ডিউটি। রাতে থাকবি। আফজলের 'বেবে' বিমার। ও রাতে থাকবে না।"

কন্নু মুখ ব্যাজার করে বাইরে চলে আসে। তার খিদে পেয়েছে। কপালটার এক দিক ফুলে আলু হয়ে গিয়েছে। ভীষণ ব্যথা। অবসন্নও লাগছে। কখন সেই দুটো শশা খেয়েছে। এতক্ষণের পরিশ্রমে সবটাই হজম। ওর এখন বেড়ে ওঠার বয়স। খিদেটা বেশিই পায়। তার ওপর কাশ্মীরের জল খাবার তাড়াতাড়ি হজম করাতে ওস্তাদ। ট্যুরিস্টরা তো সব সময়ই কিছু না কিছু খেয়েই যাচ্ছে। ঘন্টায়-ঘন্টায় পকোড়া, স্যান্ডউইচের অর্ডার আসে। বড়লোকেরা খিদে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কন্নুরা বোধহয় খিদে নামক বস্তুটিকেও হজম করে ফেলেছে। উপায় নেই। ওরা শীত, খিদে, রোগকে মাত দিয়ে বেঁচে আছে। খিদের বিলাসিতা দেখাতে চলে না।

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরে হাউজবোটগুলোয় আলো জ্বলে উঠেছে। হাউজবোটগুলো কী সুন্দর আলোর মালায় সাজানো। কোনওটা সবুজ, কোনওটা হলুদ, কোনওটা আবার লাল রঙের আলোয় ঝলমল করে। ডাল লেকের জলের উপর সেই রঙের প্রতিবিম্ব পড়ে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কেউ জড়োয়া হার গলায় দিয়ে বসে আছে। লাল রঙের চুনির পাশে সাদা হিরে ঝলসাচ্ছে। তার পাশেই পীতাভ পোখরাজ, অথবা সবুজ পান্না বসিয়ে চমৎকার একখানা রত্নহার তৈরি করেছে অজ্ঞাত কোনও স্রষ্টা। চতুর্দিকের পাহাড়গুলো কালো ছায়ায় ঢাকা। কালোর প্রেক্ষাপটে তাই আলোর দ্যুতি অনেক বেশি তীব্র। ডাল লেকের রঙিন ফোয়ারাগুলো তরল রং চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে ব্যস্ত। জল নয়, যেন রঙের পিচকারি দিয়ে রাতটাকে রঙিন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দেখলেই কেমন যেন মাতাল-মাতাল লাগে।

রাস্তায় এখন ট্যুরিস্টদের ভিড়। এখন থেকে রাত ন'টা অবধি এটাই শ্রীনগরের রাস্তার পরিচিত দৃশ্য। এখন কেনাকাটি করার আদর্শ সময়। ইমিটেশন জুয়েলারি, কাশ্মীরি শাল, সোয়েটার বা উলেন গার্মেন্টস কিংবা ড্রাই ফ্রুটসের দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। মীনাবাজার ক্লোটিং শপিং কমপ্লেক্সেও গিজগিজ করছে কালো মাথা। জিনিস চড়া দামের হলেও ট্যুরিস্টরা কিনে তবেই ক্ষান্ত দেবে। তার আগে অবশ্য কিছুক্ষণ দাম ধরে টানাটানি চলবে। কিন্তু মজার কথা, জম্মু কিংবা কাশ্মীর, কোনওখানেই এমন বার্গেনিং খাটে না। দোকানদারের 'মুহ বোলি' দামই দিতে হবে। সে সেই দাম থেকে একচুলও নড়বে না। না পোষালে অন্য কোথাও যাও। অর্থাৎ 'রাস্তা নাপো'।

কন্নু হোটেল থেকে বেরিয়ে গুলজারচাচার রেস্তোরাঁর দিকে যাচ্ছিল। গুলজারচাচার রেস্তোরাঁ তার হোটেল থেকে দু'মিনিটের দূরত্বে। চাচাকে বলে দিতে হবে যে, সে আজ রাতে ফিরবে না। নয়তো বাবা-মা চিন্তা করে মরবে।

পথে যেতে-যেতেই সে দোকানের দৃশ্য দেখছিল। এক মোটাসোটা মহিলা গোটা কয়েক ইমিটেশন জুয়েলারি নিয়ে দরাদরি করে যাচ্ছেন। দোকানদার নিস্পৃহ মুখ করে মাথা নাড়ছে। এক টাকা কমেও গয়নাগুলো দেবে না। তার সাফ কথা, "যো বোলা, ওহি ফাইনাল ম্যাডামজি।"

কণ্ঠস্বর বিনীত অথচ দৃঢ়। মহিলা তবু বললেন, "এ কেইসা কথা বোলতা হায়। সিরিফ দো রুপিয়া কমানে কো বোলা, ওভি নেহি কমায়েগা?"

কন্নুর এত কষ্টেও হাসি পেয়ে যায়। মহিলা নির্ঘাত বাঙালি। এরকম হিন্দি একমাত্র বাঙালিরাই বলে। আর ওরাই কেনাকাটা বেশি করে। অনেক বেশি ব্যবসায়িক বুদ্ধিও ধরে। সাহেব-সুবোরা কখনও দরাদরির ধারেকাছেও ঘেঁষে না। অন্যান্যরা তো জিনিসপত্র কেনেই না তেমন। বাবা বলে, কাশ্মীরের বাজারগুলো নাকি বেঁচেই আছে সাহেব আর বাঙালিদের জন্য। একমাত্র এই দুই প্রজাতিই হুজুগের পিছনে টাকা খরচ করতে কসুর করে না।

কাশ্মীরি বিক্রেতার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হল, "নহিঁ ম্যাডামজি।"

সে যথেষ্টই বিনয়ী। কিন্তু নিজের জায়গায় অটল। ম্যাডামজি ফরসা-ফরসা গোল হাত নাড়িয়ে বলল, "এগুলোর রং কত দিন টিকবে?"

বিক্রেতা আরও নিস্পৃহ, "বলতে পারছি না ম্যাডাম। এক বছরও টিকতে পারে, আবার এক দিনেও রং চটে যেতে পারে।"

"অ্যাঁ!" ভদ্রমহিলা রেগে গিয়েছেন, "এ আবার কী কথা? কোনও গ্যারান্টিই নেই?"

"নেই," সে মৃদুস্বরে জানায়, "ম্যাডাম, আমি তো গ্যারান্টি দিতেই পারি। যদি বলি এক বছরের আগে রং চটবে না, তাহলে আপনি 'খুশি খুশি' কিনে নেবেন। কিন্তু ফেরার পথে, ট্রেনেই হয়তো রং চটে গেল। তখন তো আমার দোকানে এসে এই গয়না পালটাতে পারবেন না। উলটে আমায় বদদুয়া দেবেন। দু'পয়সার জন্য বদদুয়া নেব কেন ম্যাডামজি? তাই সত্যি কথাই বলছি, কোনও গ্যারান্টি নেই। সেই বুঝেই কিনুন।"

জম্মু-কাশ্মীরের বিক্রেতাদের এটাই বাঁধা বুলি। ওরা গরিব হতে পারে, কিন্তু মিথ্যুক নয়। অন্য দিকে দুই মহিলা পশমিনা শাল কিনছেন। বেচারি দোকানদারকে এখন পশমিনা শাল রিং টেস্ট করে দেখাতে

হবে। অর্থাৎ একটা সরু রিংয়ের মধ্যে দিয়ে গোটা শালটাই গলে যেতে পারে কিনা, সেটাই পরীক্ষা করে দেখতে চায় ক্রেতারা। কন্নুর হাসি পেয়ে যায়। কীরকম চালাক খরিদ্দার দেখেছ? পশমিনা শাল সম্পর্কে রীতিমতো পড়াশোনা করেই এসেছে।

কন্নু এসব দেখতে-দেখতে শুটগুট করে যখন গুলজার আহমেদের ধাবায় পৌঁছল, তখন ধাবায় অসম্ভব ভিড়। গুলজার আহমেদ ট্রাউট মাছ রান্না করতে ব্যস্ত। তার দাপটে গোটা ধাবাই তটস্থ।

"দো সুলমো ক্রস্তা ফারিও ধো কর লাইও।" সে বিরক্ত হয়ে সহকারীকে বলে, "হিং কিধর হ্যায়? সেটা কি আমার এস্তেকালের পর এসে পৌঁছবে?"

'সুলমো ক্রস্তা ফারিও' মানে কাশ্মীরের বিখ্যাত ব্রাউন ট্রাউট। রেইনবো ট্রাউট হল 'সুলমো গৈস্রি'। একেবারে ট্রাউট-প্যারাডাইস থেকে আসা তাজা-তাজা মাছ। কন্নু কিচেনে উঁকি মারে। তাকে এখানে সবাই চেনে। তাই কেউ বাধা দিল না। গুলজার এখনও তাকে দেখেনি। সে অসম্ভব ক্ষিপ্র হাতে তখন ব্রাউন ট্রাউট কাটছে। দু'-একজন কৌতূহলী জাপানি পর্যটক উঁকি মেরে তার মাছকাটা দেখছে। তাদের মুখে প্রশংসার অভিব্যক্তি। পারলে বোধহয় এখনই লোকটাকে জাপানের কোনও 'সুশি বারে' বসিয়ে দেয়। গুলজারের চোখ অসম্ভব তীক্ষ্ণ ও অভিজ্ঞ। একদম দু'ইঞ্চি করে পিস করছে মাছের। একটুও কম-বেশি হচ্ছে না মাপে। কড়াইয়ে পরিমাণমতো সোনালি রঙের সর্ষের তেল গরম হচ্ছে। যতক্ষণ না ঝাঁঝালো গন্ধটা আসছে, ধোঁয়া উঠছে, ততক্ষণ গরম হবে তেলটা। অন্যদিকে তার সহকারী এই স্পেশ্যাল কাশ্মীরি 'মচ্ছি কারি'র মশলা তৈরি করতে ব্যস্ত। হিংপাউডার, মৌরিগুঁড়ো, আদাবাটা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর গুঁড়ো হলুদ, আন্দাজমতো নুন মেশানো হচ্ছে।

"দে," মশলাটা নিয়ে গুলজার ঢেলে দিল কড়াইয়ে। সঙ্গে পড়ল ফেটিয়ে রাখা দই। এখন ক্রমাগত তাকে খুন্তি নেড়ে যেতে হবে। নয়তো স্বাদটা খুলবে না। মশলাটা পুরো কষে গেলে তবেই মাছ পড়বে।

"এ গুলজার।" পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "দো মচ্ছি করি ঔর জিরা রাইস।"

"আহোঃ," সে মাথা ঝাঁকিয়ে খুন্তি নাড়ায়। এখন ব্যস্ততার সময়। ট্যুরিস্টরা বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারে না। কন্নু দেখল, চাচার পরনের গামছায় হলুদ, তেলের ছাপ পড়েছে। সে বুঝতে পারছিল না, এখন ডাকা উচিত হবে কিনা। কিন্তু চোখ তুলতেই গুলজার দেখতে পেয়ে গেল তাকে।

"কন্নু।" সে ইঙ্গিত করল, "দু'মিনিট বোস বেটা। আসছি। এই মাছটা দিয়েই আসছি।"

"আচ্ছা।"

দু'মিনিট নয়, মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হল তাকে। গুলজার কিছুক্ষণ পরেই হাত মুছতে-মুছতে চলে এল। আগে সে ঠিকমতো লক্ষ করেনি কন্নুকে। এখন তার মাথার চোট, কেটে যাওয়া ঠোঁট চোখে পড়েছে তার। সে আঁতকে ওঠে, "এ কী। কী করে এমন হল রে?"

বাচ্চা ছেলেটা ব্যাজার মুখে ঘটনাটা বলে। গুলজারের মুখ শক্ত হয়। এর জন্য ভরতকে তেড়ে গাল দেওয়ার ইচ্ছেটাকে কোনও রকমে গলাধঃকরণ করল সে। ভরতকে দোষ দিয়ে লাভ কী। সে যে নিজের বুকের উপর পাথর রেখেই কন্নুকে এই চাকরিতে ঢুকিয়েছে, তা অজানা নেই তার। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটার কথা কে ভাবে? এই ছোট্ট মানুষটার জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আজ নাইট ডিউটি দিয়ে কাল কোনওমতে ঢুলতে-ঢুলতে স্কুলে যাবে। হয়তো স্কুল চলাকালীনই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে বেঞ্চের উপরে। সেই অপরাধে মাস্টারের বেতও খাবে। তারপর আবার ক্লান্ত, আহত দেহটাকে টেনে এনে হোটেলের চাকরি করতে যাবে। কন্নু একা নয়, এ দৃশ্য কাশ্মীরের অনেক হোটেলেই দেখা যায়। ছোট-ছোট বালকরা স্কুলব্যাগের বদলে পর্যটকের ভারী ব্যাগ তুলতে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, ভুল করে মার খাচ্ছে। উপায় নেই। কাশ্মীরের জনসাধারণের জীবন এমনই। ওরা বড্ড গরিব। সবাই মিলে কাজ না করলে দু'বেলার রুটিটুকুও জোটে না।

"তোর পুরো টাকা কেটে নিল, তুই কিছু বললি না?" গুলজার সস্নেহে তার মাথায়, ঠোঁটে বরফ ঘষতে-ঘষতে বলল।

"কী বলব চাচা?" সে ব্যথাতুর চোখ তুলে বলে, "গলতি তো আমারই।"

"হুঁ," গুলজার আর কথা না বাড়িয়ে ছেলেটার পরিচর্যায় লেগে যায়। বরফ দেওয়ার ফলে ব্যথাটা অনেকটাই কমেছে। কালশিটের নীল ভাবটাও খানিকটা কম। সে কেটে যাওয়া জায়গাগুলোয় সস্নেহে মলম লাগিয়ে দেয়। কন্নু বুকের ভিতরে অবুঝ কান্নাটাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিল। এবার আর চেপে রাখতে পারল না। একটা অজানা ব্যথা তার কচি বুকের পাঁজরে অনেকক্ষণ ধরেই ঘুরে-ঘুরে মরছে। এবার আচমকা হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল সে। তার জন্য যসসির বিয়েতে অসুবিধে হবে, সারা মাসের টাকাটা জলে গেলে বাবা-মায়ের খুব কষ্ট হবে তা সে বুঝতে পারে। অপরাধবোধ, ভয়, নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে অনির্দিষ্ট এক যন্ত্রণায় ছেলেটার কান্না পেয়ে গেল। মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোচ্ছে না। হয়তো কিছু বলতেও চাইছে। কিন্তু কান্না ছাপিয়ে শব্দগুলো উঠে এল না।

"আরে, কোই না পুত্তর।" গুলজার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, "কাঁদিস না। কিছু না কিছু তরকিব ঠিক হয়ে যাবে।"

কন্নুর কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। গুলজার বাচ্চাটার অসহায় কান্না দেখে। বারবার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। হাত মুষ্টিবদ্ধ। তার আচমকা চোখ পড়ল ধাবার দেওয়ালে টাঙানো গুরু নানকের ছবিটার উপরে। কেমন ভাসা-ভাসা চোখে তাকিয়ে আছেন। ভরত সর্বক্ষণ 'ওয়াহেগুরু'র নাম জপে চলেছে। এখন এই বাচ্চাটাকে বাঁচাতে কি ওর 'ওয়াহেগুরু' আসবে?

বাচ্চাটার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরুতে ভাঁজ পড়ল তার, "খেয়েছিস কিছু?"

"খেয়েছি। দো পহরে," কন্নু নাক টানতে টানতে উত্তর দেয়।

বাকিটা বুঝতে আর বাকি থাকে না গুলজারের। সে আদর করে ছেলেটার মাথায় হাত বোলায়, "কাঁদিস না। রোঘন যোশ বানিয়েছি। খাবি?"

কন্নু চোখ বড়-বড় করে তাকায়। শুকনো ঠোঁট চেটে নিল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! ঝাল-ঝাল, মাখা-মাখা, লাল-লাল ভেড়ার মাংস। তাও আবার গুলজারচাচার হাতের রান্না করা। আই ব্বাপ।

গুলজার তার দিকে একঝলক দেখল। বুভুক্ষুর মতো চেয়ে আছে ছেলেটা। তার চোখও আর্দ্র হয়ে এসেছে। কোনওমতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "বাইরে গিয়ে দাঁড়া। আমি দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

কন্নু মাথা নেড়ে চলে গেল। গুলজার তখনও তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এমন দিন সে নিজেও কাটিয়েছে। তার শৈশবের রঙিন দিনগুলো কবে কেটে গিয়েছে রুজি-রোজগারের ধান্দায়, টেরই পায়নি। আর আজ এই ছেলেটার সঙ্গেও তাই হচ্ছে। নার্গিস বলে সে নাকি মানুষ নয়, পাথর! পাথর না হলে কি এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর সত্যিই তার বেঁচে থাকার কথা? আরিফা বলে, 'কেন মরলি না তুই?' সত্যিই তো। কেন মরল না গুলজার। কেন বুক ফাটে ওই নিষ্পাপ ছেলেটার অভুক্ত শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে? কেন একটা জ্বালা দিনরাত বুকের মধ্যে আগুনপাখির মতো ডানা ঝাপটে মরে? পাথর হওয়া কি এতই সহজ?

গুলজার আলতো করে চোখ মোছে। তারপর সন্তর্পণে কিচেনে ঢুকে যায়। রোঘন যোশের একটা প্লেট অনেকটা অভুক্ত ফেরত এসেছে একটু আগেই। এখানে যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়, ট্যুরিস্টরা খেয়ে শেষ করতে পারে না। সেই সব প্লেটের এঁটো খাবার মাঝেমধ্যেই আরিফার জন্য প্লাস্টিকে করে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিয়ে আসে সে। আজও একটা ডিশ এসেছে একটু আগেই। গুলজার আড়চোখে একঝলক দেখে নেয়। ডিশটা এখনও তেমনই পড়ে আছে। বাসন ধোয়ার ছেলেটা এখনও সাফ করার সময় পায়নি। একরাশ বাসনের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রাণপণে

এঁটোকাঁটা সাফ করছে।

সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে বলে, "শোন, দু'টাকার তম্বাকু নিয়ে আয় তো।"

"আহোঃ," ছেলেটা মুখ তুলল। আচমকা বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে গুলজারের। এ ছেলেটাও প্রায় কন্নুর বয়সি। বড়জোর টেনটুনে বছর দুয়েকের বড় হবে। আগে কখনও লক্ষ করে দেখেনি। তার চোখ কড়কড় করে ওঠে। সে ডানহাতে চোখ চেপে ধরে।

"কী হল ব্রাজি?" ছেলেটি অবাক।

"কিছু না পুত্তর।" গুলজার অপ্রস্তুত হেসে বলে, "চোখে তেলের ধুঁয়া গেছে। তুই তাড়াতাড়ি তামাক নিয়ে আয়।"

"জি।"

ছেলেটি আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। সেই ফাঁকেই দ্রুতবেগে রোঁখন যোশের প্লেটটা তুলে নিয়ে অবশিষ্টাংশটুকু প্লাস্টিকে ভরে নেয় গুলজার। রুটির থালা থেকে গোটা চারেক রুটি ছোঁ মেরে প্যাকেটে পুরে কোনওমতে বাইরে বেরিয়ে এল সে। কন্নু বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

"নে পুত্তর।" গুলজার ফিসফিস করে বলল, "খেতে খেতে চলে যা। পয়সোঁকি ফিকর মত করিও। একটা রাস্তা ভেবেছি। পরে বলব। কেমন?"

সে মাথা নেড়ে চলে যায়। কিন্তু গুলজার তখনই কাজে ফিরে যেতে পারল না। সে সজল, অসহায় চোখে দেখতে থাকে সদ্য গোঁফ গজানো কিশোর শিকারা টেনে চলেছে। তার মুখের ঘাম টপটপ করে ঝরে পড়ছে। মিশে যাচ্ছে ডাল লেকের স্বচ্ছ রঙিন জলে। রাস্তার দু'পাশে ফুল হাতে কত বালক দাঁড়িয়ে। এই ফুল বিক্রি করে টাকা পাবে, তবে ভাতের জোগাড় হবে। কেউ ছোট-ছোট বৈক্ষোদেবীর মূর্তি বিক্রি করছে। কেউ শশা, তরমুজ, ভুট্টার ঠেলা লাগিয়ে ট্যুরিস্টদের ফাই-ফরমাশ খাটছে। কেউ একটা বিরাট ঠেলায় টেনে নিয়ে চলেছে দোকানের শাক সবজি। ঠেলা টানতে পারছে না। হাত পা কাঁপছে। তবু ওকে ওই ভারী বোঝাটা যথাস্থানে পৌঁছতেই হবে। তাই প্রাণপণে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আগে কখনও কর্মব্যস্ততায় এসব দেখেও দেখেনি। আজ মনে হচ্ছে, কেন দেখেনি...।

পাথর হওয়া সত্যিই এত সহজ নয়।

সাত

রাত ন'টার পরই অবশ্য পালটে গেল কাশ্মীরের দৃশ্য।

সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই দোকানের ঝাঁপগুলো ঝুপঝাপ পড়তে শুরু করেছিল। ন'টা নাগাদ একদম সব শুনশান হয়ে গেল। এখন কাশ্মীরের ব্যস্ত রাস্তা জনহীন।

অন্যান্য ট্যুরিস্ট স্পটে রাত্রিকালীন কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। এখানে তেমন কিছু নেই। কড়া নিয়ম, সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হবে। রাত ন'টার পরে ট্যুরিস্টদের বাইরে বেরোনো বন্ধ। ক্যাসিনো, নাইটক্লাব, ডিস্কো ঠেকের খোঁজ না করাই ভাল। নাইটক্লাব, পাব, এসব রস থেকে এ অঞ্চল প্রায় বঞ্চিত। হাতে গোনা কয়েকটা ফাইভ স্টার হোটেলে এসব সুবিধা থাকলেও সেখানে পৌঁছনো সমস্যাসঙ্কুল। কারণ সমস্ত রকম পরিবহণ বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ যদি রাতে একটু স্বাস্থ্যপান করতে চান, তবে তাঁকে যেতে হবে আর্মি ব্যারাকের দোকানে। সেটাও অবশ্য খুব নিরাপদ নয়। তাই গোটা কাশ্মীর, এমনকী, রাজধানীও রাত ন'টার পর নির্জন। শুধু দু'পাশের সারি-সারি ল্যাম্পপোস্টের আলো পিছিল রাস্তার আলো ছেড়ে দিচ্ছে। রাতের পশমিনা চাদরের সোনালি জরির রেশটুকু ছেড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। শিকারাগুলো রং হারিয়ে এখন কালো অশরীরীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে। দূরে একটা-দুটো হাউজবোটের চোখ অবশ্য এখনও জ্বলছে। কিন্তু নীলাভ ঘুমকুয়াশা ডাল লেকের জলের উপরে ছেয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে হাউজবোটের আলোগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আলোর থেকে তাদের আলেয়া বলেই বেশি মনে হয়।

হোটেলের রিসেপশনে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে কন্নু। তার মন কেমন-কেমন করছে। দশ বছরের জীবনে সে কখনও মা-বাবাকে ছাড়া রাত কাটায়নি। তাদের ছোট্ট ঘরে, তস্য ছোট্ট বিছানায় কষ্ট করে, গুঁতোগুঁতি করে হলেও মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চুপটি করে শুয়ে থাকা যায়। মায়ের স্পর্শটুকু অদ্ভুত সান্ত্বনা, নিরাপত্তার উষ্ণতা এনে দিত দশ বছরের বালকের হৃদয়ে। বড় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। অথচ এখানে কন্নু একা। কেউ দেখার নেই, কেউ শোনার নেই। কেউ বলার নেই, 'সো যা পুত্তর।' কেউ 'লোরি'ও গেয়ে শোনাবে না। এই মুহূর্তে মায়ের উষ্ণ, নিরাপদ কোল থেকে অনেক দূরে ও।

ভাবতেই কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সারাদিনের ঝক্কি ঝামেলার পর দেহটাও একটু ঘুম চাইছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। তবু ঘুমনোর উপায় নেই। কখন রিসেপশনের ফোন বেজে উঠবে তার ঠিক নেই। কোনও কাস্টমার হয়তো জল চাইবে। কারওর হয়তো মধ্যরাত্রে কিছু খাওয়ার শখ হবে। কেউ আবার একটা এক্সট্রা ব্ল্যাঙ্কেটের আবদারও করতে পারে। এছাড়াও নালিশ, অভিযোগ, অনুযোগ তো লেগে আছেই। কোথায় গিজার কাজ করছে না, কাস্টমারকে ভোর-ভোর গরম জল করে দিতে হবে, কিংবা কারওর রাতে টিভি দেখার শখ হয়েছে, অথচ টিভি চলছে না, নাইটল্যাম্প জ্বলছে না, কেউ চারটেতে ওয়েক আপ কল দিতে বলেছে, সঙ্গে বেড-টি— ঝামেলা কি কম! ঘুম পেলেও জেগে বসে থাকতে হবে।

কন্নুর একটু ঝিমুনি মতো এসেছিল। একটা দশ বছরের বাচ্চার পক্ষে আর কতক্ষণ জেগে থাকা সম্ভব! তাই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আচমকা একটা খড়খড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সচকিত হয়ে উঠে বসে সে বোঝার চেষ্টা করে, শব্দের উৎসটা কোথায়। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে বুঝল ঠিক তার পিছনের জানালা থেকে আওয়াজটা আসছে। কাচের জানালায় কেউ যেন কিছু দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে জানালার কাছে চলে যায়। জানালাটা বন্ধ। কিন্তু কাচের এপ্রান্ত থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পায় ওপ্রান্তে একটা মানুষের অবয়ব। তার হাতে একটা খড়ি জাতীয় কিছু। মানুষটা জানালার ওপরে কিছু লিখছে।

"কৌন?"

কচি গলায় ধমকে ওঠে কন্নু। তার গলার আওয়াজ পেয়ে মানুষটা থতমত খেয়ে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য। বোধহয় সে এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরক্ষণেই পিছন ফিরে দৌড়।

"ও ভেরি। রুক। কৌঁট হানা? কৌন হ্যায় তু?"

কন্নুও তড়িৎগতিতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। সে তবু ধাওয়া করল।

"ও—য়!" প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে চেঁচায় সে, "হিথে কী কর রিয়া হৈ। রুক।"

আর রুক। লোকটা গতিবেগ আরও বাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কন্নু তাকে ঠিকমতো দেখতে পায়নি। নারী কি পুরুষ, জোয়ান কি বুড়ো বোঝা দায়। কারণ মানুষটা আপাদমস্তক ধূসর চাদরে ঢেকে নিয়েছে নিজেকে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় শুধু সেই চাদরটাই দৃষ্টিগোচর হল।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। শ্রীনগরের রাজপথের উপর দিয়ে দুটো ছায়া প্রাণপণে ছুটে চলেছে। সামনের ছায়া আচমকা সাঁৎ করে কোথায় যেন সরে পড়ল। পিছনের ছোট ছায়াটা এদিক-ওদিক দৌড়ে প্রথমজনকে খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু এত ছায়ার মধ্যে কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল কে জানে। কন্নুর কানে এল শুধু দ্রুত জল কাটার ছপছপ আওয়াজ। লোকটা কি নৌকোয় চড়ে পালিয়ে গেল। চতুর্দিক দিয়ে ঘনিয়ে আসা পাহাড়গুলো যেন বিস্মিত হয়ে রুদ্ধশ্বাসে এতক্ষণ গোটা কাণ্ডটা দেখছিল। তাদের গায়ে জোনাকির মতো মিটমিটে আলোগুলোও যেন অপলকে তাকিয়ে ঘটনাটা দেখছে।

"ভাগ গিয়া সা-লে।"

AMARBOI.COM

হাঁফাতে হাঁফাতে কন্নু দাঁড়িয়ে পড়ে। নাঃ, আর দৌড়োদৌড়ি করে লাভ নেই। লোকটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

"হল্ট!"

আচমকা একটা ঘ্যাস্‌স্‌স করে শব্দ। একটা গাড়ি ব্রেক কষে এসে দাঁড়াল। তার চোখের সামনে দপ করে একটা আলো জ্বলে ওঠে। সে চোখে হাত চাপা দেয়। আলোটা চোখে লাগছে। চোখ বুজেই সে টের পেল আর্মি বুটের ভারী শব্দ। তার সঙ্গে একটা ভারী গলা, "আবে সা-লে। ইধার ক্যারা কর রাহা হ্যায়? এত রাতে বাইরে ঘুরছিস কেন?"

কন্নুর ভয়ে গলার স্বর বুজে যায়। ওরে বাবা। এ তো আর্মির লোক। এমনিতেই আর্মি আর যমদূতের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। তার ওপর মনে হয় নেশা করেছে। সে আস্তে-আস্তে চোখ থেকে হাত সরায়। কোনওমতে বলে, "কিছু না সাব।"

দশাসই ভারতীয় জওয়ানের চোখে সন্দেহ। মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ আসছে। কন্নু একটু সরে দাঁড়ায়।

"কিছু না তো ভাগছিলি কেন? অ্যাঁ?"

জওয়ান বলতে-বলতেই থেমে যায়। ততক্ষণে স্ট্রিটলাইটের আলোয় আসল দৃশ্যটা তার চোখে পড়েছে। সে স্তম্ভিত হয়ে দেখে, বন্ধ দোকানের শাটারে, হোটেলের জানালায় জানালায় লেখা আছে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ। মাতাল হলেও অক্ষরগুলো পড়ে মানে বুঝতে অসুবিধে হল না তার। পরিষ্কার পঞ্জাবি অক্ষরে লেখা আছে, "সওয়াগতা হৈ জিহাদি!"

"ওয়েলকাম জিহাদি!" জওয়ানের মাথায় রক্ত চড়ে যায়, "সা-লে। মাদার.....! কুছ নেহি তো এটা কী? খাবি, থাকবি ইন্ডিয়ায়। আর এই বয়সেই জঙ্গিদের সঙ্গে জিহাদ করতে নামবি। মামাবাড়ি। নমকহারাম!"

এক প্রচণ্ড থাপ্পড় এসে পড়ল কন্নুর গালে। তার মনে হল চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। ভারী হাতের চড়ে সে ঝড়ে বিপন্ন পাখির বাচ্চার মতো মাথা ঘুরে সপাটে আছড়ে পড়ল রাস্তার ওপরে। কাটা ঠোঁটটা দিয়ে ফের দরদর করে রক্ত পড়ছে।

সে কঁকিয়ে ওঠে, "মেরি গল তো সুনো সাব।"

"কেয়া?" ভারী বুটটা কন্নুর বুকের উপরে তুলে তাকে পিষতে-পিষতে হিসহিসিয়ে উঠল জওয়ান, "কী কথা বলবি? সা-লা। নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয়। দুধের দাঁত এখনও পড়েনি, অথচ এখনই জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস। ওয়েলকাম জিহাদি। সা-লে সাঁপ চাহে যিতনা ভি ছোটা হো, সাঁপ সাঁপ হি হোতা হ্যায়। বিষদাঁত বেরোনোর আগেই সাপকে কুচলে দেওয়া উচিত। এই ভাবে।"

কন্নুর মনে হচ্ছিল, তার বুকের হাড়গুলো বুঝি মটমট করে সব ভেঙে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতেই ভয়ার্ত চোখে দেখল জওয়ানের হাতে উঠে এসেছে এ কে ফর্টি এইট। ধাতব জিনিসটা তার কপাল স্পর্শ করল। সে ভয়ে নিঃশ্বাস নিতেই ভুলে গেল বুঝি বা।

"তোদের এভাবেই মারা উচিত," জওয়ানের নিষ্ঠুর কণ্ঠ ঘোষণা করে, "মহারাণা প্রতাপের সৌগন্ধ, কুত্তার মওত মারব তোকে। যাতে সব জিহাদি বোঝে যে 'ফণ' তুললে এভাবেই পায়ের তলায় ফেলে কুচলে দেওয়া হবে... দুধ মাঙ্গো তো ক্ষীর দেঙ্গে, কাশ্মীর মাঙ্গো তো চিড় দেঙ্গে। সমঝা সা-লে।"

একটা প্রচণ্ড শব্দ। শান্ত, ঘুমন্ত শ্রীনগর ধড়মড় করে উঠে বসল এ কে ফর্টি এইটের ফায়ারিংয়ের ভয়ংকর শব্দে। রাতচরা পাখিগুলো সভয়ে চিৎকার করে উড়ে গেল।

চতুর্দিকে তখন বারুদের গন্ধ।

আট

বনভূমির নাম 'পান্নর জাগীর'।

বেশ ঘন জঙ্গল। বহু বছর ধরে এই বনভূমিতে বোধহয় মানুষ ঢুকতে পারেনি। তখন থেকেই গাছগুলো দিব্যি নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। এখানকার দেবদারু আর চিনার বনের ঘন রসাল সবুজ রং দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন একটা সবুজ উড়নি আচমকা এলিয়ে পড়েছে পাথুরে মাটির উপরে। পেশল পাথরকে প্রেমিকার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে অরণ্য। কঠিন পাহাড়ের বুকে একটুকরো কোমল ছাউনি। তার মধ্যেই ঝরনার জলতরঙ্গ গোটা বনভূমির মৌনতাকে ভেঙে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। মনে হয় আচমকা একদল দুষ্টু অপ্সরার দল কোনও মৌন-গম্ভীর ঋষির তপস্যাকে ভাঙার জন্য এসে হাজির হয়েছে বুঝি। খলখল, খিলখিল স্বরে হেসে উঠছে তারা। কখনও তাদের কণ্ঠস্বরে মিষ্টি কিনিকিনি, কখনও পায়জোড়ের তীব্র ছমছম, ঝমঝম অরণ্যকে মুখর করে তোলে। পাথরের কঠিন দেহকে রেশমি আলিঙ্গনে জাপটে ধরে রতিরসে বয়ে চলেছে জলস্রোত। কোথাও তিরতির, কোথাও ঝিরঝির আবার কখনও ঝরঝর।

স্মিত হাসির মতো সোনালি রোদ মেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ঝোরাগুলোর এই চাঞ্চল্য উপভোগ করে দেবদারুগাছের দল। ওদিকে চিনারগাছ যেন তাদের জন্যই লালচে রঙের পাতা ঝরিয়ে পেতে রেখেছে পাতার কার্পেট। এই অরণ্যের রাস্তার আসল রং কী, তা বোধহয় সকলেই ভুলে গিয়েছে। কারণ চিনারের পাতায় ঢেকে আছে গোটা পথ। পথের মাঝখানে মৃদু লাল রঙের পাতার রেশমি গালিচা, কোথাও বা লাল রংটা একটু গাঢ়। পথের দু'পাশের লাল আভা পুরনো হয়ে গিয়ে হালকা বাদামি রং ধরেছে। প্রান্তসীমায় একেবারে গাঢ় বাদামি। এই হৈমন্তী রং-বেরঙের পাশে কোথায় লাগে বিখ্যাত কাশ্মীরি কার্পেট। ঝরনার খলখলে, গাছের মর্মরধ্বনিতে এখনও শোনা যায় সৃষ্টির আদিযুগের ইতিহাস। তখন মানুষ ছিল না। কিন্তু এই বৃহদাকার বনস্পতিরা হয়তো সে যুগও দেখে এসেছে।

স্বরাজ নীরবে হেঁটে যাচ্ছে বনের নির্জন পথ ধরে। তার একটু আগে-আগেই হাঁটছে তার বন্ধু পরমিন্দর। পাতলা-পাতলা কুয়াশার পিছনে পরমিন্দরের অস্পষ্ট আভাস।

সে অবাক হয়। এ কী। পরমিন্দরের বয়স তো বাড়েনি। অথচ স্বরাজ কত লম্বা হয়ে গিয়েছে। তার পরনে এখন শার্ট-প্যান্ট। হালকা দাড়ি, গোঁফের রেখায় সে রীতিমতো সুদর্শন যুবক। কিন্তু পরমিন্দর এখনও কত ছোট। আজও সে সেই বহু ব্যবহারে মলিন ছেঁড়া হাফপ্যান্টটাই পরে আছে। স্বরাজ একটা উইন্ডচিটার পরে আছে। তবু ঠান্ডা লাগছে। অথচ পরমিন্দরের গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি।

এ অরণ্য তাদের অচেনা নয়। ওরা দু'জনে কৈশোরে এই অরণ্যেই রাত্রিবেলায় হানা দিত। তখন স্বরাজের বাপু অসুস্থ। ভুট্টার ঠেলা আর লাগাতে পারত না। সংসারে চারটে প্রাণীর নুন-ভাতটুকুও জোটে না। বাধ্য হয়ে লালার কাছে কাজ চাইতে গিয়েছিল স্বরাজ। লালা বলেছিল, "কাজ দিতে পারি। কিন্তু কাউকে বলা চলবে না। বাড়িতেও বলবি না। গন্দারি করলে শেষ। বুঝেছিস?"

কাজটা সহজ ছিল না। স্বরাজ, ইসমাইল আর পরমিন্দরের মতোই আরও কিছু হাভাতের দল রাতের বেলা ঢুকে যেত এই অরণ্যে। গোপনে কাঠ কেটে সেই কাঠ জমা দিত লালার কাছে। লালা সে কাঠ নিয়ে কী করত তা ওরা কেউ জানে না। কিন্তু এটুকু জানত, এটা বেআইনি। এটুকুও বুঝতে বাকি ছিল না যে, কাজটা যথেষ্টই 'খতরনাক'। যে-কোনও সময়ই আর্মির রাইফেল তাক করতে পারে ওদের বুক। অথবা লেপার্ড, ভালুকের শিকার হতে পারে। অনেকে হয়েছেও। আর্মির জওয়ানের অটোম্যাটিক রাইফেলের বুলেটে লেখা হয়েছে অসংখ্য কিশোর আর সদ্য যুবকের নাম। ভালুক, লেপার্ডের আক্রমণে নিহত হয়েছে কত ছেলে! তাদের রক্তাক্ত দেহ খুঁজেও পাওয়া যায়নি। তাদের পরিবার জানতেও পারেনি যে, বাড়ির ছেলেটা কোথায় গেল। ওরা শুধু এইটুকু জেনেছিল যে, তাদের সন্তান লালার কাছে কিছু একটা কাজ করে। কিন্তু লালা যথারীতি অস্বীকার করে। স্বরাজ, ইসমাইল, পরমিন্দররা জানত সব ঘটনা। কিন্তু বলার সাহস ছিল না কারও।

"পরমিন্দর!"

পিছন থেকে ডাকল স্বরাজ, "দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস?"

পরমিন্দর থমকে দাঁড়ায়। এদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ছেলেটা অবিকল একই রকম দেখতে আছে। চোখ দুটো একইরকম কৌতূহলী। সব বিষয়েই বড় কৌতূহল ছিল তার। প্রায়ই জিহাদিদের গল্প শুনতে চাইত। অনেক শুনে-টুনে বলত, "আচ্ছা, জিহাদিরা যদি কাশ্মীরকে আজাদ করে, তবে কী হবে বল তো?"

"কী?"

"আমার মা-বাপুর রোজগার থাকবে না," সে মিটমিট করে হাসে, "আমরা সব না খেয়ে মরব।"

"কেন?"

পরমিন্দরের বাপু চন্দনওয়াড়িতে স্লেজ চালাত। বরফের উপর ট্যুরিস্টদের স্লেজে করে ঘোরাত। আর ওর মা বরফে চলার জুতো ভাড়া খাটাত। মিলিটারিদের ফেলে দেওয়া জুতো সেলাই করে আর্মি বুটগুলো ট্যুরিস্টদের ঘণ্টার হিসেবে ভাড়া দিত। তাতেও সংসার চলত না।

"দ্যাখ," পরমিন্দর হাসতে হাসতেই বলে, "হয় কাশ্মীর আজাদ হবে, নয় পাকিস্তানে পড়বে। যাই হোক, কাশ্মীরের ভূস্বর্গ ইনসানগুলোই মরবে। কারণ তখন আর কেউ এখানে বেড়াতে আসবে না। আমার মা-বাপু বলে, এই 'ট্যুরিস্টলোগদের' দিয়েই আমাদের কামাই হয়। তিব্বত থেকে, চিন থেকে, আরও দূর-দূর থেকে বিদেশি সাব-জনানিরা আসে বলেই আমাদের চলে। অফ-সিজনে কেমন কষ্ট হয় দেখিসনি? কিন্তু কাশ্মীর পাকিস্তানে চলে গেলে, ওই পুরা সাল অফ-সিজনের মতো হাল হবে। কেউ বেড়াতে আসবে না। সবাই বলে পাকিস্তান গরিব দেশ। গরিব দেশে কে পয়সা দিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে আসবে বল? ওদের কে দেখে তার ঠিক নেই, ওরা আমাদের দেখবে? পাকিস্তানকে অন্য দেশের লোকও ভয় পায়। কেউ আসবে না। হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আজাদ হলে জঙ্গির অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী ভেঙে দেবে। হজরতবাল মসজিদ তো একবার নষ্ট হয়েছেই, আবার কী হবে কে জানে। তবে কোন উল্লু কা পাঠ্ঠা এখানে মরতে আসবে?"

তখন মনে হত পরমিন্দর বড় বেশি পাকা-পাকা বুলি বলছে। কিন্তু যত বয়স বাড়ছে, ততই বুঝতে পারছে, পরমিন্দর কথাগুলো হয়তো ভুল বলেনি। ওকে তখন 'জ্যাঠা ছেলে' বলে মনে হত। অথচ এখন মনে হয়, ও সেই বয়সেই স্বরাজদের থেকে অনেক বেশি পরিণত ছিল।

পরমিন্দর এবার তার মুখোমুখি দাঁড়ায়। স্বরাজের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু নীলাভ জেলির মতো একটা ঝর্ণাধারা সান্দ্র স্তর তাদের দু'জনের মাঝখানে অদ্ভুত একটা বিভেদ তৈরি করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, অন্য দুনিয়া থেকে কথা বলছে পরমিন্দর। তার চোখে সেই আগেকার কৌতুক, "কী বে আজাদির সেনানী। নিজের বলি চড়াতে চললি মুরাখ!"

স্বরাজের এবার রাগ হয়। সে প্রতিবাদ করে, "কী করতাম? তা ছাড়া, অন্যায় কী করছি?"

"আবে অন্ধো মে কানা রাজা। আঁখে খোল।" পরমিন্দর হেসে ওঠে, "তুই আজাদি আনতে যাসনি। দাঙ্গা লাগাতে চলেছিস। ওই সা-লে কুত্তেরা লালা তোকে একেবারে হিন্দু বামনা নাম দিয়ে পাঠিয়েছে কেন জানিস না।"

ওর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না স্বরাজ। কোনও মতে বলল, "না। জানি না।"

"তাহলে সিধা তাকাতে পারছিস না কেন কাকে।" আবার সজোরে হেসে ওঠে পরমিন্দর, "চোর দি দাড়ি ভিচ তিনকা। যে-লোকটাকে ওড়াতে যাচ্ছিস, কালকের খবরের কাগজে তার ছবি দেখিসনি? সা-লে কাল দো পহরেই তুই জেনেছিস। চিনতেও পেরেছিস লোকটা আসলে কে। এক বিখ্যাত ইমামসাব কাশ্মীরে আসছেন, প্রথমে জম্মুতে বৈষ্ণোদেবী হয়ে তারপর শঙ্করাচার্যের মন্দিরে আসবেন। সেই ইমামসাব যাকে তুই ওড়াতে যাচ্ছিস, তিনি 'হর ধরম ভিচ একতা, অমন'-এর 'সন্দেশ' নিয়ে আসছেন। এখন স্বরাজ কাটরা নামের এক ঠিঠ বামনা যদি তাকে উড়িয়ে দেয়, তবে আবার একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে। সব জাত তরোয়াল নিয়ে নেমে যাবে। ফের খুনোখুনি। তারপর আর্মি নেমে দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে কতগুলো গরিব লোককেও ধরে কচুকাটা করবে। লালা এটাই চায়। কাশ্মীরকে শান্ত থাকতে দেবে না। আর্মি যখন দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত থাকবে তখন জিহাদি বল কী 'আতংবাদী', শালারা চুহার মতো ঢুকে পড়বে বর্ডার দিয়ে। আর এর জন্য দায়ি হবি তুই। তুই তো মরে বাঁচবি। আর লালা কতগুলো 'মাসুম' লোকের রক্ত দেখে হাসবে। হাঃ। চিড়িয়া দি মওত তে গাঁওয়ারা দা হসা।"

"ইয়ে তখ্‌ত কি লড়াই হ্যায়, ইয়ে কুর্সিওঁ কি জঙ্গ হ্যায়।
ইয়ে বেগুনাহ খুন ভি সিয়াসতোঁ কা রং হ্যায়।"

স্বরাজ বিহ্বল। ঠিক এই কথাই সে গতকালের খবরের কাগজটা দেখামাত্রই বুঝে গিয়েছিল। লোকটার হুলিয়া তার মনেই ছিল। তাই ইমামসাহেবের ছবি দেখামাত্রই চিনতে পেরেছে। কাশ্মীরি অক্ষরগুলো পড়তে কোনও অসুবিধে হয়নি তার। ইমামসাহেব সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা প্রচারের জন্যই আসছেন। আর দিন-আষ্টেক পরেই এসে পড়বেন। এঁকে মারতেই এসেছে স্বরাজ। মনে-মনে অবিকল এই কথাটাই ভাবছিল ও। 'আজাদি' আনার জন্য নয়, দাঙ্গা লাগানোর জন্য তাকে পাঠিয়েছে লালা। স্বরাজ কাটরা স্বাধীনতার সেনানী নয়, এক দাঙ্গাবাজ উন্মাসিক হিন্দু নামে লোকের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। সে গতকালই আসল ঘটনাটা বুঝে গিয়েছিল। কিন্তু পরমিন্দর তার মনের কথাগুলো অবিকল জেনে গেল কী করে?

"তাহাড়া আজাদি কি এমনি-এমনি আসবে? কোনও না কোনও জঙ্গিদলের হাত ধরে আসবে। ধর, এল। ফির কী হোগা ইয়ারা?" গম্ভীর মুখ করে বলে পরমিন্দর, "আজ কাশ্মীরে কোনও মুসলিম মেয়ে বোরখা পরে না। সালোয়ার-দোপাট্টা পরে বেরোয়। মৌলবাদীরা তখত্‌-এ এলে সব মেয়েদের বোরখা পরাবে। আজ সব 'কুড়িয়াঁ', 'মুণ্ডাদের' সঙ্গে টক্কর দিয়ে লড়াই-শড়াই করছে। মৌলবাদীরা ওদের পড়াশোনা করার হক কেড়ে নেবে। আজ সবাই বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতের জ্ঞান পাচ্ছে, আজাদি এলে স্রেফ কোরান পড়ানো হবে। অকলকে অন্ধো কিছু লোক অন্ধা ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। এই হচ্ছে জিহাদের ভবিষ্যৎ।"

স্বরাজ সব কিছুই জানে। সে নিজেই গতকাল রাত্রে এসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন পরমিন্দরের মুখে এই কথাগুলো শুনতে একদম ভাল লাগছে না। সে রাগত দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে।

"যাত্তেরে মতো খেমাচ্ছিস কী?" পরমিন্দর বলল, "মারবি নাকি?"

স্বরাজের চোখ রাগে রক্তবর্ণ। ও অবিকল যাত্রার বিবেকের মতো হাজির হয়েছে নাকের সামনে। খালি ডায়লগ মেরে চলেছে। স্বরাজের সমস্যা, 'মজবুরি'র কথা সে কী জানে?

"ওরে বাবা। মারবি বলেই তো মনে হচ্ছে।" পরমিন্দর আবার সজোরে হেসে ওঠে, "মরে হয়ে কো মারকে কৌনসি মেডাল লায়েগা তু? আমি কোন কালেই মরে গিয়েছি। তোর সামনেই তো বি এস এফ আমায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। তোরা কোনওমতে পালিয়ে যেতে পেরেছিলি। আমি পারিনি। আমার বাপ-মা লালার হাতে পায়ে ধরেছিল। কিন্তু লালাও সেদিন আর আমায় চেনেনি। কথাও রাখেনি। আমার পরিবারকে এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি। বুড়ো বাপটা সেই দুঃখ নিয়েই মরে গেল। মা'টা এখনও আমার অপেক্ষায় বসে থাকে। আমার অপেক্ষায় শান্তিতে মরতেও পারছে না। ওরা জানে না, কিন্তু তোরা সবাই জানিস— আমি আর ফিরব না।"

এবার সব মনে পড়ে গেল তার। তাই তো। পরমিন্দর বহু বছর আগেই চোরাই কাঠ কাটতে গিয়ে বি এস এফ-এর গুলিতে মারা গিয়েছে। কৈশোরেই থমকে গিয়েছিল তার জীবন। আজও বুঝি তাই সে কৈশোরেই থেমে আছে। রাইফেলের শব্দ ও তার মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর শেষ আর্ত চিৎকার ওরা সবাই শুনেছিল। তার পরের ইতিহাসও জানতে বাকি নেই। এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেয়নি লালা। এমনকী, হকের শেষ হফতাটুকুও মেরে দিয়েছিল।

"লালা নিজেই বেইমান।" পরমিন্দর বলল, "তোকেও মনে রাখবে

না। যে-টাকাটা দেখিয়েছে, তোর মওতের পর সেটা তোর পরিবারের হাতে পড়বে ভাবছিস? তুই তো মরবি। তারপর? টাকাটা কোথায় গেল কে জানবে? চাচা-চাচির হাতে যাবে, না লালা হজম করে ফেলবে, তুই কি জানতে আসবি?"

সে সন্দেহ তার নিজেরও ছিল। স্বরাজ কাতরভাবে বলে ওঠে, "তাহলে আমি কী করব পরমিন্দর?"

পরমিন্দর মৃদু হাসে। সে কোনও উত্তর না দিয়ে পিছন ফিরেছে। এখন তার আর স্বরাজের মধ্যে ধোঁয়াশা আরও ঘন। যেন আকাশের সাদা মেঘ ধূম্রকুণ্ডলী পাকিয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। স্বরাজ পরমিন্দরকে পাগলের মতো খুঁজছে। কিন্তু ছেলেটা ধোঁয়ার জালে ক্রমাগতই আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে।

"পরমিন্দর!" অসহায় কণ্ঠে ডেকে উঠল সে, "আমি কী করব! অব মৈঁ কী করা। বলে যা ভাই!"

পরমিন্দর কোনও কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন চোখের সামনে শুধু ধুঁয়া... ধুঁয়া।

স্বরাজ অসহায়ের মতো সেই ধোঁয়ার জালে জড়িয়ে পড়ছিল। আচমকা চেতনার সুদূর থেকে ভেসে এল একটা অদ্ভুত ধাতব শব্দ। শব্দটা অবিকল বমের ট্রিগার টেপার মতো।

স্বরাজ ধড়মড় করে উঠে বসে। সে তখনও ঘামছে। শব্দটা কি নিছকই তার কল্পনা? না অন্য কিছু? তখনও আলো ফোটেনি বাইরে। তার চতুর্দিকে বুড়োবুড়ির দল, এ ওর ঘাড়ে, সে তার ঘাড়ে উঠে জবুথবু হয়ে ঘুমোচ্ছে। শিশমহলের জলের বুক থেকে উঠে আসছে নীল ধোঁয়া। এমনই ধোঁয়া একটু আগেই ও স্বপ্নে দেখেছে। তাহলে? আওয়াজটাও কি তার আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকা মনের বিভ্রান্ত কল্পনা।

পিঁক... পিঁক...

আবার। আবার। না। শব্দটা বাস্তব। অদ্ভুত সংকেতে একটা ধাতব শব্দ মস্তিষ্কে পিন ফুটিয়ে চলেছে। পিঁক... পিঁক... অবিকল সেই ট্রিগার টেপার শব্দের মতো। পেটের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য। এখনই কি ফেটে বেরিয়ে আসবে সেই ভয়ংকর আগুন। নিরীহ বুড়োবুড়ির দল ঘুমের মধ্যেই ছাই হয়ে যাবে! নিরপরাধ মানুষগুলোর রক্তে লাল রঙবে শিশমহল।

এইটুকু ভাবতে মুহূর্তের ভগ্নাংশ নিয়েছিল স্বরাজ। তার মাথায় আর কিছু এল না। আর কোনও ভাবনা নেই সেখানে। সে আগুপিছু চিন্তা না করেই ধড়মড় করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিশমহলের জলে।

তখন শিশমহলের এক দিকে ভোরের আজানের অলৌকিক সুর ভেসে আসছে। অন্য দিকে মৃদুস্বরে, স্মিতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে গুরুনানকের বাণী—

'...আদ সচ, জুগাদ সচ
হ্যায় ভি সচ, নানক হোসে ভি সচ
সোচে সোচ না হোভেই, যো সোচি লাখবার।
চুপে চুপ না হোভেই যে লাই হর লখতার।
উখিয়া পুখ না উতারি যে বন্না পুরিয়া পার...।'

দু'দিক থেকে দুই ধর্মের সুর এসে মিশে গেল একসঙ্গে। এমনভাবে মিশল যে, একটা সুর থেকে আর একটা সুরকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। দুটো সুরই যেন মিলেমিশে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। দুটো সুরের শান্ত আকুতি যেন কোনও এক অজানা করুণাময়ের পবিত্র পদপ্রান্ত একসঙ্গে স্পর্শ করল।

ঠিক তখনই একগলা জলে দাঁড়িয়ে মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপছিল স্বরাজ। তার প্রতিটা শ্বাস তখন বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছে। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নয়, বুক থেকে একটাই শব্দ উঠে আসছে — 'পিঁক... পিঁক... পিঁক।'

নয়

পিঁক...পিঁক!

ঘড়ির অ্যালার্মের ধাতব শব্দে ঘুম ভাঙল ভরতের। সে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির অ্যালার্মটাকে বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময়ই 'ঝপাস' করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। কেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ভরত সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে বাইরের দিকে তাকায়। কই, এখনও তো আলো ফোটেনি! তবে কে জলের মধ্যে লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করছে।

"ওয়ে কল্লুকি মাম্মি।" নিদ্রাজড়ানো কণ্ঠে বলে সে, "কল্লুটা ফের শয়তানি শুরু করেছে। দেখ জরা। সর্দি লগ যায়েগি উসকো।"

গুরপ্রীত শেষ রাতেই বিছানা ছেড়েছে। ভরত আজ একদম ভোরে বেরিয়ে যাবে। সে জন্য এরমধ্যেই সে 'পালং খিচড়ি' বসিয়ে দিয়েছে। কাঁহাতক আর সেই এক শাক-ভাত খেতে ভাল লাগে? তাই আজ মেনুতে সামান্য বৈচিত্র। শাক-ভাতই বটে। কিন্তু একটু অন্যভাবে।

গুরপ্রীত তখন একতলায় ছিল। ওদের বাড়িতে একটা ঘর একতলায়, আর একটা ঘর দোতলায়। নিচের ঘরে তার শ্বশুর-শাশুড়িরা থাকে। ওপরে ভরত, গুরপ্রীত, কল্লু আর যসসি। সামনে একচিলতে বারান্দা। পিছনে রান্নাঘর। রান্নাঘর বলতে একটা ছোট খোলা জায়গা। একটা ছোট্ট চুলা। তাতে কখনও ডালপালা, কখনও কয়লা দিয়ে রান্না হয়।

তার চোখে মুখে উনুনের ধোঁয়া যাচ্ছিল। চোখটা জ্বালা-জ্বালা করছে। ভরতের কথা শুনে সে অবাক হয়। কল্লু এখন কী করে ফিরবে। গুলজারভাই কাল রাতে এসেই বলেছিল যে, কল্লুর নাইট ডিউটি আছে। সে চেঁচিয়ে বলে, "কল্লু কোথায়? উসানে ডিউটি হৈ না?"

এবার ভরতের মনে পড়ল। সে উঠে বসে বিড়বিড় করে বলে, "সহি দস্যা। ভুল্লে তো।" তারপর কী মনে করে স্বগতোক্তি করল, "ফির পানি ভিচ ছেলা কিসনে মারি? কে রে?"

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলাতে-গলাতে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল ভরত। স্বরাজ তখনও চোয়াল শক্ত করে, চোখ বুজে জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভরত অবাক।

"এ কী। তুমি পানিতে দাঁড়িয়ে কী করছ?"

পিঁক পিঁক শব্দটা তখনও আসছে। স্বরাজ ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়। আওয়াজটা ওই লোকটার কাছ থেকেই আসছে না? তবে কি ওই লোকটার কাছেই আছে ট্রিগারটা? ওই লোকটাই কি...?

"ওহ্। সাড্ডা ঘড়ি।" ভরত মৃদু হেসে ঘড়িটা দেখায়, "অ্যালার্ম বাজছে। আজ সকালে এক পার্টিকে তোলার কথা। তাই..." বলতে বলতেই তার ভুরু কুঁচকে যায়, "কিন্তু তুমি এই সাতসকালে জলে ডুবকি মেরে কী করছ?"

স্বরাজের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা এতক্ষণে ধপধপ করে জোর তালে কাজ করতে শুরু করেছে। এতক্ষণ রক্ত শিরা-উপশিরায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এখন ফের ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন একটা আশ্চর্য শান্তি মানুষকে ক্লান্ত করে দেয়, তেমনই একটা শান্ত ক্লান্তি টের পেল সে। তাহলে আওয়াজটা ট্রিগারের ছিল না। অ্যালার্ম ঘড়ির ছিল। সত্যিই তো। ট্রিগারের আওয়াজ হলে এতবার বাজত না। আর স্বরাজও এতক্ষণে ধোঁয়া হয়ে যেত।

এখন স্বস্তি পেলেও ফের একটা আতঙ্ক ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। ভরত জানতে চাইছে যে, সূর্যের আলো ফোটার আগেই সে জলে নেমে কী করছে। প্রশ্নটার উত্তর কী দেবে? ঢোঁক গিলে বলল, "ওই আর কী... আদত...।"

"ওহো!" ভরত হেসে ফেলল। নিজের প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই বিজ্ঞের মতো দিয়ে দেয়, "তর্পণ করছ। কাটরাদের ছেলে, জপ-তপ তো করবেই। আমিও অবল নম্বরের মুরাখ যে জিজ্ঞেস করছি।"

স্বরাজ অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সে জীবনে তর্পণ করেনি। লোকটা আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে সে তর্পণের 'ত'ও জানে না। তার ওপর ভরত শেরগিলকে প্রথমদিন থেকে

AMARBOI.COM

একটুও বিশ্বাস করতে পারছে না স্বরাজ। কোনও লোক কি এত সরল হতে পারে? তাছাড়া লক্ষ করে দেখেছে, মানুষটা তার চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। একটু যেন এড়িয়ে চলে। ওকে যতটা সহজ মনে হয়, অতটা নয়। কিছু গোলমাল আছে।

ভরত মৃদু হেসে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল। স্বরাজ আগেই লক্ষ করেছিল একটা নৌকো দূর থেকে এদিকেই আসছে। ধোঁয়ায় আর আবছা অন্ধকারে ঠিকমতো দেখতে পায়নি। এবার ভাল করে নজর করতেই রক্ত হিম হয়ে যায় তার। কী সর্বনাশ! এ তো আর্মির বোট! দু'জন জওয়ান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার পিছনেই কন্নু! সে কোনওমতে উচ্চারণ করে, "আর্মি!"

"আর্মি!" ভরত অবাক হয়, "কোথায়?"

"এদিকেই আসছে।"

"কই, দেখি? কিধর?"

একটু উঁকি মারতেই দৃশ্যটা ভরতেরও চোখে পড়ল। আর্মির সঙ্গে কন্নু! মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ পাংশু হয়ে যায়। কন্নুর সঙ্গে আর্মি কেন? আর্মিকে ওরা বড় ভয় পায়। মৃত্যুও বোধহয় এমন নিষ্ঠুর নয়, যতখানি নিষ্ঠুরতা আর্মির ইতিহাসে আছে। ওদের চোখে সব কাশ্মীরিই আতঙ্কবাদী।

ভরত নিজে এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, স্বরাজের দিকে লক্ষও করেনি। একটু আগে স্বরাজ মৃত্যুভয়ে জড়োসড়ো হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে বরং এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল ছিল। আর্মি কেন আসছে? খবর পেয়েছে নাকি! তার জন্যই আসছে? এখনই ধরে নিয়ে যাবে! বেল্ট দিয়ে পেটাতে পেটাতে বলবে, "তুই আতঙ্কবাদী।" স্বরাজের মনে হল শিশমহলের জলে অদ্ভুত আলোড়ন! যেন জল থেকে লক্ষ-লক্ষ আঙুল বেরিয়ে এসে এখনই তার দিকে নির্দেশ করে বলে উঠবে, "এই যে। এখানে লুকিয়ে আছে আতঙ্কবাদ।" ঘাসের বন, বাঁশের ঝাড় কালো-কালো ছায়াময় কঙ্কালসার হাত তুলে তাকেই দেখাচ্ছে, "ওই যে! ওই যে!"

তার বুক থেকে মস্তিষ্ক অবধি শুকিয়ে গেল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যেন হৃৎপিণ্ডটা এখনই ফেটে যাবে। কোনওমতে গোটা শরীরটাই টুক করে জলে ডুবিয়ে দিল! ডুবসাঁতার দিয়ে সে বাঁশবনের দিকে চলেছে। এখনও আলো ফোটেনি। অন্ধকারে বাঁশবনে লুকিয়ে পড়লে জওয়ানরা তাকে দেখতে পাবে না। প্রচণ্ড ঠান্ডা জল সর্বাঙ্গে লক্ষ-লক্ষ বরফের সুচ ফোটাচ্ছে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে স্বরাজ নিঃশব্দে বাঁশবনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

বলাই বাহুল্য, শীতের চেয়ে বাঁচার তাগিদ বেশি।

অন্য দিকে দুই জওয়ানের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল কন্নু। একটু আগের কঠিন অভিজ্ঞতাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ছোট্ট দশ বছরের নমনীয় শরীরটা হি-হি করে কাঁপছে এখনও। এক মুহূর্তের জন্য বেঁচে গিয়েছে ও। কিন্তু এইটুকু বয়েসেই মৃত্যুভয় কাকে বলে টের পেয়েছে বাচ্চা ছেলেটা। একটা এ কে ফর্টি এইট নাকের সামনে উদ্যত হলে কেমন লাগে, বড় অসময়েই জেনে গেল সে!

উন্মত্ত, মাতাল জওয়ানটা তাকে মেরে ফেলতেই যাচ্ছিল। তাকে টার্গেট করে গুলি চালিয়েও দিয়েছিল। ভয়ে কন্নু চোখ বুজে ফেলে! এক মুহূর্তেই ঝাঁঝরা হয়ে যেত ওইটুকু দেহ। কিন্তু তার আগেই আর এক উর্ধিধারী কোথা থেকে দেবদূতের মতো উদয় হলেন। জওয়ানটির ওপরে লাফিয়ে পড়ে তার হাতের আগ্নেয়যন্ত্রটির অভিমুখ উপরের দিকে জোর করে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি। র‍্যাট-ট্যাট করে গর্জে উঠল এ কে ফর্টি এইট। কিন্তু তার গর্জন ব্যর্থ। ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার!

"কৌন মা... বে?" লাল-লাল চোখ করে প্রথম জওয়ানটি পিছন ফিরল। হয়তো যে-মানুষটি এই প্রকারের ধৃষ্টতা করেছে, তাকে একহাত নেওয়ার ইচ্ছেই ছিল তার। কিন্তু মানুষটিকে দেখেই কুঁকড়ে গেল সে! বলা ভাল, জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

জওয়ানটির পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন তারই এক সিনিয়র অফিসার, ক্যাপ্টেন দত্তা! তরুণ অফিসার হয়তো রাউন্ড দিতেই বেরিয়েছিলেন। কপালগুণে এই দৃশ্যটা তাঁর চোখে পড়ে গিয়েছিল। প্রবল ভ্রুকুটি করে বললেন, "লেফটেন্যান্ট রাঠৌর। হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুইং!"

"স্যার!" তটস্থ হয়ে স্যালুট ঠুকে বলল জওয়ান, "এই দেখুন। এই সালা জিহাদি চতুর্দিকে কী লিখে রেখেছে।"

চতুর্দিকে লেখা শব্দগুলো পড়ে 'স্যার'-এর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। তিনি ফের জওয়ানের পায়ের তলায় চাপা পড়া কন্নুর দিকে তাকালেন। এক মুহূর্তের জন্য সংশয় তাঁর মুখে ছাপ ফেলেছে। জিহাদিদের কোনও বয়স হয় না। তারা মায়ের পেট থেকে পড়েই বদমাইশি করতে শিখে যায়। কিন্তু তাঁর চোখ বলে দিল, এই দশ বছরের ভয়ার্ত, ক্রন্দনরত শিশু কোনওমতেই জিহাদি নয়। হতে পারে না। জিহাদিদের বয়স যতই হোক, আর্মির বুটের তলায় যতই চাপা পড়ুক, এ কে ফর্টি এইট যতই নাকের সামনে উদ্যত হোক, ভয় পায় না। এমনকী, মেরে ফেললেও কাঁদে না। যতই অত্যাচার করা হোক না কেন, 'তেবড়' যায় না! তাঁর এক সিনিয়র অফিসার একবার বলেছিলেন, "দত্তা, একবাত জান লো। জিহাদি কভি রোতে নহিঁ। চাহে উসকো মওতকে উপর হি কিঁউ না বিঠা দো, ফির ভি অকড়কে বৈঠেগা।"

এই বাচ্চা ছেলেটার ভয়ার্ত মুখ, অসহায় অশ্রুই বলে দিল সে নির্দোষ। তিনি তবু একঝলক ওর হাত দুটো দেখে নিলেন। যা ভেবেছিলেন, কোনও চকের দাগ নেই! দেওয়ালের অক্ষরগুলো খড়ি দিয়ে লেখা। বাচ্চাটা যদি এই লেখাগুলো লিখত তবে ওর হাতে খড়ির দাগ অবধারিত ছিল।

"কে বলেছে তোমায় যে এই 'মাসুম' বাচ্চাটা জিহাদি?" এক ধমক দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন দত্তা, "ছোড়ো উসকো। একটা বাচ্চা ছেলেকে এই ভাবে মারতে তোমার লজ্জা করল না? মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। এটা কী জাতীয় ভদ্রতা।"

রাঠৌর তবু কন্নুকে ছাড়ে না, বরং অসন্তুষ্ট স্বরে জানায়, "স্যার, ভোলি সুরত দেখে ভুলবেন না। এক নম্বরের শুয়োরের বাচ্চা। ওদের শেষ করে দেওয়াই উচিত।"

"চো-ও-প!" ক্যাপ্টেন দত্তার গলা চড়ল, "এখনই ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। দিস ইজ মাই অর্ডার।"

উপায়ান্তর না দেখে কন্নুকে ছেড়ে দেয় রাঠৌর। কন্নু উঠে বসতে গিয়ে কঁকিয়ে ওঠে। তার বুকে তখন যন্ত্রণা করছে। ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। বাচ্চাটার জামা খুলে দেখলেন কচি ফরসা বুকের উপর মিলিটারি বুটের লাল দাগ বসে গিয়েছে।

"ইউ..." অনেক কষ্টে উদ্যত শব্দটা আটকালেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "এই ভাবে সিভিলিয়ানদের উপর অত্যাচার করো তোমরা? তোমাদের মতো কয়েকটা মাথামোটা লোকের জন্য গোটা আর্মির বদনাম হয়। তোমাদের সবার কোর্টমার্শাল হওয়া উচিত। পতা হ্যায়, এক সরা মাছ সারে তালাব নু গন্দা কর দিন্দা হৈ। তোমার মতো কিছু জওয়ানের জন্য পুরো আর্মির নাম খারাপ হয়।"

ভর্ৎসনা শুনে লেফটেন্যান্টের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। সে সিনিয়রের দিকে তাকাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার গোঁ এখনও কমেনি। মনে-মনে সে এখনও দশ বছরের শিশুটিকে আতঙ্কবাদী ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না।

ক্যাপ্টেন দত্তা ভয়ে জড়োসড়ো কন্নুকে কোলে তুলে নিয়ে কড়া দৃষ্টিতে জওয়ানের দিকে তাকিয়ে বলেন, "গো ব্যাক টু দ্য ব্যারাকস। ইটস অ্যান অর্ডার। তোমায় আমি পরে দেখছি। এনি ডাউট?"

"নো স্যার।"

"কী বললে?"

লেফটেন্যান্ট গলা চড়িয়ে চিৎকার করে, "নো-ও-ও স্যা-র।"

সে আর কথা না বাড়িয়ে সশব্দে স্যালুট ঠুকে গটগট করে চলে গেল। ক্যাপ্টেন তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। এই ছেলেটাকে আজ যা করেছে তাতে ওর কোর্টমার্শাল হওয়া উচিত। এই জওয়ানটি অসম্ভব অবাধ্য। কিন্তু কয়েনের একটা পিঠ দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। সব ঘটনারই দুটো দিক থাকে। কাশ্মীরের মানুষ

আর্মিকে শত্রুজ্ঞান করে। অথচ মজার কথা হল, বিপদে পড়লে আর্মিরই শরণাপন্ন হয়। যে-জওয়ানটি এই শিশুটির ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল, সে কিছুদিন আগেই 'এল ও সি'তে প্রহরারত ছিল। রাজপুত। এমনিতেই মাথা গরম এবং অসম্ভব নির্ভীক লোক। মেবারের রাঠৌর! কথায়-কথায় মহারাণা প্রতাপ সিংহকে ধরে টানাটানি করে। গরমের দেশের মানুষ। তাকে কিনা পাঠিয়ে দেওয়া হল এমন জায়গায় যেখানে তাপমাত্রা -৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে -৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠানামা করে। একেই অসহ্য শীত, যখন তখন তুষারপাত হচ্ছে। জল-খাবারও ঠিকমতো পায় না। পরিবারের মুখ শেষ কবে দেখেছে কে জানে। রাতের পর রাত জেগে কাটায়। তার ওপর অনুপ্রবেশকারীরা তো আছেই। চুপিচুপি অনেকেই বর্ডার ক্রস করতে চায়। 'ঘুসপৈঠিরা' যে সবাই আতঙ্কবাদী তা নয়। কেউ ছোটখাটো জিনিস স্মাগলিং করে, চোরাই কাঠের ব্যাপার করে, আবার কেউ বা পাকিস্তান থেকে কাশ্মীরে রুটি-রুজির ধান্দায় চলে আসে। আটকালেই মাথা তাক করে পাথর ছুড়তে শুরু করে তারা। পাথর তবু নিরীহ অস্ত্র। কখন যে শত্রুপক্ষের গ্রেনেড, বোমা কিংবা শেল বাঙ্কারে এসে পড়বে তার ঠিক নেই। যখন তখন মরে যেতে পারে। কোথে যেতে পারে। কোথে সামনেই হয়তো অনেক সাথির মৃত্যুও দেখেছে। একটা 'সিপাহি' যে প্রতিকূল পরিবেশে, প্রাণটা হাতে নিয়ে, একা দাঁড়িয়ে রাইফেল বা বেয়নেট হাতে লড়ে যাচ্ছে, সেও তো মানুষ। একেই কষ্টের চূড়ান্ত, তার উপর যদি মাথায় ক্রমাগত পাথর, গ্রেনেড, বোমা, শেল পড়তে থাকে, কারই বা মাথার ঠিক থাকে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো জঙ্গি সংগঠনের উৎপাত তো লেগেই আছে।

ক্যাপ্টেন দত্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কাশ্মীরের মানুষদের সঙ্গে এ এক অদ্ভুত 'লভ অ্যান্ড হেট' সম্পর্ক তাঁদের। জনসাধারণ আর্মিকে বিশ্বাস করে না, আর্মিও জনসাধারণকে বিশ্বাস করে না। অথচ দু'জনকেই পাশাপাশি থাকতে হবে।

কন্নু তখনও ঠকঠক করে কাঁপছিল। ক্যাপ্টেন দত্তা তার দিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ওর এখন একটু খাবার আর গরম পানীয় প্রয়োজন। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে অসহায় শিশুটিকে নিয়ে গেলেন ব্যারাকের ক্যান্টিনে। সেখানে স্যান্ডউইচ, সসেজ আর হট চকোলেট খেয়ে বাচ্চাটার কাঁপুনি একটু কমল।

"ডরো নহিঁ পুত্তর।" তিনি সস্নেহে বলেন, "আমরা জানি ওই লেখাগুলো তুমি লেখোনি। কিন্তু তুমি ওখানে কী করছিলে বাবা?"

কন্নুর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। তবু সে আস্তে আস্তে জানায়, "আমি হোটেলে নাউট ডিউটি দিচ্ছিলাম সাব।"

"নাইটডিউটি!" ক্যাপ্টেন স্তম্ভিত। এইটুকু বাচ্চা ছেলে নাইট ডিউটি দিচ্ছিল! এখনই চাকরি করছে! তিনি বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। একটা জোরাল শ্বাস টেনে বললেন, "কোন হোটেলে?"

হোটেলের নাম বলল সে। ক্যাপ্টেনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ওই হোটেলের মালিককে তিনি দেখে নেবেন। একটা বাচ্চাকে দিয়ে এরকম গাধার খাটুনি খাটাচ্ছে। ১৪ বছরের আগে কোনও শিশুকে দিয়ে কাজ করানো যে বেআইনি সেটা ভালভাবে বুঝিয়েই ছাড়বেন ব্যাটাকে! নাইট ডিউটির ঠেলায় আর একটু হলেই আজ এই নিষ্পাপ শিশুটা মারা পড়ছিল।

"তুমি কি কাউকে ওসব লিখতে দেখেছ?"

"হাঁ সাব।"

"কী দেখেছ বলতে পারবে?"

"আহোঃ।"

কন্নু যা দেখেছে, যেটুকু দেখেছে কোনওমতে বর্ণনা করল। শুনতে-শুনতে ক্যাপ্টেনের কপালে ভাঁজ পড়ে। জল কাটার ছপছপ শব্দ শুনতে পেয়েছে বাচ্চাটা। লোকটা নৌকায় করে পালিয়ে গিয়েছিল। নৌকোয় করে কোথায় যেতে পারে সে? মীনাবাজার বন্ধ হয়ে যায় ন'টার মধ্যেই। শিকারা চলাও বন্ধ হয়ে যায়। থাকে শুধু হাউজবোটগুলো। কিন্তু হাউজবোটে তো ট্যুরিস্টরা আছে। তারা খামোখা এসব লিখতে যাবে কেন? তবে কি যে এসেছিল, সে জলের মধ্যেই কোথাও থাকে? শিশমহলে নয় তো?

"তোমার বাড়ি কোথায় বেটা?"

কন্নু উচ্চারণ করে, "শিশমহল।"

ক্যাপ্টেনের চোখে চাঞ্চল্য, "আচ্ছা। চলো তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।"

বলাই বাহুল্য, ভরতরা যে আর্মির বোটটাকে দেখেছিল, তারা কাউকে ধরতে আসেনি। কন্নুকে ফেরত দিতেই আসছিল। কন্নুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। ধোঁয়া কেটে স্পষ্ট হয়ে উঠল শিশমহলের দৃশ্য। কুচিরিপানার বুনো জলজ গন্ধ নাকে লাগল তাঁর। বাকি জওয়ানরা যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ায়। নোংরা জলের ছোঁয়াচ লেগে যাওয়ার ভয়ে হয়তো। ক্যাপ্টেন একটু ভর্ৎসনা মিশ্রিত ভ্রুকুটি করে তাকালেন তাদের দিকে।

ততক্ষণে ভরতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গুলজার আহমেদ। ভোরে ওঠা তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। আসলে বাল্যবয়স থেকেই নামাজ পড়ত। তাই ভোর হওয়ার আগেই চোখ খুলে যায়। কিন্তু গত ১৪ বছর ধরে ভোরে উঠলেও সে নামাজ পড়ে না। বরং ওই সময়টা সে তামাক দিয়ে দাঁত মাজে। এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁত মাজতে কাউকে দেখেনি ভরত। যতক্ষণ আজানের সুর শোনা যায় গুলজার ততক্ষণ দাঁত মেজেই যাবে। সুরটা যখন থেমে যায়, তখন সে কুলকুচি করে নেয়। অদ্ভুত লোক, তস্য অদ্ভুত স্বভাব।

আজও সে দাঁত মাজছিল। কিন্তু আর্মির বোটটা তার চোখেও পড়েছে। গুলজারের চোখে যেন ছাইচাপা আগুন দপ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই চোখ পড়ল কন্নুর দিকে। দশ বছরের শিশুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় জওয়ান। অদ্ভুত বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত সেদিকেই তাকিয়ে থাকল সে। যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। পরক্ষণেই 'দন্তমঞ্জন' পর্বে ইতি দিয়ে চলে এসেছে ভরতের কাছে।

আর্মির বোটটা এসে দাঁড়াল ভরত শেরগিলের বাড়ির সামনে। কন্নু একলাফে বারান্দার ওপরে লাফিয়ে নেমে জাপটে ধরল বাবাকে। কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলল, "বাপু।"

ভরত বিহ্বলের মতো তাকে কোলে তুলে নেয়। কন্নু তখন পাগলের মতো তার গালে গাল ঘষছে, কাঁদছে, আর বলছে, "বা-পু! বা-পু!" গত কয়েক ঘণ্টায় সে ভাবতেই পারেনি যে, নিজের পরিবারকে আবার দেখতে পাবে। যেন দীর্ঘ নির্বাসন কাটিয়ে ফিরেছে শিশুটি। ততক্ষণে অবশ্য বারান্দায় উঠে এসেছেন ক্যাপ্টেন দত্তা। একটু কড়া সুরেই বললেন, "তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। এইটুকু ছেলেকে কেউ হোটেলে চাকরি করতে পাঠায়? আর একটু হলেই আর ফিরে পেতে না ছেলেকে।"

ভরত এই দোষারোপের উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারে না। স্খলিত স্বরে বলে, "পর... কী হৈয়া সাব?"

"কী হৈয়া।" তিনি সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানালেন, "আর একটু হলেই তোমার ছেলে জিহাদির মওত মরত।"

"সে আর আশ্চর্য কী।" ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল গুলজার। এতক্ষণে মুখ খোলে, "পারলে তো আপনারা সবাইকেই জিহাদি, জঙ্গি বলে উড়িয়ে দেন। কন্নুর আগেও অনেকেই এভাবে মরেছে। ওর পরেও মরবে।"

ভরত প্রমাদ গোনে। গুলজারভাই কী সর্বনাশ করছে। কী দরকার আর্মিকে খোঁচানোর। ভরত নিজেও জানে সে বেআইনি কাজ করেছে। কন্নু যে এখনও বেঁচে আছে, তার জন্য এই লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কন্নুর যে পরিণতি হতে চলেছিল, তা ভাবলেই রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে।

গুলজারভাইয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকায় ভরত। আর্মি এখন শুধু সাবধান করছে। গুলজারভাইয়ের ডায়লগ শুনে চটে গিয়ে না শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেয়। সে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বলে, "গলতি হয়েছে মাই-বাপ। আর হবে না।"

"না হলেই ভাল।" ক্যাপ্টেন দত্তা বললেন, "কনোয়ালজিতের কথা

শুনে মনে হয় সম্ভবত যে-লোকটি জিহাদের বাণী লিখে আসছে, সে এই অঞ্চলেরই লোক। এ এলাকায় নতুন কেউ এসেছে নাকি? কোই অজনবী? কারওর রিশতেদার?"

ভরত মুখ খুলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই গুলজ়ার আহমেদের দৃঢ় স্বর, "না।"

ক্যাপ্টেন দত্তা এবার ভাল ভাবে দেখে নিলেন, বলা ভাল মাপলেন তাকে। না, সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। লোকটার শক্ত চোয়াল, তীব্র দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অবিশ্বাস আর ঘৃণার ভাব। তিনিও ঠান্ডা দৃষ্টি রাখলেন তার চোখে। এ এক অদ্ভুত দৃষ্টি বিনিময়। একজনের চোখে আগুন, অন্যজনের চোখে বরফ।

"ঠিক আছে," ক্যাপ্টেন দত্তা কথা বাড়ালেন না। বুঝে গিয়েছেন ওদের মেরে ফেললেও পেটের কথা বের করা যাবে না। তিনি একটু চিন্তিত মুখে বোটের দিকে পা বাড়ান। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে কোনও একটা অনাগত অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা ঘোঁট পাকাচ্ছে এই শিশমহলেই। কী 'খিচড়ি' পাকছে কে জানে। তারই প্রথম পদক্ষেপ এই দেওয়াল লিখন। শিশমহলের দিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে।

"সুক্রিয়া," পিছন থেকে আওয়াজ দিল গুলজ়ার, "সাব, ব্যারাকে কখন থাকেন আপনি?"

"কিউঁ?" ক্যাপ্টেন দত্তা এই প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে বললেন, "কী দরকার?"

"ভয় নেই। বোম মারব না," সে হাসল, "আমাদের কন্নুর জান বাঁচিয়েছেন আপনি। একটু খিদমত করার সুযোগ দেবেন না? 'স্পেশ্যাল মছি করি' আর রাজমা চাওয়াল দিয়ে আসব। আমরা গরিব, কিন্তু বেইমান নই। আর পারলে একটা লিস্টি করে দেবেন, কী-কী কাজ করা উচিত, আর কী-কী উচিত নয়। মানে কী-কী করলে আপনারা জিহাদি বলে ঠুকে দেবেন না।"

ক্যাপ্টেন দত্তা আবার শীতল দৃষ্টিতে দেখে নিলেন তাকে। আবার চোখাচোখি হল। গুলজ়ারের দৃষ্টিটা এবার একটু অদ্ভুত। চোখ দুটো ক্যাপ্টেনের তরুণ মুখে কী যেন খুঁজছে। লোকটার চোয়াল এখনও শক্ত, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত অন্বেষণ। তিনি কথাটার উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদু হাসলেন। সে হাসির অর্থও বোঝা দায়। দু'জন দু'জনের মনোভাব কত দূর কী বুঝল কে জানে। তবে ক্যাপ্টেন দত্তা আর কথা না বাড়িয়ে উঠে বসলেন বোটে। কন্নুর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাত নাড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল বোটটা।

"সা-লে।" এবার গুলজ়ার অগ্নিদৃষ্টিতে ভরতকে দেখছে, "আর্মির লোক দেখে গলে গেলি। ডরপোক। আমাদের সব কিছুতেই ওদের আপত্তি। 'এত ছোট ছেলেকে কাজে পাঠিও না।' অমুক কোরো না, তমুক কোরো না। হুঃ। আমরা কীভাবে থাকব, কী করব, কীভাবে বাঁচব, সব ওই 'খাঞ্জা খাঁ দি সপুত' বলবে নাকি। এরপর কোনও দিন রসুইঘরে ঢুকে বলবে পেঁয়াজ, 'লেসুন' খাওয়া চলবে না। অথবা গোসলঘরে ঢুকে গান গাওয়া বারণ। কিংবা মরবার আগে তিনবার হেঁচকি না তুললে জনাজ়া হবে না। ইবলিশের বাচ্চাগুলো সব কিছুতেই নাক গলাবে। 'ছেলেকে কাজে পাঠিও না'।" সে ক্যাপ্টেন দত্তার কথাগুলোই ভেংচে উচ্চারণ করে, "ছেলে কাজে না গেলে ওর স্কুল ফি, যসসির বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাটা তুই দিবি সা-লে। আমাদের ছেলে, আমরা কাজ করাতে পাঠাব। তোর কী বে?"

ভরত বিস্মিত হয়। এই গুলজ়ারভাইজানই তো কাল রাতে কন্নুকে কাজে পাঠানোর জন্য তাকে বকাবকি করছিল। এই মুহূর্তে জওয়ানটি যা বলে গেল, কাল রাতে সেও তো অবিতল একই কথা বলছিল। বারবার বলেছে, "ভরত, কন্নুকে চাকরি করতে পাঠানোটা ঠিক নয়। অতটুকু ছেলে এত চাপ নিতে পারবে না। তুই অন্যায় করছিস..."

অথচ এখন পুরো উলটো কথা বলছে। উলটো সুর গাইছে। হল কী। এরকম ডিগবাজি খাওয়ার কারণ অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না ভরত। সে কিছু বলতে যায়। তার আগেই গুলজ়ার গর্জন করে উঠল, "আর তুই? মসকা মারায় এক্সপার্ট। আর্মি তোর মাই-বাপ।"

বলতে-বলতেই তার চোখে ফের আগুন ধক করে ওঠে, "যদি আর্মি তোর মাই-বাপ হয়, তবে তুই শালা শুয়োরের বাচ্চা।"

কথাটা বলেই গুলজ়ারভাই নৌকোয় উঠে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না ভরতের দিকে।

বাঁশগাছের আড়াল থেকে গোটা ঘটনাটা দেখছিল স্বরাজ। সব কথা শুনতেও পেয়েছে। যখন আর্মি অফিসার কোনও বহিরাগতর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন আতঙ্কে সে নীল হয়ে গিয়েছিল। তার অজান্তেই জলের তলায় দুটো পায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পরকে চেপে ধরেছিল। খাঁচার বন্দি প্রাণীর মতো হাঁকপাঁক করতে-করতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল ও। কিন্তু শেষপর্যন্ত গুলজ়ার আহমেদ যখন অস্বীকার করল, তখন প্রাণে আরাম পেল। সেই সঙ্গে অন্য একটা আশঙ্কাও কাজ করছে। এতক্ষণ সে ভরতকে সন্দেহ করে এসেছে। এবার আচমকা সন্দেহের তিরটা গুলজ়ার আহমেদের দিকে ঘুরে গেল। লোকটা অস্বীকার করল কেন? আর্মির সামনে দাঁড়িয়ে অবলীলায় মিথ্যে বলল। অ্যাক্সিডেন্টের দিন ও ভরত শেরগিলের সঙ্গে ছিল। ভরতই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানিয়েছে যে, গুলজ়ারভাইয়ের পরামর্শেই সে স্বরাজকে শিশমহলে নিয়ে আসে। তবে কি গুলজ়ার আহমেদই লালার সেই বিশ্বস্ত লোক? কাউকে বিশ্বাস নেই। কাউকে নয়।

"কী করছিস তুই এখানে?"

হঠাৎ পিছন থেকে একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল। স্বরাজ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সে একাই এখানে লুকিয়ে নেই, ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নারীটিও অবিকল তার মতোই ভয়ার্ত। বাঁশবনের আড়ালে সেও নিজেকে লুকনোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আতঙ্কে এতক্ষণ তার উপস্থিতি টের পায়নি স্বরাজ।

সে এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে বুঝে ওঠার আগেই নারীটি ফিসফিস করে বলে ওঠে, "ওরা কাকে খুঁজতে এসেছিল? আমাকে? না তোকে? অ্যাঁ? তুইও দুশমন? তুইও দুশমন।"

বলতে বলতেই প্রতিনীর মতো খলখল করে হেসে ওঠে মেয়েটি। তার মুখ স্পষ্ট নয় কিন্তু কোঁকড়া-কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের ফাঁকে দুটো জ্বলন্ত চোখ একবার আপাদমস্তক দেখে নিল স্বরাজকে। তারপর দৃঢ় স্বরে বলে, "তুই ওদের লোক। তাই না? আমি জানি। আমি জা-নি।"

স্বরাজ শিউরে ওঠে।

দশ

"বাবু ফুল লাগবে?"

হাউজ়বোটের কাছে নৌকো লাগিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আফসানা। তার নৌকো এখন লাল, হলুদ রকমারি রঙের ফুলে ভরে আছে। এই মুহূর্তে তার হাতে লাল গোলাপের গুচ্ছ। শিশমহলের গোলাপ।

'বাবু' বলে যাকে ডাকা হল, তিনি হাউজ়বোটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ফুলদানির ফুলগুলো পুরনো হয়ে গেছে। তাজা ফুল দিয়ে যাও।"

"জি সাব।"

মৃদু হেসে হাউজ়বোটের সিঁড়ি দিয়ে ফুলের ঝুড়ি ঘাড়ে করে উঠে গেল আফসানা। এই হাউজ়বোটগুলোর সব কর্মচারী, বাবুর্চি, বাজার সরকার, ঠিকা কাজের লোক— সবাই শিশমহলের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকেই হাউজ়বোটের খবর পায় আফসানা। ওদের সঙ্গে নিজের সেট-আপ করে রেখেছে সে। কর্মচারীরা অন্য কোনও ফুলওয়ালা বা ফুলওয়ালিকে এদিকে আসতে দেয় না। এদিকে সব হাউজ়বোটগুলোকে ফুল দিয়ে সাজানোর অলিখিত বরাত আফসানার। বদলে ওদের 'হিস্যা' দিতে হয়।

এখন যে-হাউজ়বোটে ঢুকছে সে, এটাতে দু'দিন আগেই এক

নব-বিবাহিত বাঙালি দম্পতি এসেছে। সম্ভবত 'হনিমুন' পর্ব চলছে। কী প্রেম দু'জনের। একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতেই পারে না। প্রেমের চোটে চতুর্দিক অন্ধকার। এখনও অবস্থা দেখ দু'জনের। বিছানার উপর একটাই চাদর জড়িয়ে ঘন হয়ে বসে আছে। কেন? একটাই চাদর নিয়ে এসেছে নাকি! প্রেমের ঘটা দেখে হাসি পেয়ে যায় আফসানার। সে ফিক করে হেসে স্বগতোক্তি করে, "ইশক নে 'গালিব' নিকম্মা কর দিয়া/ ওয়ারনা হম ভি আদমি থে, কাম কে!"

"ওয়ে!" হাউজবোটের বাবুর্চি কথাটা শুনতে পেয়ে চোখ পাকায়। কাশ্মীরিতে বলে, "ফোড়ন কাটিস না। ব্যাটারা সব বোঝে। কাশ্মীরিতে কথা বল।"

ফিক করে হেসে জিভ কাটল আফসানা। সত্যিই! টিভির দৌলতে বাঙালিরাও দিব্যি হিন্দি-উর্দু বোঝে। এমনকী, কথ্য পঞ্জাবিও মাঝেমধ্যে বুঝে ফেলে। একবার এক বাঙালি কাস্টমারের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে খিটমিট হয়ে গিয়েছিল। বেচারি আফসানা আপনমনেই বলে ফেলেছিল, 'ফিট্টে মুহ তেরি তো...।'

বাপ রে। লোকটা কী ভয়ংকর মুখ-খিস্তি করেছিল। শুধু মারতে বাকি রেখেছিল ব্যাটা। তারপর থেকেই আল্লাহ'র নামে দিব্যি কেটেছে আফসানা, কোনও ভাবেই হিন্দি, উর্দু কোনও রকম ব্যাঙ্গোক্তি করবে না। একমাত্র কাশ্মীরি ভাষাটাই ওরা বোঝে না। অতএব যা মন্তব্য করার, কাশ্মীরিতেই করবে।

"আসসেল জুর্ড চ।" ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে বলল সে, "জুটিটা ভালই।"

বাবুর্চি মুখটা বেগুনের ফালির মতো লটকে গেল, "ছাতার মাথা ভাল। মালকিনের 'মিজাজ'-এর যা বহর। কিছুই পছন্দ হয় না। সব সময় বাহানা করেই যাচ্ছে। এ লড়কি 'বদমিজাজ'। ইয় কৌড় চ গর্মদেমাগ উইচ। লড়কা ভাগ যায়েগা ইসকো ছোড় কর।"

আফসানা হেসে ফেলল। কথা না বাড়িয়ে হাউজবোটটাকে সে সাজাতে শুরু করে। দরজা, জানালার ওপরে তাজা গাঁদাফুলের মালা টাঙিয়ে দিচ্ছে। আজ তাকে একা হাতেই কাজ করতে হবে। শুরপ্রীতদিদি আসেনি। সকালের ঘটনার পর কম্বু কিছুতেই বাপ-মা'কে ছাড়তে চাইছে না। পুরনো, শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলোকে হাত বাড়িয়ে ডাল-সৈকের জলে ফেলে দিতে যেতেই মেয়েটি হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

"আরে, কী করছ।" মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলে, "কোনও সিভিক সেন্স নেই তোমার? এভাবে লেকের জল নোংরা করছ! এমনিতেই জন্মের নোংরা জল, দেখলে গা ঘিনঘিন করে..."

আফসানার ভীষণ হাসি পায়। ইতিমধ্যেই এই বউটির 'শুচিবাই'-এর ঠ্যালা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পারলে হাউজবোটের মেঝেটাও অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। সবসময় 'হাইজিন হাইজিন' করে বেরাচ্ছে। ওকে নিয়ে একটু মজা করলে কেমন হয়?

আফসানা নিরীহ মুখে জানায়, "বিবিজি, আমি তো কয়েকটা ফুল ফেলছিলাম। কিন্তু এই হাউজবোটে সেপটিক ট্যাঙ্ক নেই জানেন তো? সব নোংরা কিন্তু জলেই পড়ে। আপনাদের 'খানা'র উচ্ছিষ্ট, সকাল-বিকেলে যত বার গোসলখানায় যান..."

"আমরা এই জল খাই না," গর্বিত স্বামী বউকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "আমরা বোতলের জল খাই। মিনারেল ওয়াটার।"

"সে তো খান," বদমাজেশি বুদ্ধিটা আফসানাকে পেয়ে বসেছে। সে মিটিমিটি হাসছে, "কিন্তু স্নান করেন কোন পানিতে সাব? আপনাদের খাবার রান্না করা হয় কোন জলে? এই নোংরা জলেই তো 'কুল্লা' করে মুখ ধুয়ে ফেলেন! 'চায়, কফি', সব হয় এই জন্মের নোংরা শ্যাওলা ভর্তি জলে। আমি কয়েকটা ফুল ফেলে আর এমন কী গুনাহ করেছি?"

কয়েক মুহূর্ত 'থ' হয়ে থেকে বউটি চিৎকার করে ওঠে, "আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না। ওহ, শিট। আমার বমি পাচ্ছে..." বলতে বলতেই সে দৌড়েছে টয়লেটের দিকে। পিছন পিছন 'জানু। জানু।' করতে করতে পত্নীপোষ্য স্বামীও গেলেন।

বাবুর্চি কিচেন থেকেই গোটা ধারাভাষ্য শুনতে পেয়েছে। সে এবার খুন্তি নিয়েই বেরিয়ে আসে। বাথরুমের ভিতর থেকে তখন প্রবল বমির আওয়াজ ভেসে আসছে।

"পার্টিটা গেল!" সে ভুরু কুঁচকে বলে, "তোর দরকার কী ছিল ওসব বলার। আমাদের কথা না ভাবলেও, নিজের পেটের কথা অন্তত ভাব। এভাবে যে তোর নিজের ব্যবসাও লাটে উঠবে। খাবি কী?"

তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হাসল আফসানা। মৃদু স্বরে বলে, "খয়রাত মে মিলি খুশি মুঝে অচ্ছি নহিঁ লগতি/ ম্যাঁয় অপনে দুখোঁ মে রহতা হুঁ নওয়ারোঁ কি তরাহ। সমঝে?"

আফসানা বিরক্ত হয়ে। এখনও আরও কতগুলো হাউজবোট তার ফুলের অপেক্ষায় বসে আছে। সেগুলোকে সাজিয়ে মীনাবাজারের দিকে চলে যাবে আফসানা। সকাল থেকে যত ট্যুরিস্ট শিকারায় চড়ে, তারাই তার 'শিকার'। নিজের নৌকোয় শিকারার পিছন-পিছন যায়। ওর সঙ্গে কিছু শিকারাওয়ালার ঘাট আছে। আফসানাকে পিছনে দেখলেই 'ধিমে' করে দেয় শিকারার গতি। ট্যুরিস্টদের ফুল বেচে আফসানা, ফুলের মালাও পরিয়ে দেয়। অনেকে শিকারায় বসে কাশ্মীরি সাজসজ্জায় সেজে নিজেদের ফোটো তোলে। সেখানেও কেশসজ্জার অন্যতম আভূষণ আফসানার গোলাপ। আফসানার সঙ্গে সকলেরই ভাল সম্পর্ক। ট্যুরিস্টদের সঙ্গেও কিছুক্ষণের মধ্যে সখ্য গড়ে তুলতে পারে সে। অবশ্য সবটাই ওর মিষ্টি স্বভাবের জন্য নয়, সুন্দর মুখের জন্যও বটে। আফসানা যেমন সুন্দর করে হাউজবোট এবং মানুষকে সাজিয়ে দেয়, তেমনই ঈশ্বরও ওকে অকৃপণভাবে সাজিয়েছেন। কোঁকড়া ঘন চুল, আঙুরের থোকার মতো গাল-কপাল ছুঁয়ে আছে। আইভরির মতো মসৃণ বাহুদু'টি থেকে উড়নি ক্রমাগতই পিছলে পড়ে। চোখ দুটোয় বুদ্ধি ও কৌতুকের দীপ্তি ঝিলমের উপরে রোদের মতো ঝিকিমিকি খেলা করে বেড়ায়। তার ওপর অমন পশমি একজোড়া চোখের পাতা। হাসলে শর্মিলা ঠাকুরের মতোই চোখের একখানা টোল পড়ে তার গালে। অনেকেই তাই ফার্জলামি করে তাকে 'কাশ্মীর কি কলি' বলে ডাকে।

কিন্তু কী হল এত রূপ-যৌবন থেকেও। যে-ভালবাসে বলে ভেবেছিল, সে অন্য মেয়েকে শাদি করে বসল। যাকে এখন সত্যিই পাগলের মতো চায়, যে হেঁটে চলে গেলে বুক পেতে দিতেও দ্বিধা করবে না, সে ফিরেও তাকায় না! শুরপ্রীত প্রায়ই কথায়-কথায় আফসানার স্বামী বিলালকে মা-বাপ তুলে খিস্তি দেয়। বলে, "বুঢ়বকটা এমন সুন্দর মেয়েটাকে ছেড়ে ওই বাঙালি পেত্নিটাকে বিয়ে করে কোন আক্কেলে? জড়িয়ে ধরলে কতগুলো হাড়ের খোঁচা খাওয়া ছাড়া আর কোনও আরাম নেই।" আফসানাকে বলে, "ওকে ছেড়ে চলে যেতে পারিস না? সতী লক্ষ্মীর মতো রেঁধেবেড়ে খাওয়াস, যত্ন করিস বলে দাম দেয় না। তালাক দিয়ে চলে যা। তারপর আমরাও দেখব, ওর বাঙালি বউ কেমন ওকে রান্না করে খাওয়ায়।"

আফসানা হেসে এড়িয়ে যায়। তালাক দিয়ে যাবে কোথায়? আফসানার মতো নারীরা স্বামীকে ছেড়ে একটি আশ্রয়েই প্রাথমিকভাবে যাওয়ার কথা ভাবে, বাপের বাড়ি। কিন্তু আফসানার বাপের বাড়ি বলতে কিছু নেই। কয়েক বছর আগেই জঙ্গিদের বোমায় উড়ে গিয়েছে তার পরিবার।

আফসানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নৌকোটাকে একটু সাইড করে। প্রায় রোজই এই সময়ে সে কিছুক্ষণের জন্য কাজকর্ম ভুলে শ্রীনগরের রাজপথের কাছাকাছি গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। এই সময়টা তার কাছে বড় আনন্দের। বড় ব্যথারও বটে। তার প্রিয় পুরুষ ঠিক এই সময়ে এই রাস্তা দিয়েই বাজারের দিকে যায়। না, সে বিলাল নয়। যে-মানুষটাকে পাওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছে, সে এক্ষুনি এখান দিয়ে যাবে। চোখে দেখেও আশ মেটে না। বুকের ভিতরে আনন্দের ঝিরিঝিরি স্রোত টের পায়। অথচ তাকে পাওয়ার উপায় নেই। এলওসি-র মতো নিজের চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়ি দিয়ে রেখেছে লোকটা। সত্যিই কি পাষাণহৃদয়? তাই হয়তো নির্লজ্জভাবে বারবার প্রেম নিবেদন করেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আফসানা?

তার মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথা। যেদিন সে নিজের মনের

কথা লোকটাকে নিভৃতে পেয়ে বলে বসেছিল। দুম করে হাত চেপে ধরে বলেছিল, "মেহ সিথ করখা মোহব্বত।"

পুরুষটি আপনমনেই কাজ করছিল। আঁতকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ক্যায়া।"

কাশ্মীরি শব্দগুলো আবার উচ্চারণ করল আফসানা, "আমি তোমায় ভালবাসি। কুবুল হ্যায়?"

মানুষটা কেমন হতবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর নীল চোখে বিপন্নতা। কণ্ঠস্বরে দ্বন্দ্বের আভাস স্পষ্ট, "আফসানা, এরকম ফাজলামি ভাল লাগে না।"

সে বেশ বুঝেছিল মানুষটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওই কপালপোড়াটার জীবনও মরুভূমির মতো। তাই মরূদ্যান দেখেও মরীচিকা সন্দেহ করছে, ভয় পাচ্ছে। ও দৃঢ় স্বরে আবার বলেছিল, "আমি তোমায় চাই। তোমার শরীর, তোমার মন, তোমার ভালবাসা— সব চাই।"

"আমি বয়সে তোর চেয়ে অনেক বড়। শাদিশুদা। তোকে ভালবাসার হক আমার নেই।"

আফসানা দেখছিল লোকটি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কথা বলছে। সে হাল ছাড়েনি, "বেশ তো। সরাসরি আমার মুখের ওপর কথাগুলো বলে দাও। পিঠ দেখাচ্ছ কেন? আমার চোখে চোখ রেখে বলো, আমায় ভালবাসো না।"

"বাজে কথা বলিস না। তুই বিলালের বিবি। আল্লানের মা।"

"জানি," আফসানা নাছোড়বান্দা, "তোমাকে ধর্মের পাঠ পড়াতে হবে না। শুধু বলে দাও, আমাকে চাও না। কথা দিচ্ছি আমি তোমার জীবন থেকে চলে যাব।"

মানুষটা বেদনার্ত চোখদুটো তার মুখের উপর ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "খুদা কে ওয়াস্তে, পর্দা না কাবে সে উঠা জ্বালিম/ কহিঁ অ্যায়সা না হো ইহাঁ ভি ওহি কাফের সনম নিকলে..."

সে আর কোনও জবাব না দিয়েই চলে যাচ্ছিল। হাত টেনে ধরল সাহসী মেয়েটি, "কোথায় যাচ্ছ? উত্তর দিয়ে যাও।"

"রাস্তা ছাড় আফসানা।"

"উত্তর দিয়ে যাও," আফসানা বলল, "একটাই তো লব্জ বলবে, হাঁ ইয়া না। তাতেও এত ঝিঝক?"

সেদিন সে উত্তর দেয়নি। নিষ্ঠুরের মতো হাত ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। এরপর অনেকবার ওর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে আফসানা। জবাব চাই তার। প্রিয়তম মানুষটির চোখে ভয় দেখা দিয়েছে, উত্তরটা বারবার এড়িয়ে গিয়েছে সে। আফসানা ছাড়েনি। বোঝানোর চেষ্টা করেছে, "খামোখা কেন পালিয়ে যাচ্ছ? ডরপোক তো তুমি নও!"

"তুই বিলালের বিবি," দুর্বল কণ্ঠে জবাব এল, "আমারও বিবি আছে।"

"বিলালের দুসরি বিবি আছে। আর তোমার বিবির গল্প আর শুনিও না!"

"আফসানা!" লোকটা আঙুল তুলে বলল, "অসভ্যতার একটা সীমা আছে।"

"অসভ্যতা! আমি তো শুধু ভালবেসেছি, খুন তো করিনি।"

প্রথম-প্রথম কোনও উত্তর দেয়নি সে। কিন্তু আফসানাও ছাড়ে না। অগত্যা অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বলেই ফেলল, "এর চেয়ে তুই আমাকে খুনই কর আফসানা। তোর ছুরি, তোর 'মোহব্বত'-এর চেয়ে অনেক বেশি সহজে আমার বুকে ঢুকবে।"

এত বড় আঘাতে কান্না পেয়ে যায় আফসানার। কোনও মতে বলে, "এত নফরত করো আমায়? এত ঘৃণা!"

"হ্যাঁ করি। নফরতই করি। মোহব্বত কী জিনিস আমি জানি না। জবাব পেয়েছিস? এবার রাস্তা ছাড়।"

লোকটা তাকে অবহেলায় ঠেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর তার ধারেকাছেও ঘেঁষে না। আফসানা কোনও গুজরে কাছে যেতে চাইলে ছিটকে চলে যায়। আফসানা যেন অদ্ভুত।

বাবা বলত, ঈশ্বরের দরবার থেকে নিঃস্ব হয়ে ফিরে গিয়েছিল আদম। 'খুলদ' বা 'জন্নত' থেকে আদমের পতনের কথা শুনেছিল সে। ঈশ্বরের দরবার থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে বিদায় নিত অপ্সরারাও। যখনই একটা করে ঝলমলে নক্ষত্রের চুমকি নীল আকাশের শলমা-জরির কারুকার্য থেকে খসে পড়ত, তখনই বাবা বলত, একটা পরি খুদার দরবার থেকে নির্বাসনে গেল।

আর আফসানা...

সে আকাশটা দেখতে দেখতেই হেসে ফেলে। হায় গুলজার আহমেদ! তুমি কি জানো বাবা বড় সত্যি কথা বলত।

'হক্কারোঁ খোয়াহিশেঁ এইসি, কে হর খোয়াহিশ পে দম নিকলে
বহোত নিকলে মেরে অরমান, লেকিন ফির ভি কম নিকলে।
নিকলনা খুলদ সে আদম কা সুনতে আয়েঁ হ্যায় লেকিন,
বহোত বে-আব্রু হো কর তেরে কুচে সে হম নিকলে।'

এগারো

আতঙ্ক, আতঙ্ক... এবং আতঙ্ক।

এই একটি শব্দই এখন প্রধান স্বরাজের জীবনে। কখনও বোমা ফাটার আতঙ্ক, কখনও লালার চরের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়, কখনও বা আর্মির নাম শুনলেই বুক কেঁপে ওঠা। হাতের কাছে রিমোটটা নেই। লালার 'লোক' কোথায়, তাও জানা নেই। যখন জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথে রওনা হয়েছিল, তখন জানত যে, একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে মরতে হবে তাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই 'নির্দিষ্ট' সময়ই 'অনির্দিষ্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ জানে না, কখন ট্রিগারটার লাল বোতামে চাপ পড়ে যাবে, সমস্ত কিছু ছারখার হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট পরিণতি যখন অনির্দিষ্ট এবং যে-কোনও সময়েই সম্ভাব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু নেই। হয়তো মৃত্যুযন্ত্রণাও এমন কষ্টকর নয়।

স্বরাজের মনে হয়, সে বোধহয় পাগল হতে চলেছে। সর্বক্ষণ কানের কাছে আতঙ্কের সেই ধাতব 'পিঁক... পিঁক' ধ্বনি। কোথাও বাসনপত্র পড়ার শব্দ হলে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মোবাইলের আওয়াজ, কব্বুর খেলনাগাড়ির শব্দ, হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক, মার্বেলে-মার্বেলে ঠোকাঠুকির টুংটাং, শুরপ্রীতের শখের হাওয়াঘণ্টির ঠুংঠাং, এমনকী, 'আজান' নামের একটি ছোট্ট শিশুর মজাদার জুতোর পিঁক পিঁক আওয়াজের মধ্যেই সে শুনতে পায় মৃত্যুর পদধ্বনি। ঘুমিয়ে পড়লেও সেই শব্দের ভীতি তার পিছন ছাড়ে না। ঘুমের মধ্যেই চমকে-চমকে ওঠে। ইঁদুরের খুটখুট, অথবা জলজ কোনও প্রাণীর জল কেটে যাওয়ার সামান্য শব্দ হলেও ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কখনও মধ্যরাতে বুড়ো-বুড়ির প্রেম করার শখ হয়। কখনও আর এক বুড়োর উপহার পাওয়ার লোভ হয়। কথা নেই, বার্তা নেই, দড়াম করে এক ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তোলে স্বরাজকে। আবদেরে নাকি সুরে বায়না করে, "কিখে হে মারো গিফট?"

কখনও ভয়ে সিঁটিয়ে যায় স্বরাজ, কখনও উন্মত্ত সন্দেহে লাল-লাল চোখ করে সবাইকে দেখতে থাকে। গুলজার আহমেদ আর ভরত শেরগিলও ঠিক লালারই মতো চোখে সুর্মা পরে। কেন? মাঝেমধ্যেই সে অনুভব করে একটা অদৃশ্য চোখ তার গতিবিধির উপর নজর রাখছে। কে সে? ভরত শেরগিল? গুলজার আহমেদ? গুলজারের বোন আরিফা? আরিফা কি আদৌ পাগল? তবে আর্মির লোককে দেখে সেদিন বাঁশঝাড়ে লুকিয়েছিল কেন? না অন্য কেউ? নাঃ, তার ভুল নয়, সত্যিই কেউ নজর রাখছে। তার প্রমাণ আজ সকালেই পেয়েছে সে।

তখন সবে ভোর হয়েছে। শিশমহলের প্রতিটি ঘর থেকেই কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে শুরু করেছে। রোজই এই সময়ে পোড়া কাঠ-পাতার গন্ধ পায় স্বরাজ। এই গন্ধটা তার পরিচিত। বাড়িতেও কাঠ-পাতা পুড়িয়ে মা রান্না করত। গন্ধটা পেলেই নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায় ওর। মনে পড়ে যায়, আরু ভ্যালির ছোট্ট এক শান্ত গ্রামে এক

AMARBOI.COM

কামরার ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকা। মনে পড়ে যায়, পাশ দিয়ে স্বচ্ছপ্রায় কচি কলাপাতা রঙের লিডারের কুলকুল শব্দে নাচতে-নাচতে চলে যাওয়া। ওখানে একমাত্র লিডারের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। দু'দিক দিয়ে পাইনবন নেমে এসে কলাপাতা রঙের লিডারকে কোথাও-কোথাও ঘন সবুজ করে দিয়েছে। বোনটা যখন বিনুনি বেঁধে লাফাতে লাফাতে লিডার থেকে জল আনতে যেত, তখন এক নিমেষে নারী ও নদী এক হয়ে যেত। আর মাকে মনে হত কৌলাহৈ হিমবাহের মতো। স্থির, শীতল, গম্ভীর। বড্ড কষ্টের সংসার তাদের। তবু মায়ের মুখের হাসিটুকু যেন শান্ত হিমশৈলের ওপরে সূর্যের সোনালি রঙের প্রথম রশ্মিটুকুর মতো। মায়ের হাতের ডাল আর চাপাটির স্বাদ মনে পড়ে। আর মনে পড়লেই খুব কষ্ট হয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে স্বরাজ। বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে লালার রক্তচক্ষু! মা, বাবা, বোনের কপালে ঠেকানো রাইফেল। কান্নাটাকে তখন চাপতে চায়। তবু অব্যক্ত কাঁপুনিটা রয়েই যায়।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাঠ-পাতা পোড়ার গন্ধেই চোখ খুলে গিয়েছিল। চোখ বেয়ে কখন যেন অজান্তেই দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে। সে হাত দিয়ে মুছে ফেলল। উঠে বসতে যাবে, হঠাৎই পাশের খোলা জানালা থেকে তার মুখ লক্ষ করে কে যেন সপাটে কী একটা ছুড়ে দিয়েছে।

এইরকম ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না স্বরাজ। প্রথম অভিঘাতেই ঘাবড়ে গিয়ে ধড়ফড় করে সরে গেল। কিন্তু মুহূর্তের ভগ্নাংশেই চোখে পড়ে, বিপজ্জনক কিছু নয়। নিতান্তই সাদামাঠা একটা খবরের কাগজ! কিন্তু এরকম মুখের উপর ছুড়ে মারার মানে কী। এ আবার কী জাতীয় ভদ্রতা। স্বরাজ বিরক্ত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করে।

আশ্চর্য। বাইরে কেউ নেই। একটা খলবল শব্দ শুধু কানে এল। যেন কেউ অতি দ্রুত নৌকো চালিয়ে চলে যাচ্ছে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে খবরের কাগজটার দিকে তাকায়। আর তখনই ভয়ানক অক্ষরগুলো চোখে পড়ল তার। খবরের কাগজের মাথার কাছে কে যেন পেন্সিল দিয়ে কাশ্মীরি ভাষায় বড় বড় করে লিখে রেখেছে, 'আর পাঁচ দিন। তৈয়ার গেস্যু, টুন্ড দ শু ইয়েন ওয়ন।' অর্থাৎ, নিজের কাজের জন্য তৈরি থাকো, দিন আসছে।

এক মুহূর্তেই যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেল স্বরাজ। তার মানে আশেপাশে সত্যিই কেউ আছে। তার সন্দেহ ভুল নয়। লালার লোক তাকে চিনে নিয়েছে। এবং রীতিমতো নজরও রাখছে। রিমোটটা কি তবে তার কাছেই...?

সে হাতে কাগজটা নিয়েই দৌড়ে যায় বাইরের দিকে। যে-নৌকোটা এইমাত্রই জানালার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা নির্ঘাত এখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি।

কিন্তু বাইরে বেরিয়েই হতাশ হতে হল তাকে। শিশমহলের জলের বুকে তখন অনেক নৌকো ভাসছে। সবাই এখন নিজস্ব 'ধান্দা'র পথে বেরিয়ে পড়েছে। ট্যুরিস্ট সিজন বলে কথা! অফ সিজনে তো বেশির ভাগ মানুষই 'বে-রোজগার' হয়ে যায়। এখনকার এই আয় থেকে সঞ্চয় করা অর্থের উপরই তখন কোনওমতে খুঁটে-খুঁটে খেয়ে প্রাণধারণ করবে ওরা।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এতগুলো নৌকোর মধ্যে নির্দিষ্ট নৌকোটিকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। স্বরাজ হাল ছেড়ে দেয়।

"আরে কাটরা সাব যে।" গুলজার আহমেদের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফেরে তার। গুলজার আর ভরত বারান্দার কোণে বসেছিল। তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে দু'জনেই তার দিকে তাকিয়েছে। স্বরাজই উত্তেজনার চোটে লক্ষ করেনি।

"আরে, 'অখবার'! কখন দিয়ে গেল? তোমার পড়া হয়ে গেছে?" ভরত কৌতূহলী স্বরে বলে।

"হ্যাঁ।"

"দেখি।"

স্বরাজ সাবধানে উপরের সাদা অংশে লেখাটা ছিঁড়ে নেয়। তারপর এগিয়ে দেয় ভরতের দিকে। ভরত স্বরাজের কাণ্ড যেন দেখেও দেখল না। বরং গোগ্রাসে হেডলাইনগুলো দেখছে। গুলজার আহমেদ তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়, "তুমি কাশ্মীরি পড়তে পারো নাকি? কাটরাদের ছেলে আবার কাশ্মীরি কবে শিখল? তোমরা তো ভাই ছোটলোকদের ভাষা বলো না!"

তার কথায় খোঁচা স্পষ্ট। যদিও সে খুব একটা ভুল বলেনি। খুব সাদামাঠাভাবে বলতে গেলে, শুদ্ধ হিন্দি ভাষাটা এসেছে শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষা থেকে। ভাষাবংশের অন্যতম অভিজাত সদস্য। অন্য দিকে কাশ্মীরি ও পঞ্জাবি ভাষার জননী পৈশাচী প্রাকৃত। 'পৈশাচী' বা 'পিশাচভাষা' অনার্যদের ভাষা। জম্মুর কাটরারা রীতিমত নাক উঁচু ব্রাহ্মণ। তারা সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দি বলতেই অভ্যস্ত।

স্বরাজের বুক দুরুদুরু করে ওঠে, "আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শিখেছি।"

গুলজার আহমেদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে মাপছে। গুলজার তো ভরত শেরগিল নয় যে, কিছু বলার আগেই বিশ্বাস করে বসে থাকবে। স্বরাজের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলল, লোকটার থেকে দূরে থাকতে হবে।

"কেয়া বাত!" গুলজার মৃদু হাসল, "কাশ্মীরের উন্নতি হচ্ছে বলতে হবে। কাটরাদের অন্তত একটা ছেলে অসভ্য লোকদের ভাষা শিখেছে।"

অন্য দিকে ভরত খবরের কাগজে নাক ঠেকিয়ে বসে আছে। আপন মনেই হতাশ স্বরে বলে, "ওহ। রবজি। সোনার ভাও ফের বেড়ে গিয়েছে।"

গুলজার আহমেদ এবার স্বরাজকে ছেড়ে তার দিকে তাকায়, "তোরা কথায়-কথায় রবজিকে এত হাঁকাহাঁকি করিস কেন বল তো। সোনার দাম বাড়লে রবজি, চাওয়াল-আটার ভাও বাড়লেও রবজি। পেট গড়বড় করলে রবজি, ক্ষুধামন্দা হলেও রবজি। ছিঁক মারলেও রবজিকে ছাড়বি না তোরা। আরে, লোকটা একা আর কত মুশকিল আসান করবে।"

গুলজার হাসছে, "রবজি বল, আল্লা বল, ভগবান বল— সব বুড়ো হয়ে গেছে। কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তোর পরদাদা-পরদাদির মতো। তবে খামখা বুজুর্গ লোকটাকে এভাবে পরেশান করার মানে কী?"

স্বরাজ হাঁ করে গুলজার আহমেদের কথা শুনছে। বলে কী। মৌলবাদীরা ওর কথা শুনলে প্রথমেই ওকে 'কাফের' বলে তোপের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেবে। গুলজারের কথা শুনতে-শুনতে তার লালার কথা মনে পড়ে গেল। লালা কোনওদিন ঈশ্বরকে ডাকে না। তারও হয়তো এমনই কিছু যুক্তি আছে। এ কি তবে লালারই তথাকথিত 'ভাই'।

"দূর ছাই।" ভরত বিরক্ত হয়ে বলে, "আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর তোমার এখন মস্করি করার শখ হয়েছে।"

"তোর জ্বালা আবার কী? সোনা কি তুই খাবি? নিজের পেটের চিন্তা আগে কর। সোনার দাম বেড়েছে তো বেড়েছে। দাল চাওয়াল সবজির দাম বেড়েছে কিনা সেটা আগে দ্যাখ।"

ভরতের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "যসসির গয়না সব গড়াতে পারিনি ভাইজান। গুরপ্রীত নিজের গয়নাগুলো সব দিয়ে দিয়েছে। তবু মহরাজের ঘরের লোকের সব দাবি মেটেনি। তার ওপর কম্বুর চাকরিটাও গেল। কী করব বুঝতে পারছি না।"

"মানে!" গুলজার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, "তুই 'দহেজ' দিচ্ছিস?"

শীরবে মাথা নাড়ে ভরত। জানে অন্যায় করছে। কিন্তু উপায় কী? ছেলে বড় ঘরের। কাজকর্ম ভালই করে। দুটো ট্যুরিস্ট বাস আছে তার। সবচেয়ে বড় কথা, কাশ্মীরের মাটিতে ঘর। এমনকী, ঘরে ইলেকট্রিসিটিও আছে। যসসির কপাল ভাল। তার রূপ দেখেই পাত্রপক্ষ গলে গিয়েছিল। তবু কিছু 'শগুন' দিতে তো হয়। আসলে 'শগুন' নয়, 'শগুনের' নামে 'দহেজ'। যসসির 'খুশির' জন্য এটুকু কষ্ট করতে পারবে না ওরা?

"তুই খেপেছিস?" গুলজার স্তম্ভিত, "একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি সর্বস্বান্ত হবি? এর পর তো কটোরা নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে

AMARBOI.COM

তোকে ভাই। এই রিশতাটা নাকচ করতে পারলি না?"

"মান কি বাচিয়া কা দাঁত নহি দেখা যান্দা ভাইজান।"

ভিখারির স্বেচ্ছায় নির্বাচনের অধিকার নেই। ভরত কথাগুলো বলে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর চুপচাপ উঠে যায়। গুলজার ব্যথিত দৃষ্টিতে তার চলে যাওয়া দেখছে। পোড়াকপালে বাপ। এই সব পরিস্থিতিতে নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হয়। অসম্ভব দুর্বলও। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদটাও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

"আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাই না?" স্বরাজ আলতো স্বরে প্রশ্নটা করে।

গুলজার তখনও কী যেন ভেবে চলেছিল। অন্যমনস্ক স্বরে বলল, "উঁ?"

"আপনি খুদাকে বিশ্বাস করেন না মিয়াঁ?"

সে হাসল, "নাঃ, আমি না-খুদাকে বিশ্বাস করি।"

স্বরাজের কৌতূহল বাড়ছে। এর স্বভাবও প্রায় লালার মতোই। সে আরও এককদম এগিয়ে বলে, "আপনি বোধহয় মসজিদেও যান না। নমাজ পড়েন?"

"না রে ভাই," গুলজার আহমেদ হেসে ওঠে, "আমি ওসব কিছু করি না। নমাজ পড়ি না। রোজায় ভরপেট খাই। খুদা বহুত চালাক আদমি। ও ব্যাটা আমায় দেখলেই কাল্টি মারে। আমিও এড়িয়ে যাই। সে আমার দিকে দেখে না। আমিও তাই তালাক দিয়ে দিয়েছি। 'খুদা'র চেয়ে 'খুদি'র ওপর আমার ভরসা বেশি।" বলেই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলে, "খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা কে হর তকদির সে পহলে/ খুদা বন্দে সে খুদ পুছে 'বতা তেরি রজা ক্যায়া হ্যায়'— সমঝে?"

বলতে-বলতেই সে ফের হেসে ওঠে। হাসতে-হাসতেই উঠে দাঁড়ায়, "দাঁড়াও, তোমার দাঁতনের বন্দোবস্ত করি। দেখি নবাবজাদির দাঁত মাজা হল কিনা।"

শিশমহলে সবাই 'নবাবজাদি' বলতে একজনকেই বোঝে। আফসানার বাঙালি সতিন। বিলালের কলকাত্তিয়া বউ। এখানকার বেশির ভাগ মানুষই উনুনের ছাই বা তামাক দিয়ে দাঁত মাজে। শ্রীনগরকে 'টোব্যাকো ফ্রি' মডেল সিটি তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সরকার। এখন অবশ্য টোব্যাকো ফ্রি স্লোগানগুলো দেওয়ালে বা ব্যানারেই ফ্যাকাশে হয়ে লটকে আছে। শিশমহলে 'দন্তমঞ্জন' হিসাবে তামাকই জনপ্রিয়। একটা টুথপেস্টের দামই সত্তর-আশি টাকা। ওই আশি-টাকায় ওদের তিন দিনের বাজার হয়ে যায়। তার উপর একমাত্র গুলজার আর আফসানার পরিবার ছাড়া এ তল্লাটে বেশির ভাগ ঘরেরই সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম দশ থেকে বারো। ভরতের বাড়িতেই তো বুড়োবুড়ি সমেত বারোজন উপস্থিত। একটা পেস্টের টিউব পনেরো দিনও টিকবে না। মাসে ক'টা পেস্ট লাগবে কে জানে! তার চেয়ে বেঁচে থাক 'তম্বাকু'।

কিন্তু বিলালের দ্বিতীয় বউ তামাকের ধারেকাছেও যায়নি। তাই বিলালকে বাধ্য হয়েই পেস্ট রাখতে হয়। স্বরাজের দাঁত মাজার জন্য গুলজার আহমেদ তাই রোজই বিলালের বউয়ের পেস্ট আনতে দৌড়ায়। স্বরাজ মরমে মরে যায়। তাকে উঁচু জাতের হিন্দু ভেবে কী কাণ্ডই না করছে ওরা। ভরত ভীষণ অভাবী মানুষ। তবু স্বরাজের জন্য আলাদা থালা-বাটি-গ্লাস নিয়ে এসেছে। ওরা জানে কাটরার ব্রাহ্মণরা আমিষ ছোঁয় না। ওদের ব্যবহার করা থালা-বাটি দেওয়া চলবে না। সে জন্যই নতুন বাসন-কোসনের ব্যবস্থা। অন্যের ব্যবহার করা কম্বল, বালিশের ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না, তাই সবাই মিলে অল্প অল্প টাকা দিয়ে তার জন্য নতুন কম্বল, নতুন বালিশ আনিয়েছে। আফসানা নামের বউটি তার ফলানো আনাজ প্রায়ই দিয়ে যায়। কী অদ্ভুত আন্তরিকতা! মেনুতেও সামান্য অভিনবত্ব এসেছে। গুরপ্রীত চমৎকার মুলো, কপি কিংবা আলুর পরোটা বানায় শুধুমাত্র তারই জন্য। সবাইকে খাওয়াবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। তাই একা স্বরাজকেই স্পেশ্যাল মেনুগুলো দেওয়া হয়। কনু কাতর চোখে একবার-দু'বার দেখে চলে যায়। স্বরাজ ওকে বেশ কয়েকবার ডেকে ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কনু হাসতে-হাসতে মাথা নেড়ে পালিয়ে যায়। ওরা 'মেহমান নওয়াজি'তে একচুলও ত্রুটি রাখবে না।

স্বরাজের মাঝেমধ্যেই ইচ্ছে করে চিলচিৎকার করে বলে, "থামাও এসব। আমি কোনও কাটরা নই। তোমাদের মতো আমিও শাকসেদ্ধ ভাত খেয়ে বড় হয়েছি। তোমাদের মতো আমিও তামাক দিয়ে দাঁত মেজে এসেছি। আমার জন্য এত কষ্ট কোরো না তোমরা। থামাও তোমাদের এই অদ্ভুত অতিথি সৎকার।"

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই কথাগুলো বলতে পারেনি। কারণ তাহলেই তার পরিচয় ফাঁস করে দিতে হয়। অগত্যা রোজই বিবেকের তাড়নায় মরছে সে। মেহনতি গরিব মানুষগুলোর রক্ত জল করা টাকায় কেনা আতিথ্য বড় কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হতভাগারা জানেও না যে, একটা মিথ্যে মানুষকে যত্ন করে চলেছে। এই লোকটাই এর পরে ওদের কাছে 'আস্তিন কা সাপ' হয়ে দাঁড়াবে। যাকে আপাতত দুধ কলা দিয়ে পুষছে ওরা।

ভাবতেই চোখ কড়কড় করে ওঠে তার। লালা তাকে ঘৃণা করতে বলেছিল। কিন্তু ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ভালবেসে ফেলছে ওদের।

বারো

"সা-লে। জিহাদি।"

শ্রীনগরের ব্যস্ত রাস্তায় লেফটেন্যান্ট রাঠৌর দলবল নিয়ে এক পানওয়ালাকে বেদম মার মারছিল।

আশেপাশে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সমস্ত কাজকর্ম থামিয়ে গোটা শ্রীনগরই যেন ভেঙে পড়েছে এখানে। লোকটাকে কিন্তু বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না। শান্ত, নির্লিপ্ত মুখে ঘটনাটা দেখছে মাত্র। এগিয়ে গিয়েও লাভ নেই। কারণ বাধা দিতে গেলেই মার খাবে। আর্মি একবার খেপে গেলে কারওর তোয়াক্কা করে না। একজনকে মারছে। এর পর সবাইকে ধরেই পেটাবে।

কাপ্টেন দত্তা বিরক্ত হয়ে গোটা ঘটনাটা দেখছিলেন। আর্মির লোকজন পানের দোকানটা তছনছ করে ফেলেছে। মাটিতে গড়াচ্ছে মিনারেল ওয়াটারের বোতল, লজেন্স চুইংগাম ভরা বয়াম। পানপাতার গোছা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। দু'একজন সুযোগ বুঝে মাটিতে পড়া থাকা দামি সিগারেটের আস্ত প্যাকেট তুলে চম্পট দিল। লোকটার রক্তে আর খয়েরের রঙে লাল হয়ে গিয়েছে রাস্তা। অথচ আটকাবার কেউ নেই। আটকাতে চাইলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়।

"বল সা-লে। চুপিচুপি জিহাদের ইস্তাহার বিক্রি করছিলি। আর কী-কী করেছিস? রাতে দেওয়ালে জিহাদের বাণী তুই-ই লিখিস, তাই না? বল তোর বাপ কে। কোন দলের লোক তুই? এর পর তোদের কী প্ল্যান? নয়তো স্রেফ টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলব, মহারাণার কসম...।"

লোকটাকে মারতে-মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলেছে রাঠৌর। তবু পানওয়ালার মুখে একটা শব্দও নেই। ক্যাপ্টেন দত্তা অবাক হচ্ছিলেন। হ্যাঁ, জিহাদি এমনই হয় বটে। মরে যাবে তবু মুখ খুলবে না। তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ব্যাটা কিছু বলে না কেন। এ লোকটাকে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কাশ্মীরের জনসাধারণ আর্মিকে পছন্দ করে না ঠিকই, কিন্তু কিছু-কিছু মানুষ ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও চলে। এখানে যেমন জিহাদিদের লোক আছে, তেমনই আর্মির ইনফর্মাররাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তেমনই এক ইনফর্মার জানিয়েছিল যে, এই পানওয়ালাটি জিহাদিদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও থাকতে পারে। খবর আছে, এই পানওয়ালা জিহাদিদের ইস্তাহারের কাগজে পান মুড়ে চুপিচুপি বিক্রি করে। সেই সূত্র ধরেই কয়েক দিন ওর দোকানের দিকে নজর রাখছিল আর্মি। এবং আজ হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। ওর দোকান থেকে একগাদা 'জিহাদি' ইস্তাহার বা লিফলেট বেরিয়েছে যেগুলো রাঠৌরের মতো রগচটা লোকের রক্ত গরম করার জন্য যথেষ্ট।

রাঠৌরকে বাধা দেওয়াই যায়। অথচ এই মুহূর্তে লোকটার জবানবন্দি পাওয়াও জরুরি। জিহাদিদের অ্যাক্টিভিটি জানা দরকার।

অবশ্য একদম প্রথমেই ওকে রাঠৌরের হাতে তুলে দেননি তিনি। ক্যাপ্টেন দত্তা নিজেই ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। কিন্তু লোকটা তাঁর একটা কথারও জবাব দেয়নি। পাত্তাই দেয়নি। এমন ভাবে অগ্রাহ্য করল, যেন তাঁর কথা শুনতেই পাচ্ছে না। তখন রাঠৌর নিজেই এগিয়ে আসে, "স্যার, আমার হাতে ছেড়ে দিন। দু'মিনিটেই কথা বলিয়ে ছাড়ব। উংলি টেরি না করলে কিচ্ছু বলবে না।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কী যেন ভেবে রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। আদরের ভাষা না বুঝলে অত্যাচারেই কার্যসিদ্ধি করতে হয়। আর সে কাজে রাঠৌর সিদ্ধহস্ত। সুতরাং সেই মাফিকই 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' চলছিল।

"আব্বু!"

একটি সুন্দরী মেয়ে দৌড়ে এল। রক্তাক্ত মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ছেড়ে দিন আমার আব্বুকে। আব্বু কিছু করেনি। উসা নু মারা ন কিজো সাব। আব্বা নু মাসুম হৈ।"

"আব্বা মাসুম? তবে কে গুনাহ্‌গার?" লেফটেন্যান্ট রাঠৌরের মুখে একটা অশ্লীল হাসি, "তুই? হসিন জিহাদি। তবে তোর ট্রিটমেন্টও হাসিন হওয়া উচিত।"

ক্যাপ্টেন দত্তা এবার রেগে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "রাঠৌর!"

কণ্ঠের উষ্মা টের পেল লেফটেন্যান্ট। তার মুখও অপমানে লাল। এতক্ষণ ধরে যত রকমের মার জানা ছিল, সব ব্যবহার করে ফেলেছে। তবু শালা জিহাদি মুখে একটা শব্দও করেনি। জীবনে এমনভাবে ব্যর্থ কখনও হয়নি রাঠৌর। আর কি ধৈর্য থাকে? যদি মুখ খোলানোই না যায়, তবে ব্যাটাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার কী?

"বলবি না হ্যারামি? তবে এই নে!"

বেয়নেটটাকে বিদ্যুৎ গতিতে উঁচিয়ে ধরল রাঠৌর। পানওয়ালাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। মেয়েটা ভয়ার্ত চিৎকার করে বুড়ো বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। ক্যাপ্টেন হাঁ-হাঁ করে উঠতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই পিছন থেকে একটা প্রতিবাদী হাত খপ করে লেফটেন্যান্টের হাত চেপে ধরে। বিস্ময়ের ধাক্কায় রাঠৌর পিছনে ফিরল। এক মজবুত চেহারার কাঁচাপাকা চুলের লোক তার উদ্যত হাত ধরে ফেলেছে। আটকে বাধা দেয় এই বদজাত। এত বড় সাহস! ক্যাপ্টেন অন্তরে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। সর্বনাশ। একেই মা মনসা, তার উপর ধুনোর ধোঁয়া। এখন রাঠৌর বিধ্বংসী মেজাজে আছে। এই পরিস্থিতিতে ওর সঙ্গে পাল্লা নিতে যায় কোন স্পর্ধায়?

"কৌন সা-লা বে?"

লোকটা রাঠৌরের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন দত্তা ওকে চিনতে পারেন। এই লোকটাকেই সে দিন কনোয়ালজিতের বাবার সঙ্গে দেখেছিলেন। এই লোকটাই ব্যঙ্গ করছিল তাঁকে। আর ওর চোখদুটো...

"ইতনা জুররত তেরা। তেরি তো।"

রাঠৌরের গর্জনেও ভয় পেল না লোকটা। বরং শান্ত গলায় বলল, "হাথ জিন মে হো জুর্নু, কটতে নহিঁ তলওয়ার সে/ সর যো উঠ যাতে হ্যায়ঁ উয়ো ঝুকতে নহিঁ ললকার সে/ ঔর ভড়কেগা যো শোলা-সা হমারে দিল মেঁ হ্যায়..."

বিস্মিত হলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। রামপ্রসাদ বিসমিলের এই কবিতাটা বড় প্রিয় তাঁর। বাবা এই কবিতা প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। এই মন্ত্র জপতে-জপতেই বড় হয়েছেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, "সরফরোশি কি তমন্না অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়..."

লোকটা সূর্য পরা জ্বলন্ত চোখদুটো রাঠৌরের দিক থেকে ফিরিয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত করে শক্ত চোয়ালে পাদপূরণ করে দিল, "দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজুয়েঁ কাতিল মেঁ হ্যায়!"

অস্বস্তি অনুভব করেন ক্যাপ্টেন দত্তা। অদ্ভুত একটা 'কশিস' রয়েছে মানুষটার চোখে। দৃষ্টিতে আগুন থাকে ঠিকই, কিন্তু আগুনের পাশাপাশি অন্য কিছুও আছে। কী যেন খুঁজে চলেছে চোখদুটো।

প্রকাশ্যে, এতগুলো লোকের সামনে অপমানটা হজম হয়নি রাঠৌরের। প্রতিশোধস্পৃহায় রাইফেলের বাঁটটা ঘুরিয়ে লোকটার মাথায় মারল সে। বাকিরাও তেড়ে আসছিল। কিন্তু থেমে গেল ক্যাপ্টেন দত্তার গম্ভীর নির্দেশে, "স্ট-প!"

"হ্যারামি শায়রি করছে!" রাগে চিড়বিড় করতে করতে রাঠৌর বলে, "এবার স্রেফ মাথায় মেরেছি। এরপর ফলাটা তোর পিছনে ঠুসে দেব শালা, মহারাণা কি কসম। তখন বুঝবি 'দর্দ' কাকে বলে!"

লোকটা পড়ে গিয়েছিল। মাথা ফাটেনি। তবে কপালে কালশিটে পড়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ায়, "ক্যায়া মস্করি করতে হো সাব। দর্দ গুলজার আহমেদের জুতুয়া ভাই। অব তো দর্দ সহনেকি ইতনি আদত হো গয়ি/ অব জব দর্দ নহি মিলতা তো ডর লগতা হ্যায়।"

"তেরি তো!" রাঠৌর ফের তেড়ে যায়। ক্যাপ্টেন দত্তা জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "লেফটেন্যান্ট রাঠৌর! হ-স্ট! হল্ট আই সে।"

রাঠৌর থেমে গেলেও তার চোখে রক্ত জমেছে, হাত নিশপিশ করছে। গুলজার আহমেদের মুখ কিন্তু নিস্পৃহ। বরং মুখ টিপে মৃদু-মৃদু হাসছে। লোকটার দুষ্টু হাসিটাই পিত্তি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কপালের ফোলা জায়গাটা চুলে ঢেকে নিয়ে, জামাকাপড়ে লেগে যাওয়া ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বলে গুলজার, "খামোখাই কষ্ট করছেন সাব। আপনাদের পশুশ্রম দেখতে না পেরে উপকার করতেই এলাম। আর উপকারের এই 'সিলা'? ডাণ্ডার বাড়ি।"

মুখটাকে শক্ত করে জানতে চান ক্যাপ্টেন, "কী বলতে চাও?"

"এত মার খেয়েও যে ও বেচারা মুখ খুলছে না, তা জিহাদিদের 'চুন্নি' নয়। বেচারির মজবুরি।" সে ফের হাসল, "যে-লোকটাকে কথা বলানোর জন্য তখন থেকে খুন-পাসিনা এক করছেন, সে লোকটা জন্ম থেকেই বোবা-কালা। শিশমহলে থাকে। ওকে ভাল করেই চিনি। ওর দোকানে লিফলেটের খবর যে জানিয়েছে আপনাদের, সে এটা জানায়নি যে, লোকটা গুংগা-বেহরা? তাছাড়া এটাও আপনাদের জানানো উচিত ছিল যে, লেখা তো দূর, হতভাগা একবর্ণও পড়তে জানে না। বুঝবে কী করে কোন কাগজে মুড়ে পান দিচ্ছে? ওর কাছে তো সব কাগজই এক। কাগজ কেনার পয়সা নেই। তাই শিশমহলে সবার ঘর থেকে চেয়েচিন্তে যে কাগজ পায়, তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়।"

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। মেয়েটাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

হায় রে, এই নিরুপায় লোকটাকে এতক্ষণ ধরে জিহাদির চর ভেবে মেরে যাচ্ছিলেন তাঁরা! রাগে মুখ শক্ত হল ক্যাপ্টেনের। রাঠৌরের ইনফর্মারের ভুল খবর আর একটু হলেই নিরীহ লোকটার প্রাণ নিচ্ছিল। তবু ভিতরের মনান্তর বাইরে প্রকাশ করা ঠিক নয়। গুলজারের দিকে তাকালেন, "এতগুলো লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেউ এ কথাটা বলতে পারল না?"

গুলজার হা-হা করে হেসে ফেলে, "কার ঘাড়ে ক'টা মাথা সাব? আমি বলার চেষ্টা করলাম, তো আপনার পিয়াদা মেরে কপাল ফুলিয়ে দিল।"

লজ্জায়, মাথা হেঁট হয়ে আসতে চায় ক্যাপ্টেনের। তবু মুখে নির্লিপ্তি মাখিয়ে বললেন, "কেউ ঝুঁকি নিল না, তুমি নিলে কেন?"

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে ফিরে যাওয়ার পথ ধরে গুলজার। ক্যাপ্টেন দত্তা শুনলেন সে বিড়বিড় করে আবৃত্তি করছে, "ওয়ক্ত আনে দে, বতা দেঙ্গে তুঝে অ্যায় আসমাঁ/ হাম অভি সে কয়্যা বতায়েঁ, ক্যায়া হমারে দিল মেঁ হ্যায়...!"

কী অদ্ভুত সংযোগ। বিসমিলের কবিতাটা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খুব প্রিয়। বাবার কাছে শুনেছেন, ১৯২৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোরখপুর জেলে এই লাইনগুলো আবৃত্তি করতে-করতেই ফাঁসিকাঠে চড়েছিলেন বিসমিল। আশফাকুল্লাহ খান, চন্দ্রশেখর আজাদ, এমনকী,

BanglaBook.org

ভগৎ সিংহেরও অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই কবিতাই সঙ্গী ছিল। কার্গিলের যুদ্ধে শয়ে-শয়ে জওয়ান এই স্লোগান দিতে-দিতে শহিদ হয়েছিল। কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়লেই রক্ত গরম হয়ে যায় ক্যাপ্টেনের।

একটা আগুনে কবিতাই যেন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে একটাই পরিচয় দিয়েছিল। ওরা সবাই ভারতীয়। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, মৌলবাদী জিহাদিরাও এই কবিতাটা বলেই সঙ্গীসাথীদের রক্ত গরম করে থাকে।

"আই অ্যাম সরি স্যার।"

মেজর ভার্মার সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। আজকের ঘটনাটা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। এমনিতেই কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কলঙ্কের ইতিহাস কিছু কম নেই। মানুষ আর্মির দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ। আর একটু হলে তিনি নিজেও সেই ইতিহাসে রক্তাক্ষরে নিজের নাম লিখতে যাচ্ছিলেন।

"তুমি কী করবে ক্যাপ্টেন?" ভার্মা ধীরস্বরে জানান, "এটা তো হওয়ারই কথা। এমন অসংখ্য ঘটনা অতীতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। পরিস্থিতি এমনই যে, কারওর দিকেই আঙুল তোলা যায় না। এমনকী, রাঠৌরের দিকেও নয়! ওদিকে এল ও সি-তে আজ ভোর রাতে আবার আমাদের ছাউনিতে গ্রেনেড পড়েছে। একটু আগেই সুবাদার সিং হেড কোয়ার্টারে ফোন করেছিল। দু'জন মারা গিয়েছে। পাঁচজন ঘায়েল," তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বিড়বিড় করে বললেন, "আর এদিকে সকালেই আমার খাস ইনফর্মার জানিয়েছে, শিশমহলে এক সন্দেহজনক আজনবির আগমন হয়েছে। ব্যাপারটা সুবিধের নয়। ইমামসাহেব আসছেন। এর মধ্যে এমন লক্ষণ ভাল নয়।"

মেজর ভার্মার খাস ইনফর্মার কখনও ভুল খবর দেয় না। লোকটা কে কেউ জানে না, কিন্তু তার খবর আজ পর্যন্ত একবারও ভুল প্রমাণিত হয়নি। ক্যাপ্টেন দত্তার দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। ফের শিশমহল! সেদিন যে লোকটি দেওয়ালে, জানালায় জিহাদের স্লোগান লিখছিল, সেও সম্ভবত শিশমহলেরই লোক। কনোয়ালজিৎ শেরগিল ও গুলজার আহমেদ শিশমহলের। পানওয়ালাটাও শিশমহলেরই বাসিন্দা। সম্ভবত ওই লিফলেটও সে শিশমহল থেকেই পেয়েছে। সব ইশারাই শিশমহলের দিকে ইঙ্গিত করছে।

"মৃতদেহ আর ঘায়েল জওয়ানদের আনতে ফোর্স গিয়েছে। রি-ইনফোর্সমেন্ট দরকার।" মেজর ভার্মার কণ্ঠে হতাশা। "ইউ নো ক্যাপ্টেন, যত জন জওয়ান সীমান্তে মারা যায়, তারা আমার জীবন থেকে কিছুটা মুহূর্ত নিয়ে চলে যায়। বড় ক্লান্ত লাগে। বাইরের শত্রুকে তবু ঠেকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু যে ঘরশত্রু বিভীষণ বুকের উপর উঠে বসে আছে, তাকে কী করে ঠেকাব? মাঝে মাঝে আই ফিল সো হেল্পলেস।"

ক্যাপ্টেন কথা না বলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। সত্যিই মাঝেমধ্যে তাঁরও এমন হতাশ লাগে। যে-জঙ্গিগোষ্ঠী সীমান্তে বারবার হানা দিচ্ছে, তাদের চেনা যায়। তাদের সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ শত্রুদের সঙ্গে লড়বেন কীভাবে? তাদের তো চেনাই যায় না! স্থানীয় লোকের ভিড়ে, আপাত নিরীহ মুখের মধ্যে মিশে ওঁত পেতে বসে থাকে তারা। তাদের চেনার আগেই হয় একটা ওপেন শুটআউট হয়ে যায়, নয়তো বিস্ফোরণ! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আর্মির ওপর 'হল্লাবোল' করে তারা। তার সঙ্গে বলি হয় একদল নিরীহ মানুষ।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "ধর্মান্ধতার এফেক্ট স্যার।'

"নো... নো...।" মেজর মাথা নাড়লেন, "ধর্ম, মজহব— এসব ফালতু কথা। বর্ডারের ওদিকে যারা জঙ্গিগোষ্ঠীর মাথায় বসে আছে, সেই পাকা মাথাগুলো যে-দল তৈরি করে সেখানে ধর্মান্ধতা আছে নো ডাউট। কিন্তু বর্ডারের এপ্রান্তে, ভারতের মধ্যেই যে ছেলেগুলো অল্পবয়সেই ওদের আত্মঘাতী সেনার দলে নাম লেখায় তাদের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও ইসুই নয়। যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কোরান-এ-শরিফ তাকে দু'মুঠো ভাতও দিতে পারবে না। তাই ধার্মিক ব্রেনওয়াশটা ওদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয়। মেন প্রবলেম অন্য জায়গায়।"

"তবে? জিহাদ?"

"জিহাদ।" মেজর হেসে ফেললেন, "তুমি কি জানো 'জিহাদ' শব্দটার আসল মানে কী? 'জিহাদ'-এর কনসেপ্ট থেকে গাঁধীজি যে তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কনসেপ্ট পেয়েছিলেন তা জানো? জিহাদ মানে সত্য ও ঈশ্বরের পথে থেকে যুদ্ধ করা। Jihad is struggling or driving in the way or sake of ALLah! মেশিনগান বা গ্রেনেড দিয়ে মানুষ খুন করাকে জিহাদ বলে না। ওরা নিজেদের অবশ্য জিহাদিই ভাবে, আর আমরাও ওদের 'জিহাদি' বলে সম্মান দিচ্ছি। আসলে ওরা কতগুলো রক্তপিপাসু আতঙ্কবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"তবে?"

মেজর ভার্মা মৃদু হাসেন, "মেন প্রবলেম কতগুলো লোকের ক্ষমতার লোভ ও পভার্টি। কতগুলো দুঃস্থ বুভুক্ষু মানুষের নাকের সামনে টাকার বান্ডিল নাড়ালে তারা প্রাণও দিতে রাজি হয়ে যায়। আত্মঘাতী 'জিহাদিরা' না আল্লাহর জন্য লড়ে, না প্রতিবাদ করতে। ওরা লড়ে যায় দু'মুঠো খাবারের জন্য। আস্তে আস্তে নিজেই সব বুঝে যাবে," তিনি একটু সচকিত হয়ে ওঠেন, "তবে যে-কথাটা বললাম মাথায় রেখো। শিশমহলের দিকে নজর রাখা দরকার। শিশমহলটা সব উদ্বাস্তু, না খেতে পাওয়া লোকের জায়গা। যারা দরিদ্র তারাই ভালনারেবল। ওদিক থেকে কোনও আক্রমণ এলে খুব আশ্চর্য হব না।"

ক্যাপ্টেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর তরুণ মুখে রাগ ও দুঃখের ছাপ একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। আর কত দিন চলবে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ? আর কত দিন তাজা রক্ত ছড়িয়ে পড়বে সাদা বরফের বুকে? এ তো সম্পূর্ণ একতরফা লড়াই। ভারত এমনই একটা রাষ্ট্র, যে স্বাধীনতার পর কোনওদিন নিজে থেকে অন্যের সীমানা কবজা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ নিজে থেকেই ভারতের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। ইচ্ছে করলে ভারতীয় সরকার সেই সুযোগের অপব্যবহার করে বাংলাদেশ দখল করে নিতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভাগ্যরাও বিপদে পড়েই ভারতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাবার মুখে সে ইতিহাস শুনেছেন ক্যাপ্টেন দত্তা।

পাকিস্তান কী? পাকিস্তান কে? পাকিস্তান নামের কোনও দেশই ছিল না। একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রনায়কের মহাত্মার মতোই 'জাতির জনক' হওয়ার শখ হয়েছিল। তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনিও সমান শরিক ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা পেলেন না। সেই সুযোগের অপব্যবহার করে ক্রমাগত তীব্র হয়ে ওঠা বিদ্রোহী ভারতীয়দের শেষ কামড় দিতে চেয়েছিল কতগুলো সাদা চামড়ার লোক। সোজা সাপটা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি। কথা নেই, বার্তা নেই, ফটাফট কয়েকটা লাইন এঁকে দিল উজবুকগুলো। প্রতিহিংসাপ্রবণ রাজনীতি। স্বাধীনতা চাই? নে, দিলাম ভাগ করে। এবার তোরা নিজেরা মারপিট করে মর। তৈরি হল 'পাকিস্তান' নামের ইসলাম ধর্মাবলম্বীর আলাদা দেশ। উক্ত দেশনায়ক নিজের দেশ পেলেন। রইল শুধু হিন্দু আর মুসলিম!

ক্যাপ্টেনের আজও মনে পড়ে বাবার সেই কথাগুলো। তখন তিনি সদ্য আর্মিতে জয়েন করেছিলেন। প্রথম পোস্টিংই লাদাখে। মা ভয় পেয়েছিলেন। বাবা পাননি। মুচকি-মুচকি হেসে গল্পচ্ছলেই বলেছিলেন কাশ্মীর সমস্যার কথা।

"কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ডোগরার ছিল উভয় সংকট। জন্মু হিন্দু রাজ্য হলেও কাশ্মীর তখন মুসলিম প্রধান। হিসেবমতো তার পাকিস্তানে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার শাসক গোষ্ঠী আবার হিন্দু। পাকিস্তানে গেলে রাজার বোল-বোলাও থাকবে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই দেরি করছিলেন। আসলে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য দেখতে চেয়েছিলেন। ভারত হয়তো কাশ্মীরকে স্বায়ত্তশাসন দিয়েও দিত। কিন্তু তার আগেই বিপদ। পাকিস্তানিরা দখল করে নিল 'বারামুল্লা' সেক্টর। এবং দেখতে দেখতে শ্রীনগর দখল করে নিল।" বাবা জোড়া পোচের প্লেটটা টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "বেচারা হরি সিং-এর তখন একটাই উপায় ছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে সাহায্য চাওয়া। এবং তিনি সেটাই করলেন।

পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য যোগ দিলেন ভারতের সঙ্গে। ইন্ডিয়ান আর্মি নেমে মেরে-কেটে পাকিস্তানি জঙ্গিদের শেষ করল। ব্যস তখন থেকেই মারপিট শুরু। পাকিস্তান দাবি করে কাশ্মীর তাদের, ভারতীয় সেনারা সেটা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। ভারত দাবি করে, কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং পাকিস্তান অন্যায় ভাবে অধিকার ফলাচ্ছে।"

"আর কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ? তারা কি পাকিস্তানের পক্ষে?"

বাবা ন্যাপকিনে মুখ মুছে হেসে উঠলেন, "ওরা কোনও দলেই নেই। ওরা নিজেদের পাকিস্তানিও বলে না, ভারতীয়ও বলে না। বরং 'কাশ্মীরি' বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওরা নিজেদের মতো থাকতে চায়। দেখবে ওখানকার লোকেরা কখনওই বলবে না, 'আই অ্যাম পাকিস্তানী' অর 'আই অ্যাম ইন্ডিয়ান'। বলবে 'আই অ্যাম কাশ্মীরি'।"

বাবা ঠিকই বলেছিলেন। এই ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন দত্তা নিজের চোখে স্বয়ং দেখেছেন। মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, ওরা যদি শুধু কাশ্মীরিই হবে তবে ভারত খামোখা ওদের রক্ষা করছে কেন? একেই প্রতি বছর রাজকোষের অর্থের অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ খরচ হয় কাশ্মীরের পেছনে। প্রায় ষোলো লক্ষ জওয়ান ওখানে পুষে রেখেছে ভারত। কাশ্মীরের গোটা বাজেটের ৭৫ শতাংশ খেয়ে নেয় আর্মি। তখন অবুঝের মতো বাবাকে বলেছিলেন, "ওরা তবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কেন? স্বাধীন হয়ে গেলেই তো পারে। ভারত সরকারই বা কাশ্মীরকে নিজের দখলে রাখার জন্য লড়ে যাচ্ছে কেন? কাশ্মীরে আছেটা কি?"

"কিচ্ছু নেই।" বাবার সহাস্য জবাব, "কাশ্মীর আদতে একটি মাকাল ফল। ওখানে ধান, গম চাষ হয় না। আপেল, জাফরান, ড্রাই ফ্রুটস আরও যা যা চাষ হয়, তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও হয়। ট্যুরিজম ছাড়া আর কোনও বড় শিল্পও গড়ে ওঠেনি। ওই পরিবেশে গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। ওখানে শুধু সৌন্দর্য আছে। তার জন্য স্বাধীন দেশ হওয়া আটকাত না। লোকে যেমন পয়সা দিয়ে সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখছে, তেমনই স্বাধীন কাশ্মীরেও না হয় যেত।"

"তবে কি ভারত সরকার স্রেফ হাতি পুষছে?"

"পুষছে।"

"এমনি এমনি?"

বাবা ছেলের মাথায় আলতো করে গাঁট্টা মেরে বললেন, "সবই আমি বলব? নিজে গিয়ে দেখে নাও। তোমার সুবিধা যে তোমার বাপ আর্মিতে ছিল। অনেক বর্ডার ঘুরেছে। অনেক যুদ্ধ দেখেছে। লেফটেন্যান্ট দত্তা হয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিল খেমকরণ থেকে। শেষ করেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল দত্তা হয়ে। অনেক লড়াই লড়ে, অনেক পাঁপড় বেলে চুল পাকিয়েছি। এবার তোমার পালা বরখুর্দার। যতটা জ্ঞান দেওয়ার দিয়ে দিলাম, এখন নিজে চরে খাও। এনি ডাউট লেফটেন্যান্ট দত্তা?"

"নো-ও-ও স্যার।" স্যালুট ঠুকে হাসিমুখে জানিয়েছিলেন তিনি।

"লেফটেন্যান্ট," বাবা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, "মেক মি প্রাউড।"

বাবার কাছে যতটা শুনেছিলেন, লাদাখে পোস্টিং হওয়ার পর নিজেই বুঝেছিলেন আরও অনেক বেশি। বুঝেছিলেন, কাশ্মীরিরা কখনই স্বাধীন হতে পারবে না। ভারত ছেড়ে দিলেই পাকিস্তান কবজা করবে ওদের। ওরা নিজেরাই সেটা চায় না। আবার ভারতও ওদের কখনওই ছাড়তে পারবে না। কারণটা অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক। ভারতে প্রবেশের পথে তিনটে ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী দেশের সামনে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে কাশ্মীর। পাকিস্তান, চিন ও রাশিয়া। এখনই শত্রু কখনও লাদাখে, কখনও কার্গিলে, কখনও বা সিয়াচেনে ঢুকে পড়ে দখল নিতে চাইছে। এত পাহারাদারির মধ্যেও প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার জমি খেয়ে বসে আছে চিন। কাশ্মীরের দুরূহ বাধা সরে গেলে অনেক সহজে বিদেশি শক্তি ভারতীয় এলাকায় চলে আসতে পারে। এমন ঝুঁকি কি ভারত সরকার নিতে পারে?

ফলে যতই এল ও সি-তে বছরে কয়েকশো জওয়ান জিহাদি গোষ্ঠীর হাতে মারা যাক, সেনাছাউনিতে গ্রেনেড, শেল পড়ুক সেই মৃত্যু উপত্যকাকে আঁকড়ে থাকতেই হবে। ইতিহাস বলবে ভারত বনাম পাক যুদ্ধের সংখ্যা মাত্র তিনটে। ১৯৪৭-এ একবার, ১৯৬৫-এর যুদ্ধ ও ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ। কিন্তু কেউ জানে না তখন থেকে আজ পর্যন্ত, প্রতি বছর, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, ২৪ ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত এক অঘোষিত লড়াই লড়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মি। ওদের নীরব লড়াইয়ের কথা কেউ জানে না। লড়বে, মরবে, একের পর এক শহিদ হয়ে যাবে। লড়তে লড়তে ক্রমাগতই তিরিক্ষি হয়ে উঠবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না। প্রতিশোধস্পৃহাটা কারওর ওপর ঝাড়তে তো হবে। তৈরি হবে রাঠৌরের মতো নির্মম সেনা! তার ফল ভোগ করবে কাশ্মীরের জনসাধারণ। এটাই কাশ্মীরিদের ভবিতব্য। কখনও জিহাদিদের জ্বালায়, কখনও আর্মির নিষ্ঠুরতায় তারা নিষ্পেষিত হতেই থাকবে। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ অবধি শুধুমাত্র জিহাদি সন্দেহে মারা গিয়েছে সাড়ে সাতশোর ওপরে সাধারণ মানুষ। কত মেয়ে রেপড হয়েছে হিসেব নেই।

আকাশের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন দত্তা। শিশমহলের বুকে ঘনিয়ে আসছে ষড়যন্ত্রের মেঘ। তাঁর চোয়াল নিজের অজান্তেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে...

'হ্যায় লিয়ে হাথিয়ার দুশমন তাক মেঁ বৈঠা উধর,
ঔর হাম তৈয়ার হ্যায়, সিনা লিয়ে অপনা ইধর।
খুন সে খেলেঙ্গে হোলি, গর বতন মুশকিল মেঁ হ্যায়।
সরফরোশি কি তমন্না অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়,
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজুয়েঁ কাতিল মেঁ হ্যায়।'

তেরো

.COM

দ্বিতীয় হুমকিটা আসতে খুব দেরি হল না।

প্রথম ধাক্কাটা তখনও হজম করে উঠতে পারেনি স্বরাজ। সর্বক্ষণ মৃত্যুর আশঙ্কায় সিঁটিয়ে বসে আছে। তার ওপর মাঝেমধ্যেই মনে হয় পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। বলাই বাহুল্য, যন্ত্রণাটা কাল্পনিক। তবু সেই ব্যথাতেই কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে থাকে। রিমোটটা কোথায় আছে তার কোনও ধারণাই নেই। প্রথম মেসেজটা পেয়ে মনে হয়েছিল, হয়তো লালার খবরির কাছেই নিরাপদে আছে জিনিসটা। একটু স্বস্তিও পেয়েছিল। কিন্তু আজ খবরের কাগজটার মাথার উপরের লেখাগুলো পড়েই তার মাথা গুলিয়ে গেল। ফের কাশ্মীরি ভাষা। সেই একই টোন, সেই একই হুমকি।

'চার দিন। ফোন থেইঙ্গে ডারনিশ। মগর ইয়েন ন কওছে ওয়ানাখ। ন তো লায়েব।' অর্থাৎ, মোবাইল ফোনটা জানালার পাশে রেখে দিও। কাউকে বললে, মুখ খুললে শেষ করে দেব।

লালার লোক মোবাইলটা চাইছে। তার মানে লোকটা যেই হোক, তার কাছেও রিমোটটা নেই। তবে গেল কোথায়? ফের পাগল-পাগল দশা হল তার। আগের ভয়টা ফিরে এল। রিমোটটা যদি শিশমহলে থাকে, এবং অন্য কারওর হাতে পড়ে, সেক্ষেত্রে যখন-তখন বিস্ফোরণ হতে পারে। অনিশ্চিত এবং আকস্মিক মৃত্যু। আর যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিশ্চিত মরণ। লালার লোকের হাতে রিমোট থাকলে সে আর কয়েক দিন পর মরত। কিন্তু যদি জিনিসটা ওদের হাতে তুলে না দিতে পারে স্বরাজ, তবে লালার ইনফর্মার ধরে নেবে অ্যাক্সিডেন্টের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সে বেইমানি করছে। একটা আস্ত মানব বোমা যদি বেইমানি করে, প্রাণের খাতিরে ভারতীয় আর্মির কাছে চলে যায়, তবে লালার সব গল্প শেষ। এতখানি ঝুঁকি কি সে আদৌ নেবে? যে-লোকটা পহেলগাঁও-এ বসে শ্রীনগরে স্বরাজের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ জানতে পারছে, তার পক্ষে স্বরাজকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া আর কতটুকুই বা কঠিন? আর তারপর প্রতিশোধস্পৃহায় তার বাপ-মা-বোনকেও...

স্বরাজ বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায়। না, দেরি করা চলবে না। সব ঘটনার রাস্তাই শেষ হচ্ছে তার মৃত্যুতেই। বাঁচার পথই নেই। কিন্তু পরিবারের প্রাণ বাঁচানোর উপায় আছে। তাই জিনিসটা খুঁজে বের করতেই হবে। প্রমাণ করতেই হবে, সে বেইমান নয়। সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে এবার খোঁজাখুঁজি করা দরকার। কিন্তু কোথায় থাকতে পারে? কোথায়?... কোথায়?... সে প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করে। ভরত শেরগিলের কাছে? বলা যায় না। হয়তো খেলনা ভেবে নিয়ে নিতে পারে। হয়তো কন্নুর জন্য মোবাইলটা রেখে দিয়েছে। কন্নু যদি ওই মোবাইলটা নিয়ে খেলতে যায়...

সম্ভাবনাটা মাথায় আসতেই রক্ত হিম হয়ে যায় তার। কন্নু যদি খেলতে খেলতেই টিপে দেয় লাল বোতামটা, তবে? অবুঝ, নির্বোধ শিশুটার আঙুলের এক চাপে ওদের ঘর-বাড়িসুদ্ধ সব কিছু উড়ে যাবে। মৃত্যু তো স্বরাজের ভবিতব্যই ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই মরতে ভয় করছে তার। আত্মহত্যা করার সময় যেমন মানুষ ঈপ্সিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও আচমকা শেষ মুহূর্তে বাঁচার জন্য আকুপাকু করে, তেমনই অস্থিরতা তার মানে। সে ভাব বোঝানো যায় না, বলা যায় না।

"আ-রে।" সেই বুড়ো আবার তাকে খোঁচা মারে, "জিখে হৈ মারো গিফট। মৈনু মেরে দাতা দে।"

স্বরাজ তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চুপচাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। সে জানে উপরের ঘরে এই মুহূর্তে ভরত আর গুরপ্রীত রয়েছে। ভরত একটু পরেই বেরিয়ে যাবে কাজে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই স্বরাজ শুনতে পেল গুরপ্রীতের মিষ্টি সুরেলা গলার গুনগুন। সে কাশ্মীরি ভাষায় গান গাইছে,

'ইয়েম জার ভনাহস বর্দার
কর্সনা সু ইয়ার বোজে।
ইয়া তুই খঞ্জর তা মারে
ন ত সনি সশভা রোজে...'

এই পরিস্থিতিতেও না হেসে পারল না স্বরাজ। গুরপ্রীতের বড় মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা। অথচ কী রোম্যান্টিক গান গাইছে দেখো। 'প্রিয়তম, তোমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কাতর প্রার্থনা শোনো। এমন অবহেলার চেয়ে ভাল, তুমি আমার বুকে ছুরিই বসিয়ে দাও'... ইত্যাদি ইত্যাদি। নিচে একজোড়া বুড়ো-বুড়ি প্রেম করে চলেছে। আর ওপরে দুই ছেলেমেয়ের বাপ-মা। প্রেম কি ওদের বংশগত রোগ? ভরত-গুরপ্রীতের পূর্বপুরুষরা তা মন্দ কী? আরও কয়েকটা সিঁড়ি টপকে উঠে যেতেই ভিতরের দৃশ্যটা চোখে পড়ে। ভরত বেচারি মনের ভুলে লুঙ্গির উপরেই ট্রাউজার পরে এখন হিমশিম খাচ্ছে। অনেক টানা হেঁচড়া করেও এখন লুঙ্গিটাকে বের করে আনতে পারছে না। গুরপ্রীত ঠারে ঠারে সে দিকেই দেখছে, আর মৃদু মৃদু হেসে সেলাই করতে করতে গান গাইছে। বলাই বাহুল্য, ভরতের দুর্ভোগ বেশ উপভোগ করছে সে।

কাশ্মীরে লুঙ্গি পরে বাড়ির বাইরে বেরনো নিষেধ। যদিও বাড়িতে ভরতের এটাই 'ন্যাশনাল ড্রেস', তবু ভুলেও সে লুঙ্গি পরে রাস্তায় বেরোয় না। কাশ্মীরিদের চোখে এটা অভব্য পোশাক। সত্যি কথা বলতে কী, জম্মু-কাশ্মীরের লোকসংস্কৃতিতে লুঙ্গি নামক পরিধানটি কখনওই ছিল না। হিন্দু, মুসলিম কেউই পরে না। যারা পঞ্জাব বা বিহার থেকে চলে এসেছে, একমাত্র তাদের মধ্যেই এই পোশাকটি বেশি জনপ্রিয়। তবে গোটা কাশ্মীর তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেললেও রাস্তাঘাটে কিন্তু একজন লুঙ্গি পরা মানুষকেও দেখা যাবে না। এই পোশাক অশ্লীল।

"ওয়ে গুরপ্রীতো।" ভরত বিরক্ত হয়ে হাঁক পাড়ে, "মেরি মদদা করা। আগে সাহায্য কর, গান পরে গাইবি।"

গুরপ্রীত খিলখিল করে হেসে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ লুঙ্গির উলটোদিকের প্রান্ত ধরে এক মোক্ষম টান। সে টানে লুঙ্গি তো বেরোলই, ভরতও কোনওমতে উলটে পড়তে-পড়তে সামলে নেয়।

"আয়-হায়। তেরি মা কৌনসি চক্কি দা আটা খিলায়ি থি মেরে শেরনি।" সে বউয়ের গাল টিপে দিয়েছে, "খোড়া দস্যো তো মৈনু।"

"দস্যু ক্যায়া?" গুরপ্রীত দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

"হুমমম্।"

গুরপ্রীত কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই চোখ চলে গেল বাইরের দিকে। স্বরাজ তখনও বুঝতে পারেনি তার ঘরে ঢোকা উচিত কিনা। ওখানে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করছিল। গুরপ্রীত দেখে ফেলেছে তাকে।

"দেবরজি।" আধহাত জিভ কেটে সে মাথায় ওড়না টেনে দেয়। ভরতও তাকে লক্ষ করে হাসল। এগিয়ে এসে আন্তরিকভাবে বলল, "তোমার কপাল ভাল, আজ সকালেই তাজা 'মুলি' আর 'গোবি' পেয়ে গিয়েছি। একদম ফ্রেশ। বড়িয়া পরাঠা হবে।"

বিবেকের কামড়টা তীব্রভাবে অনুভব করল সে। এ কেমন শাস্তি ঈশ্বর? কখনও বোমার ভয়ে, কখনও বিবেকের তাড়নায়, কখনও লালার ভয়ে, কখনও সরল মানুষগুলোকে ঠকানোর দায়ে প্রতি মুহূর্তে মরছে সে। ওদের বিশ্বাস করতে ভীষণ ইচ্ছে করে। অথচ উপায় নেই। কারণ এই নিরীহ, খেটে খাওয়া পবিত্র মানুষগুলোর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে গর্দভচর্মাবৃত সিংহ! এত বছরের জীবনে কখনও এমন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যায়নি সে। পহেলগাঁও ছেড়ে যখন এসেছিল, তখন জানত মরতে হবে। কিন্তু এ কেমন মৃত্যু, যা রোজ নানা দিক থেকে চাবুক মারতে-মারতে বাঁচিয়ে রেখেছে!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভরত অবাক হয়। জিজ্ঞাসা করে, "কিছু বলতে এসেছিলে ভাই?"

"জি," স্বরাজ কিছুক্ষণের জন্য অন্য চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। এবার নিজেকে সামলে নিয়ে, সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে বলে, "ভ্রাজি, আপনি কি আমার ব্যাগ থেকে কিছু নিয়েছেন?"

ভরত যেন আকস্মিকভাবে কুঁকড়ে গেল। একটু কেঁপেও উঠল যেন। স্বরাজের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "না... না। কিছু না।"

সে ভরতের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে যায়। হল কী লোকটার! ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মিথ্যে কথা বলছে। স্বরাজের মনে আবার অবিশ্বাসটা ঘাঁই মেরে উঠল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভরতকে দেখে নেয়।

"কিউ দেবরজি?" গুরপ্রীত এগিয়ে আসে, "কিছু গুম হয়েছে? খুঁজে পাচ্ছ না?"

"হাঁ ভাবিজি," সে ভরতকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বলল, "আমার ব্যাগে একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন ছিল।"

"খিলোনা ফোন?" গুরপ্রীত জিজ্ঞাসা করে, "ছোট্ট খেলনার মতো ফোন কি? লাল রঙের?"

স্বরাজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গুরপ্রীত তবে দেখেছে জিনিসটা। তার মানে ভরতের কাছেই আছে। তার কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা, "হ্যাঁ ভাবিজি, তুমি দেখেছ?"

"তোমার ভ্রাজি অ্যান্নিভের্সেরির দিন বুকপকেটে করে এনেছিল।" সে অপ্রস্তুত মুখে জানায়, "আমার হাতে দিয়েছিল তোমাকে দেওয়ার জন্য। তারপর কোথায় রাখলাম..."

"কোথায় রেখেছিলে?" রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল স্বরাজ। উত্তেজনায় তার পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপছে। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসেছে।

"মনে নেই গো।" গুরপ্রীত অপরাধীর মতো বলল, "রেখেছিলাম কোথায় যেন।"

"কোথায়?... কোথায়?" তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। গুরপ্রীত জানে না কী মারাত্মক জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। ওই জিনিসটার চেয়ে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

ভরত এতক্ষণ রীতিমত ঘামছিল। হাত দিয়ে মুখ মুছে বলল, "ওই দু'পয়সার খেলনা মোবাইল দিয়ে কী করবে ভাই? গুরপ্রীত হারিয়ে ফেলেছে হয়তো। মার্কেটে ওরকম অনেক মোবাইল পাওয়া যায়। আমি তোমায় অমন একটা এনে দেব না হয়।"

স্বরাজ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলা যাবে না। ওদের

AMARBOI.COM

বোঝানো যাবে না যে, ওই খেলনার মতো দেখতে জিনিসটা আদতে কী ছিল। ওই জিনিস যে বাজারে পাওয়া যায় না তাই বা কে বোঝাবে। তাছাড়া ভরত শেরগিল এমন ঘামছেই বা কেন? ভয় পেয়েছে? কিসের ভয়?

সে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ নিচে নেমে যায়। এভাবে হবে না। তাকে নিজেকেই খুঁজতে হবে। চাল্লা চাল্লা ছান মারতে হবে। আর একটু পরেই ভরত বেরিয়ে যাবে। তারপর গুরপ্রীত বেরোবে। ঘরে থাকবে শুধু কন্নু। তখন দেখা যাবে...

তার গমনপথের দিকে ত্রস্ত চোখে তাকিয়েছিল ভরত। সে চলে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দেওয়াল থেকে গুরুনানক শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ব্যথিত, হৃদয় নিংড়ানো কণ্ঠস্বরে বলল, "ওয়াহেগুরু।"

একটা অপরাধ করেছে সে। বড় 'গুনাহ্'। ছেলেটা যখন অজ্ঞান হয়েছিল, তখন ওর ব্যাগে টাকার বান্ডিল দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। কিছু টাকা সবার অজান্তেই বের করে নিয়েছে। এবং তারপর থেকেই আত্মদাহে জ্বলছে সে। ওয়াহেগুরুর প্রতি অন্তরের সেই অপরাধের জ্বালা নিবেদন করল সে। 'ওয়াহেগুরু' ক্ষমা করলেন কিনা কে জানে! তবে তাঁর ক্ষমাসুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে বড় কান্না পেয়ে গেল ভরতের।

একটু পরেই স্বরাজকে সকালের 'নাশতা' দিয়ে গুরপ্রীতও বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে মৃদু হেসে বলল, "আমি দুপুরের আগেই ফিরে আসব। কন্নুকে বলে দিয়েছি। ও তোমাকে বিরক্ত করবে না।"

নাশতা যথারীতি এলাহি। গোবির পরাঠা, ডাল, আলুর তরকারি আর একটু আচার। শিশমহলে আসা ইস্তক শিশমহলের সমস্ত অধিবাসী যা পারছে, কলাটা, মুলোটা দিয়ে চলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে-মানুষটির আসল 'মেহমান' হওয়ার কথা তাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। গুলজার আহমেদ ও ভরত খোঁজার ত্রুটি রাখেনি। তবু যার অতিথি হওয়ার কথা ছিল স্বরাজের, তাকে পাওয়া গেল না। স্বরাজের ধারণা, সম্ভবত আর পাওয়াও যাবে না। স্বরাজ হয়তো নিজেই এসে পড়েছে সেই অজ্ঞাতপরিচয় আমন্ত্রণকারীর আওতায়। এখন সে আর মুখ খুলছে না।

সে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। গুরপ্রীত কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। তার নৌকোটা ছপছপ শব্দ তুলে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে।

এক বুড়ো জুলজুল করে তাকিয়েছিল তার নাশতার থালার দিকে। সম্ভবত গোবির পরাঠার দিকে নজর পড়েছে। ঠোঁটটা একটু চেটে নিয়ে বলল, "কী খা রিয়া হৈ? মৈনু দিখা না!"

কাতর প্রার্থনায় বুক কেঁপে গেল। স্বরাজ তাকিয়ে দেখল সব বুড়োবুড়ির চোখে একই মিনতি। তারাও পরোটা চায়।

"নাও দাদাজি।"

সে পরোটার থালাটা এগিয়ে দেয়। বুড়ো খুব সাবধানে একটা পরোটা তুলে নিয়েছে। ভঙ্গিটা এমন, যেন খুব দামি কিছু নিচ্ছে। বেশি জোরে ধরলে ভেঙে যেতে পারে। সে দু'হাতে খাদ্যবস্তুটিকে তুলে ঘ্রাণ নিল। স্বরাজ হতবাক। লোকটা খাচ্ছে না। স্রেফ গন্ধ শুঁকছে, আর চোখের সামনে নিয়ে বারবার দেখছে। পরোটার মসৃণ গায়ে হাত বোলাচ্ছে। যেন ওটা গুপ্তধন। আটার তৈরি পরোটা নয়, সোনার আশরফি। গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতেই চোখ চকচক করে উঠছে তার। এরপর একে-একে প্রত্যেকেই পরোটাকে শুঁকে, নেড়েচেড়ে দেখল। অদ্ভুত স্বর্গীয় সুখ তাদের মুখে। ফোকলা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখগুলোর দিকে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে তাকিয়েছিল স্বরাজ। তার হাতের ছিঁড়ে নেওয়া পরোটার অংশ হাতেই রয়ে গিয়েছে। গলা দিয়ে আর নামছে না। এই মানুষগুলোর সুখ কত অল্পেই। হিরে মানিক নয়, সামান্য একটা পরোটা। তাতেই এত স্বর্গসুখ।

সবার হাত ঘুরতে ঘুরতেই পরোটাটা ফের এসে পড়ল স্বরাজেরই প্লেটে। সে অবাক, "তোমরা খাবে না দাদাজি?"

এক বৃদ্ধের সহাস্য জবাব, "পুত্তর, সানু সাড্ডা মহিমান কটোরে দি খানা ন করাদে। অতিথির খাবার আমরা খেলে অতিথি খাবে কী? আমরা গরিব, তা বলে মান-ইজ্জত নেই?"

সব ভুলে গেলেও মান-সম্মান জ্ঞান এখনও টনটনে। স্বরাজ চুপ করে যায়। সে জানে এর পর কোনও কথা বলা চলে না। অতিথির জন্য ওরা খুঁদকুঁড়োটুকুও নিঃশেষ করে দিতে পারে। কিন্তু ভাগ চাইতে পারে না। কন্নুকে অনেক চেষ্টা করেও খাওয়ানো যায়নি, বুড়োবুড়ির দলকেও খাওয়ানো যাবে না। সাজিয়ে দেওয়া খাবার মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে উঠল। তবু খেতে হবে। অনেক কষ্টে সাজিয়ে দেওয়া এই খাবার ফেলে দেওয়া মানে অন্নের অপমান। আতিথ্যের অপমান।

স্বরাজ অতিকষ্টে খাবার খেল। বলা ভাল গিলল। তারপর এঁটো বাসনটা নিয়ে চলে যায় বারান্দার দিকে। শিশমহলের জলেই ধুয়ে নেবে। তারপর ভরতের ঘরটা ভাল করে খুঁজতে হবে। গুরপ্রীত ফিরে আসার আগেই সন্ধানপর্ব শেষ করতে হবে তাকে।

কন্নু তখন চুপ করে বারান্দায় বসেছিল। স্বরাজকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বিমর্ষ চোখদুটো তুলে তাকায় সে। সে-রাতের পর থেকেই অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। সর্বক্ষণ আপনমনে কী যেন ভাবে। কখনও বারান্দায় বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা স্কুলের বই খাতাগুলো নাড়াচাড়া করে, কিন্তু পড়ে না। তিক্ত অভিজ্ঞতাটা তার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে আরও কয়েক বছর। স্বরাজের মনে হল, কন্নুর চোখ দুটো বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

"কী করছিস ছোট্ট?" সে থালাটা সরিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল বাচ্চাটার পাশে, "কী ভাবছিস?"

"চাচা," কন্নু নিষ্পাপ চোখদুটো তুলে ধীরে-ধীরে বলল, "জিহাদি কী? খুব খারাপ জিনিস?"

প্রশ্নটা বজ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ল স্বরাজের মাথায়। কোনও জবাব দিতে পারল না এ প্রশ্নের। কন্নু তখনও অপলকে তাকিয়ে আছে তীব্র দিকে। চোখদুটোর তীব্র দৃষ্টি ভেদ করে যাচ্ছে স্বরাজের দেহ। বুঝি বা দেখে ফেলল তার দেহের ভেতরের জিহাদকে। হয়তো বা শিশুর কণ্ঠে অন্তর্যামী এক্ষুনি বলে উঠবেন, "তুমিও জিহাদি, তাই না?"

সে টের পেল, আস্তে-আস্তে তার অন্তঃকরণ কুঁকড়ে যাচ্ছে। যেভাবে সামান্য স্পর্শেই লজ্জাবতীর পাতা সঙ্কোচে শিউরে ওঠে, গুটিয়ে যায়, তেমনই গোটা দেহটাই বুঝি সংবেদনশীলতায় হাত-পা সুদ্ধ পেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। একটা শিশুর সরল সপ্রশ্ন চোখে কয়েক সেকেন্ডের বেশি চোখ রাখতে পারল না স্বরাজ।

তার জায়গায় লালা থাকলেও কি পারত?

চোদ্দো

চতুর্দিকে দাউ দাউ আগুন।

একের পর এক গোলা এসে পড়ছে। শুধু বিস্ফোরণের শব্দ। তার মধ্যেই কুঁড়েঘর পুড়ে যাওয়ার পড়পড় আওয়াজ। ত্রস্ত লোকজনের হাহাকার। আগুন তীব্র ধূমল দেহ নিয়ে একের পর এক কুটির দখল করছে। তার অগ্রাসী ক্ষুধা উল্লসিত হয়ে নেচে-নেচে উঠছে আকাশচুম্বী শিখায়।

সামনের বিস্তৃত জলাভূমিতে যুদ্ধ চলছে। সে এক ভীষণ যুদ্ধ! সে যুদ্ধে একের পর এক খেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মাঠের শস্য সবে সোনালি রং ধরতে শুরু করেছিল। কিন্তু ফসল কাটার আগেই সব শেষ। পাকিস্তান ও ভারতীয় ট্যাঙ্কবাহিনীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে সব ছারখার হয়ে গেল। মারণাস্ত্র জাত দেখে না, ধর্ম দেখে না, আমির-গরিব দেখে না। কামানের গোলার গায়ে শুধু লেখা থাকে ধ্বংস। এমনিতেই গরিব মানুষগুলো বুঝেছিল তাদের কপালে বিরাট এক মন্বন্তর নাচছে। না খেতে পেয়ে উজাড় হয়ে যাবে পুরো গ্রামটাই। তবু নিজের জমি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি। লোকগুলো যুগের পর যুগ বন্যা, মড়ক, মন্বন্তরকে মাত দিয়ে ওভাবেই বেঁচেছিল। ভেবেছিল, এবারও হয়তো কোনওরকমভাবে

AMARBOI.COM

আত্মরক্ষা করে নেবে।

কিন্তু এবার যমরাজের একটু অন্য রকম পরিকল্পনা ছিল। তিনি একটু বেশিই তাড়ায় ছিলেন। তাই পাঠিয়ে দিলেন অগ্নিদেবকে। খাণ্ডবদাহনের মতোই শুরু হল আগ্রাসী তাণ্ডব!

ছ'বছরের ছেলেটার উৎকট ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ঘটনার গুরুত্ব বোঝার মতো বোধ তখনও হয়নি। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এত কলরব কিসের! কী হয়েছে! পোড়া বাড়ি এবং পোড়া মানুষের তীব্র গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে ক্ষীণকণ্ঠে আব্বু, আম্মিকে ডাকছিল। দৃঢ় বিশ্বাস, আম্মি বা আব্বু তাকে ঠিক বাঁচাতে আসবে। কিন্তু একটু বাদেই সে বিশ্বাস ভেঙে গেল। তার চোখের সামনে একটা পোড়া মানুষ ছটফট করতে-করতে এসে পড়ল! দেহ তখন গ্রাস করে নিয়েছে আগুন। মানুষটাও আপাদমস্তক পুড়ে গেছে। অন্তিম শ্বাসের নিকটবর্তী সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছ'বছরের শিশু চিনে নিল তার মা'কে। ভয়ার্ত গলায় এইবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "আ-ম্মি-ই-ই-ই!"

পাশের ঘর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "গু-ল-জা-র!"

শিশুটি আরও আতঙ্কিত হয়ে দেখে তার বাবাও আটকে পড়েছে আগুনের ফাঁদে। দরজায় আগুনের লোলজিহ্বা খাদ্যের অন্বেষণে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। আব্বু অসহায়ভাবে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "গুলজার! বে-টা!"

আব্বুর চিৎকারের সঙ্গেই ভেসে এল আর এক শিশুর ভাষাহীন ক্রন্দন। আব্বু আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "আরিফা! আ-রি-ফা! ইয়া খুদা!" তিনি তখন প্রাণপণ আল্লাহকে স্মরণ করছেন। দু'বার এগিয়ে আসতে গিয়েও পারলেন না। আগুন ক্রমশ ঘিরে ধরছে শিশুপুত্রকে। আর হয়তো আশা নেই। কাঠের বাড়ির ছাদ আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে শিথিল হয়ে পড়ছে। এবার সরাসরি আছড়ে পড়বে ছেলেটার উপর।

আব্বুর প্রার্থনা আল্লাহ শোনেননি। কিন্তু অন্য কেউ শুনেছিল। ছ'বছরের শিশু দেখল জ্বলন্ত দরজাটা কোনও জোরালো লাথিতে ভেঙে পড়ল। তারপরই মুহূর্তের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ যেন আছড়ে পড়ল তার উপর। তাকে বুকে নিয়েই ভল্ট খেয়ে সরে গেল জ্বলন্ত কাঠের বিছানা থেকে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সদ্য বেঁচে যাওয়া ভয়ার্ত চোখ দেখল একটি সুন্দর তরুণ মুখ। সুঠাম পেটানো চেহারা। প্রশস্ত বুকের মধ্যে গুঁজে রেখেছে তাকে। বাবা চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে বাঁচাতে হবে না। আমার মেয়ে আরিফা...আরিফা ভেতরের ঘরে আছে!"

সেই জওয়ান মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ বুঝেছে। গুলজারকে কোলে নিয়ে জ্বলন্ত দরজা দিয়েই বেরিয়ে এল সেই তরুণ। তাকে বাইরে নিরাপদ জায়গায় রেখে ফের ফিরে গেছে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা! তারপরই কোলে আরিফাকে নিয়ে, আর এক হাতে আব্বুকে ধরে লাফিয়ে বেরিয়ে এল সে। আগুনের লেলিহান শিখা শিকার ফসকে যাওয়া রাগে উগরে দিল আরও কিছুটা আগুন। আরিফাকে বুকে ধরে সেই যুবক অদ্ভুত কায়দায় দেহটাকে বেঁকিয়ে নিজের পিঠটাকে এগিয়ে দিল আগুনের দিকে...!

আব্বু আর আরিফাকে বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছিল সেই জওয়ান। কিন্তু সে নিজে অক্ষত ছিল না। যখন বাইরে এল, আরিফা আর আব্বু অক্ষত থাকলেও তার ইউনিফর্মে আগুন ধরে গিয়েছিল। অন্য জওয়ানরা দৌড়ে এসে তাকে কম্বল দিয়ে চেপে ধরে আগুন নেভাল। তখনও সে বলে যাচ্ছে, "আমায় নয়... ওদের দেখো... ওদের দেখো!"

"তুই দুশমন! তুই দুশমন..."

আরিফার ফিসফিসানিতে ঘুম ভেঙে গেল গুলজার আহমেদের। চোখ খুলতেই খটখটে রোদ এসে চোখ ঝলসে দিল। আজ সে কাজে যায়নি। কাল রাত থেকেই একটু জ্বর-জ্বর লাগছে। জ্বর হয়নি, সামান্য সর্দি, কিন্তু শরীরটা কাহিল। শেষ রাতে একবার অবশ্য অভ্যাসমত চোখ খুলে গিয়েছিল। তখনও আজানের সুর কানে আসছে। ব্যস, ঘুম মাথায় উঠল। তামাকের ডাবা নিয়ে সে দাঁত মাজতে বসে গেল। এ যেন 'খুদা'র প্রতি এক অন্তহীন জিহাদ। যতদিন বেঁচে থাকবে গুলজার, ততদিন খুদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যাবে। 'দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজুয়ে কাতিল মেঁ হ্যায়!'

দাঁত মাজতে মাজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল শিশমহলের অনতিদূরেই কুয়াশার মধ্যেই ছায়া-ছায়া কয়েকটা নৌকো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর্মির বোট। শিশমহলের দিকে নজর রাখছে নাকি! সে মুখ বিকৃত করে। এই আর এক উৎপাত। শান্তিতে থাকতে দেবে না কিছুতেই। সব কিছুতেই নবাবজাদারা নাক গলাবে। এক সময়ে ব্রিটিশ রাজ ছিল। এখন হয়েছে আর্মি রাজ। নামেই ভারতীয় সেনাবাহিনী। অত্যাচারে ব্রিটিশদের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

তারপর আজানের সুর থেমে গেলে মুখ ধুয়ে, কুল্লা করে এসে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। ক্লান্ত শরীর আরও ঘুম চাইছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই ফিরে এল সেই স্বপ্নটা। স্বপ্ন ঠিক নয়, বরং বলা ভাল অতীতের ছবি। আগে কখনও এই স্বপ্নটা এতবার দেখেনি গুলজার। কিন্তু ইদানীং পুরনো দগদগে স্মৃতিটা বারবার ফিরে আসছে। ভাবতেই আপনমনে হেসে ফেলল সে। গুলজার ভুলতে চাইলেও ওই শয়তান খুদা কিছুতেই ভুলতে দেবে না। বাস্তবে না পারুক, স্বপ্নে শত্রুতা ফলাবেই।

"তুই দুশমন... তুই দুশমন...!"

আরিফা প্রায় তার বুকের উপরে উঠে এসেছে। এই মুহূর্তে গুলজার আরিফার বিছানায় শুয়ে আছে। রাতটা নার্গিস আর আরিফার সঙ্গে ভাগ করে কাটায় সে। এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডার শেষ নেই। নার্গিস যা নয় তাই বলে মুখখিস্তি করে। প্রথম-প্রথম সে ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি আরিফার কাছে চলে আসত। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল। ভয় এমন একটা অনুভূতি, যতক্ষণ কিছু গোপনীয় থাকে, ততক্ষণই টিকে থাকে। যখন সব কিছু প্রকাশ্যে চলে এল, তখন আর ভয়ের কিছু নেই। এখন যা হয় 'ইয়ে মেরা খুদা।' নার্গিস জ্বলন্ত চোখে তার চলে যাওয়া দেখে। বোনের সঙ্গে যে-লোক বন্ধ দরজার পিছনে রাত কাটায়, তার সঙ্গে নার্গিস এক বিছানায় শোবে না। তাই রেগেমেগে কাঠের মেঝেতেই রজাই পেতে শোয়। প্রায় এক বছর হয়ে গেল, দু'জনের কোনও শারীরিক সম্পর্ক নেই।

আরিফা তার বুকে মুখ গুঁজে বলল, "তুই দুশমন... তুই দুশমন!"

"হ্যাঁ... হ্যাঁ!" সে বিছানায় উঠে বসেছে, "রাত কাটলেই আমি দুশমন। হয়েছে? শান্তি?"

আরিফা ছোট্ট মেয়ের মতো তার কোলের উপর গুড়িশুড়ি মেরে বলল, "ওরা আমায় নিতে এসেছে! ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে!"

গুলজারের চোখে ফের ভেসে ওঠে কঠিন বাস্তবের অতীতচিত্র। আরিফার শতছিন্ন পোশাক। কামড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত স্তনে, নাভিতে আর মাংস অবশিষ্ট ছিল না! উরুসন্ধি থেকে শুকনো রক্তের দাগ নেমেছে পায়ের পাতা অবধি। যোনিদ্বার আর পায়ু—দুই-ই ভয়ংকর জখম হয়েছিল! সারা মুখ নীল। বীভৎস কালশিটের দাগ সারা ফোলা মুখে...

দৃশ্যটা মনে পড়তেই চোখ বুজে ফেলে সে। কী ভয়ংকর! কী নির্মম! ওরা কি মানুষ? না জানোয়ার? পাশবিকতা কাকে বলে সেদিন নিজের চোখে দেখেছিল গুলজার। আরিফা চুপ করে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল। মাঝেমধ্যে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। কাউকে ধারে কাছে আসতেই দিচ্ছিল না। এমনকী, গুলজারকেও নয়। গুলজার তার অবস্থা দেখে এগিয়ে যেতেই দেওয়ালের কোণে নিজেকে গুঁজে দিয়েছিল আরিফা। পারলে যেন দেওয়ালে মিশে যায়...

"ছুঁবি না... ছুঁবি না... দুশমন... তুই দুশমন!"

গুলজার কেঁদে ফেলেছিল। মর্মান্তিক কণ্ঠস্বরে বলেছিল, "আরিফা, আমি ভাইজান।"

আরিফা আরও দূরে সরে যায়, "ছুঁবি না... মৈনু না চুয়ো... দুশমন...

আরিয়া চুপ করে বাটিতে মুখ গুঁজে বসেছিল। মাঝেমধ্যে কেশে কেশে উঠছে। কাউকে ধারে কাছে আসতেই দিচ্ছিল না। এমনকা গুলজারকেও নয়।

দুশমন! ; হানা ও!"

"আরিয়া... আমি ভাইজান!"

আরিয়া ভয়-বিকারিত চোখে তাকে দেখে নিয়ে এক লাফে পেছনে হেলে বলে, "তুই মরস... তুই দুশমন! তুই দুশমন!"

ঈশানে সেই প্রথমবার ধাক্কা করে বুকখানা কেঁপে উঠল। গুলজার মোবাইলে আর্মি, সিদ্দিক বীভৎস মৃত্যুতে কাঁদার সময় পায়নি ছাপ্পরের শিশুরা এরপর মত বড় হয়েছে, নিজের কান্না হাসিকে গিলে ফেলতে শিখেছে। বড় ছেলে ওওয়ার মক্কা বাবাকে সাহায্য করতে জীবিকায় নেমে গিয়েছিল। জীবনে একটাই বিলাসিতা ছিল। শের শায়েরি পড়া। কার মতোই স্কুলে পড়ার পাশাপাশি চাকরিও করত। তাই কিছুদূর পড়াশোনা করেছে। এখনই কবিতার নেশা লেগে গেছে। এইটুকুই রোমান্টিসিজম। নয়তো বরাবরই সে কঠিন। তাই আব্বু সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদতে পারেনি। কাঁদবে কী? এখন সে চিন্তা করছে এরপর কী হবে? চুপি আন্দোলনের ফলস্বরূপ অমরনাথের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কী খাবে? বিবা বোনটাকে কীভাবে সামলাবে? কীভাবে উদ্ধার করবে আব্বু আর সলমানের দেহ?

শুধু আরিয়াকেই নয়, গুলজারকেও বন্দি করে রেখেছিল পাহাড়ের ও পুলিশ। প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মাদিনী হয়ে তারা তোলে ভাই বোনের ওপর। কখনও উলটো ঝুলিয়ে রাখে, কখনও বরফের উপরে শুইয়ে পিটিয়ে পাটপাট করে ফেলেছে গুলজারকে। তবু একবারও ভেঙে পড়ে নি সে।

কিন্তু আরিয়াকে দেখে আর থাকতে পারেনি। মাথায় ভর দেয়ার শরীরটা শিথিল হয়ে পড়েছিল মাটির উপরে। বুকের সব যন্ত্রণা উজাড় করে দিয়ে হাহাকার করে ওঠে গুলজার। উনুনের মতো কাঁদতে কাঁদতে বারবার মাথা বুকটিকে ফেলেছে। তখনও একটা কথাই ভেবেছিল, কেন মরল না কেন মরল না সে?

"ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে..."

"কেউ ধরবে না... গুলজার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, "ওদের আমি তাড়িয়ে দেব।"

"তবে ওরা আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে কেনো?"

এবার সে অবাক, "কে বাড়িতে ঢুকেছে?"

আরিয়া চুপ করে যায়। এটাই ওর নিয়ম। বেশির ভাগ সময়ই কথা বলতে-বলতে ভুলে যায় কী বলছিল। তবু গুলজারের মনের গুরুত্ব হানিটা গেল না। আরিয়া আর্মির বোট দেখেছে হয়তো। তাই ভয় পেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু ঘরে ঢোকার কথা বলল কেনো? আর্মি ঘরে ঢুকেছে নাকি?

গুলজার আহমেদ তাড়াতাড়ি গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কই, কোথাও কেউ নেই তো! তবে কার কথা বলছে আরিয়া? কিন্তু না দেখলে এমন অপ্রাসঙ্গিক উলটোপালটা কথাও বলে না সে। তবে কি দোতলায়...

দোতলায় তখন প্রলয় পাগলের মতো সব ওলট-পালট করে গেলেন মোবাইলটা খুঁজছিল। একটু আগেই ভবনের ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কিন্তু পায়নি। তাই গুলজার আহমেদের বাড়িটাও খুঁজে দেখতে এসেছে সে। তার হিসেবমতো এখন গুলজারের দরজায় থাকার কথা। নাদিরকে একটু আগেই নৌকো নিয়ে বাজারের দিকে যেতে দেখেছে। আর আরিয়া তো মানসিক ভারসাম্যহীন। তাকে পাত্তা না দিলেও চলে। তাই প্রাণের দায়ে মরিয়া প্রলয় এই মারাত্মক ঝুঁকিটাও নিয়ে নিল।

কিন্তু প্রাণপণ খুঁজেও মোবাইলটা পাওয়া গেল না। বরং যা পাওয়া গেল তা দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ। গুলজারের চারপাইটা আঁতড়ে ফেড়েফুড়ে পরীক্ষা করে দেখেছিল সে। চারপাইয়ের বাঁটির তলায়

মোবাইল নেই, তার বদলে একগাদা নোটের বান্ডিল। স্বরাজ বিস্ময়াভিভূত হয়ে থমকে গেল। এত টাকা। এক ধাবার বাবুর্চির বিছানার তলায় এত টাকা কী করছে? কম করেও লাখখানেক টাকা তো হবেই! তবে কি তার সন্দেহ সত্যি? তবে কি গুলজারই...?

ভয়ে, বিহ্বলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিল স্বরাজ। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কী করবে।

"শয়তানের বাড়িতে এভাবে ছাপা মারতে নেই ভাই," তাকে আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে পিছন থেকে ভেসে এল স্বয়ং গুলজার আহমেদের কণ্ঠস্বর, "কারণ শয়তানের পায়ের আওয়াজ কখনও শোনা যায় না। যখন তখন ধরা পড়ে যেতে পারো।"

কী সর্বনাশ। লোকটা বাড়িতে আছে। স্বরাজ টের পেল সে দস্তুরমতো ঘামছে। কোনওমতে বলল, "আমি... আমি..."

গুলজার এবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তীব্র চোখদুটোয় আগুন জ্বলছে, "আমি... আমি কী? মেহমান নওয়াজির এই প্রতিদান! দিনে দুপুরে ডাকাতি? তোমার হিম্মতের তারিফ করতে হয়!"

স্বরাজ কোনও শব্দ খুঁজে পায় না। গুলজার তাকে তখনও মাপছে।

"আমি চুরি করতে আসিনি।"

"ও আচ্ছা," সে অন্নরসাত্মক হাসে, "চুরি করতে আসোনি। তবে কী করতে এসেছ? গোয়েন্দাগিরি? কোন পার্টি? জিহাদি না আর্মি?"

বলতে বলতেই তার নজর পড়ল বিছানার দিকে। সেখানে এখনও তাড়া-তাড়া নোট শোভা পাচ্ছে। স্বরাজ লক্ষ করে বরফের মতো শীতল দৃষ্টি গুলজারের। গর্দিটা ঠিকঠাক করে টেনে, চাদরটা ঠিক করে পেতে নেয় গুলজার। মুখটা একেবারেই নিস্পৃহ, যেন আস্ত মানুষ নয়, একটা ইঁদুর বা বিড়াল ঘর তছনছ করছিল এতক্ষণ। স্বরাজের তখন মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডের 'লাবডুব' শব্দটা কয়েকগুণ জোরালো হয়ে উঠেছে। গোটা পৃথিবীটাই চোখের সামনে দুলছে। ভাবছিল, এই সুযোগেই পালিয়ে যাবে কিনা। বলা যায় না, হয়তো এখনই গুলজার তার মাথায় একটা রিভলভার চেপে ধরবে। অথবা একটা ছুরি নিয়ে বসিয়ে দেবে বুকে। গুলজারের রহস্য জেনে ফেলেছে সে। গুলজার তাকে ছাড়বে না।

"মার দিয়া যায়, কে ছোড় দিয়া যায়/ বোল তেরে সাথ ক্যায়া সুলুক কিয়া যায়?" গুলজারের মুখে রহস্যময় হাসি, "এই নজারা তোমার দেখা উচিত হয়নি কাটরা সাহেব।"

স্বরাজের ইচ্ছে করছিল, প্রাণপণ দৌড় লাগায়। কিন্তু পা দুটো যেন কয়েক মণ ভারী। অথবা কেউ পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে এঁটে দিয়েছে। ঘেমে নেয়ে একসা হচ্ছে স্বরাজ।

"যা খুঁজছিলে তা কি পেয়েছ?" গুলজারের মুখ গম্ভীর হলেও একটা অদ্ভুত তাচ্ছিল্য কৌতুকের সঙ্গে তার চোখে খেলা করছে, "যদি না পেয়ে থাকো তবে আরও একবার খুঁজে নিতে পারো। আমি ততক্ষণে গোসলটা সেরে আসি। তবে এই টাকার কথা শিশমহলের কেউ জানতে পারলে তোমার 'খের' হবে না।"

কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই গুলজার সেখান থেকে চলে যায়। তার নিরুত্তাপ, স্বাভাবিক চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে ঘাম মুছল স্বরাজ। তার মনে তখনও অদ্ভুত একটা কৌতূহল থেকেই গেল। এই গুলজার আহমেদ লোকটা ঠিক কে? ঠিক কী।

স্বরাজকে দোতলায় একা রেখে নিচে নেমে এল গুলজার। তার ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। মুখ সন্দেহকুটিল। এই ছেলেটাকে শুরু থেকেই তার ঠিক ঠেকছে না। নাম বলছে 'স্বরাজ কাটরা', অথচ দিব্যি কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলছে। কাটরাদের কেটে ফেললেও শুদ্ধ হিন্দি ছাড়া মুখ থেকে অন্য কিছু বেরোবে না। এমনকী, ছেলেটা হিন্দি কথা বললেও উর্দু শব্দ ব্যবহার করে। কাটরারা উর্দু 'লবজ়' মুখেও আনে না। তাছাড়া ওকে দেখলেই বোঝা যায় ও কাশ্মীরি। জম্মুর লোক আদৌ নয়। জম্মুর লোকদের রং স্বাভাবিক। কিন্তু স্বরাজের রংটা 'স্বাভাবিক' নয়। ওকে দেখলেই বোঝা যায় যে, এক সময়ে ত্বক ধবধবে সাদা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের প্রখর সূর্যালোক চামড়া পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্যানিং-এর জন্য কাশ্মীরের বেশ কুখ্যাতিই আছে। মেয়েরা তাই মাথায় ওড়না, আর ফুল হাতা লম্বা সালোয়ারে নিজেদের ঢেকে বেরোয়। নয়তো চামড়ার 'গোরা' রং আর টিকবে না। ছেলেদের সে উপায় নেই। সুতরাং স্বরাজ জম্মুর লোক নয়, কাশ্মীরি।

শিশমহলের জলে ডুব লাগাতে-লাগাতেই আপনমনে মাথা নাড়ল সে। না, মিলছে না। কোনও হিসেবই মিলছে না। ও বলছে এখানে বন্ধুর আত্মীয়ের বাড়িতে আসছিল। তবে ব্যাগে অত টাকা কেন? এতক্ষণ ধরে গুলজারের ঘরে ও কী খুঁজছিল?

"হুম উসকি আখেঁ দেখ কর ফনাহ হো গয়ে/ না জানে উয়োহ আইনা ক্যায়সে দেখতা হোগা..."

মেয়েলি গলায় 'গালিব' শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল গুলজার আহমেদ। তার ঠিক পিছনেই নৌকো করে কখন যেন চুপিচুপি এসে পড়েছে আফসানা। নেশাগ্রস্তের মতো তার স্নান করা দেখছে। খুদা, আর্মি, জিহাদি, নার্গিস— কাউকে রেয়াত করে না গুলজার। কিন্তু একজনকেই যমের মতো ভয় পায়, আফসানা। সে খুব ভাল করেই জানে, আফসানার মনে কী আছে। গুলজার ওর থেকে অনেক বড়। তবু কিছুতেই সে 'গুলজারভাইজান' বলবে না। নাম ধরেই ডাকে। মেয়েটা অসম্ভব বেপরোয়া। তার সিক্ত দেহ, শ্বেতপাথরের ভাস্কর্যের মতো টানটান শরীরে মুগ্ধ চোখ ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল আফসানা, "মাশাআল্লাহ! আইনা দেখ আপনা সা মুহ লে কে রহ গয়ে,/ সাহিব কো দিল না দেনে পর কিতনা গুরুর থা।/ কাসিদ কো অপনে হাথ সে গর্দন না মারিয়ে,/ উসকি খতা নেহি হ্যায়, ইয়ে মেরা কুসুর থা!"

গালিবের ধাক্কা খেয়ে ভয়ের চোটে ঝুপ্‌স করে গলা অবধি কুচরিপানায় ডুবিয়ে ফেলল গুলজার। বিরক্তিমিশ্রিত গলায় বলল, "ক্যায়া হ্যায় ইয়ে? বেশরম! বাপের বয়সি লোকের পিছনে লেগেছিস। আমার প্রথম বিবির বাল-বাচ্চা হলে আজ তোর বয়সি একটা ছেলে বা মেয়ে থাকত আমার। দিমাগ চেক করা।"

আফসানা তার বকুনি খেয়েও ভয় পেল না। মৃদু-মৃদু হাসল, "দিমাগ তো তোমার চেক করানো উচিত গুলজার! তুমি আমার বাপের বয়সি? তবে নার্গিসের ঠাকুরদা হও তুমি। নার্গিস আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমার বয়েস তিস!"

"তিসেই তুই একটা আস্ত চিজ়," গুলজার কড়া গলায় বলে, "যা বলার বলেছিস। এবার ভাগ। আমার কাজ আছে। গোসল করতে দে।"

"করো না! তোমার লজ্জা কী জনাব? তুমি তো ঔরত নও যে, পরদা টাঙিয়ে গোসল করবে।" যাওয়ার কোনও লক্ষণই নেই আফসানার। উলটে সে নৌকোর উপর নিজের সুন্দর শরীরটাকে আরও ছড়িয়ে আরাম করে বসল, "আমায় এত ভয়। নিজেও জানো তুমি আমায় নফরত করো না। তবু নৌটঙ্কি করছ কেন? আমি তো তোমায় চাই। শাদি করতে থোড়াই বলছি। দরকার পড়লে 'রখেল' রাখ না। খাওয়াতেও হবে না! আমি নিজেই নিজের রুটি রোজগার করে নেব। তোমার তো ছেলেপুলেও নেই। আমি, আজানবাবা, আরিফা আর তুমি একসঙ্গে থাকব।"

বলে কী। গুলজার বিপন্নবোধ করে। মেয়েটা তো পিছনেই পড়ে গেছে। কোনওমতে বলল, "লজ্জা করে না? আমি বিবাহিত। নার্গিস জানলে কী বলবে?"

"নার্গিস বলবে বাকিই কী রেখেছে?"

"বদতমিজ়!" ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল গুলজার, "এখনই চলে যা বলছি।"

ঝপাং করে নৌকো থেকে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল আফসানা। তারও জেদ চেপে গিয়েছে। আজ বরফ গলিয়েই ছাড়বে। গুলজার ভয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছিল। তার আগেই দু'হাতে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ধরেছে আফসানা। তার ঘন নিঃশ্বাস গুলজারের গলায়, মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। ঠোঁটের কাছে আফসানার গোলাপি ঠোঁটজোড়া এগিয়ে এসেছে...

"বদতমিজ়ি পে হম আ গয়ে তো, তুম শরিফোঁ কা ক্যায়া হোগা?/

হ্যায় শিশে কা ঘর তুমহারে, মারা পথর, তো ক্যায়া হোগা?" তার মুখে, ঠোঁটে আঙুল বোলাতে-বোলাতে আফসানা উষ্ণ কণ্ঠে বলে, "আমাকে নার্গিস দেখিও না। তোমাদের ভালবাসা তো শিশমহল। এ তল্লাটের সবাই জানে তোমাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক।"

আফসানার সুগন্ধী নিঃশ্বাসে, কোমল স্পর্শে অবশ হয়ে আসছিল গুলজার। প্রাণপণ চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারছে না। প্রবীণ উপোসী দেহ ওই স্পর্শটা বুভুক্ষর মতো চাইছে, সাড়া দিচ্ছে। ক্রমাগতই দুর্বল হয়ে পড়ছে গুলজার, প্রতিরোধের শক্তিটুকুও যেন বাকি নেই। কোনওমতে স্খলিত স্বরে বলল, "আমায় ছেড়ে দে।"

"এত সহজে ছাড়ব? সর্বক্ষণ চোখের সামনে ঘুরঘুর করে লোভ দেখাও। কাছে যেতেই দাও না। আর আজ ছেড়ে দেব?" আফসানা তার বুকে মুখ ডুবিয়ে আদর করতে-করতে বলে, "গুলজার, একটা মিথ্যে জীবন বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। ওই মাথামোটা নার্গিস জীবনেও তোমাকে বুঝবে না। কিন্তু তুমিও জানো, আমি তোমায় বুঝি। আমি তোমার 'চুপি'র পিছনে, হাসির পিছনে, 'শায়রির' পিছনে যন্ত্রণা দেখেছি। গোটা শিশমহলে আর একটা লোকও নেই যে, আমার মতো করে তোমায় বুঝবে। তবে কিসের ভয়? তুমি তো খুদাকেও বিশ্বাস করো না। দোজখের ভয়ও নেই। তবে?"

"আফসানা। ন-হিঁ। আঃ।"

এর বেশি কিছু বলতে পারল না গুলজার। তার পাগল-পাগল লাগছে। ক্রমশ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে। আফসানা কখনও তার এত কাছে, এমন ভাবে উদগ্র কামনা নিয়ে আসেনি। আফসানা তাকে টানতে-টানতে নির্জন ঘাসবনে এনে ফেলেছে। গুলজারের মতো একজন শক্তসমর্থ পুরুষ তাকে একটা ধাক্কা মারলে 'কমসিন' মেয়েটা পড়ে যাবে। কিন্তু সেটুকু শক্তিও নেই গুলজারের।

"আমায় একটু প্যায়ার করো গুলজার... একটু আদর করো... তোমার আদর-ভালবাসা ছাড়া আমি কিছু চাই না!" মেয়েটা উন্মত্তের মতো তার হাতে, গলায়, ঘাড়ে চুমু খেয়ে চলেছে। ডুবে যাচ্ছে গুলজার। ডুবে যাচ্ছে ক্রমশই। কিছু একটা বলতে গেল। তার আগেই আফসানা পরম আশ্লেষে তার ঠোঁটে চুমু খেয়েছে। আবেশে চোখ বুজে আসে গুলজারের। পঞ্চান্ন বছরের দেহটার খিদে কিছু কম নেই। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো সে নিজেকেই হারিয়ে ফেলে।

"আমি যদি বিলালের জন্য সব ছাড়তে পারি, তবে তোমার জন্য ওকেও ছাড়তে পারি," উন্মাদ হয়ে গিয়েছে আফসানা। এক ঝটকায় সালোয়ার খুলে নিজের ধবধবে মার্বেলের মতো শরীরটা সমর্পণ করল গুলজারের কাছে। নাগিনীর মতো দুই বাহু দিয়ে নাগপাশে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি শুধু একবার বলো..."

"কী বলব?" গুলজার হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পায়। তার চোখে ঠান্ডা চোখদুটো রাখে, "তুই বিলালের জন্য সব ছেড়েছিস, আমার জন্য বিলালকে ছাড়বি, তারপর? আমার থেকে জওয়ান, খুবসুরত কাউকে পেলে আমাকেও ছাড়বি। তাই তো?"

জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টিতে গুলজারকে দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আফসানা। তারপর হতাশ স্বরে বলে, "তুমি কাউকেই বিশ্বাস করো না। তাই না?"

"আমি নিজেকেও বিশ্বাস করি না, অন্য কাউকে তো দূর।" গুলজার বলল, "অবশ্য তাতে তোর কী অসুবিধে? নষ্ট হতে এসেছিস, হবি। তুই তো আমার জিসম চাস! বিশ্বাসে কী আসে যায়? আমি তো লম্পট পুরুষ। একটা বিবি আছে, তারপরও বোনের সঙ্গে জিসমানি সম্পর্ক। লম্পট পুরুষের শরীরের ওপর সবার অধিকার। একটু খেপিয়ে দিলেই হল..."

"ছেড়ে দাও," আফসানা রেগেমেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, "ওসব ধাপ্পা অন্যকে মেরো। তোমার আর আরিফার জিসমানি তালুকাৎ। তাও যদি নিজের চোখে না দেখতাম..."

"নিজের চোখে দেখেছিস!" এবার বিস্ময়ের ধাক্কাটা প্রবল। গুলজার স্তম্ভিত, "কী দেখেছিস। কী করে দেখলি।"

"জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছি। আর যা দেখেছি তার সবটাই বুঝেছি।" রাগে খমখম করতে-করতে বলল আফসানা, "ছড্ডো। যাও গোসল করো গে। যত্তসব।"

"দাঁড়া," হাত টেনে ধরে আফসানাকে নিজের বুকের উপর টেনে আনল গুলজার। পরম আদরে, সস্নেহে তার গাল ছুঁয়ে থাকা কোঁকড়া চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। নির্বাক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই যা যা বলেছিস, সব ঠিক। ইকরার করছি, আমিও তোকে কোনও ভাবে চাই। তবে এটা ভালবাসা নয়, শরীরের লোভ। আমি কাউকে ভালবাসতে পারি না। পারিনি কখনও, পারবও না। জবাব পেয়েছিস? যা, পালা।"

বলতে-বলতেই সে ক্লান্তভাবে চোখ বোজে। একটা শ্বাস টেনে আফসানাকে ছেড়ে দেয়। তার হাতে সালোয়ার কামিজটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বাত করানি মুঝে মুশকিল কভি এইসি তো না থি/ যেইসি অব হ্যায় তেরি মেহফিল, কভি এইসি তো না থি।"

আফসানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের ঘনিয়ে এসেছে কাছে। গুলজারের কপালে, চোখে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে আস্তে-আস্তে বলল, "লে গয়া ছিনকে কৌন আজ তেরা সব্র-ও-করার/ বেকরারি তুঝে অ্যায় দিল, কভি এইসি তো না থি।"

এরপরও কি ওকে ফেরানো যায়? গুলজারও পারেনি। আফসানার ভালবাসায় নিজের মর্জিতে ডুবে গিয়ে গুলজারও আবার বুঝল, পাথর হওয়া সত্যিই অত সহজ নয়।

পনেরো

গুলজার আহমেদ। বড্ড ভাবাচ্ছে এই লোকটা।

ব্যাপারটার বাইরের চেয়ারে বসেছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। তার মুখে চিন্তার ভাঁজ প্রকট। একটু আগেই তাঁর খবরি গুলজার আহমেদের পুরো কুন্ডলী-চিঠাঁ অর্থাৎ পাস্ট হিস্ট্রি বলে গিয়েছে। খেমকরণের অগ্নিকাণ্ডের গল্প তাঁর অজানা নয়। বাবার কাছেই শুনেছেন, সে অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী ছিল। বাবা তখন রেসকিউ পার্টিতে ছিলেন। আর্মি অনেক লোককে বাঁচালেও আগুন বেশির ভাগ প্রাণই নিয়ে নিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি।

অমরনাথ ম্যাসাকারের গল্পও তিনি জানেন। খেমকরণের অগ্নিকাণ্ড লোকটার যেটুকু বাকি রেখেছিল, তাও কেড়ে নিল অমরনাথ। এখন আর্মির নিষ্ঠুরতার দগদগে ঘা, তথা বোন আরিফাকে নিয়ে বেঁচে আছে গুলজার আহমেদ। আর্মির উপরে বিদ্বেষ খুব স্বাভাবিক। জিহাদি হওয়ার জন্য একেবারে পার্ফেক্ট প্রোফাইল। তার উপর মনে পড়ছিল খবরির শেষ কথাগুলো...

"যে ঈশ্বরকে ভয় পায় না, সে কাউকে ভয় পায় না সাবজি। তার চেয়ে খতরনাক জীব আর নেই! যদি ঠিক পথে যায়, তবে ভয়ংকর ভাল হবে। আর যদি বিপথে যায়, তবে তার চেয়ে ভয়ংকর খারাপ আর কেউ হতে পারবে না।"

ক্যাপ্টেন দত্তা খবরির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান, "গুলজার আহমেদ এর মধ্যে কোন দলে পড়ে?"

"জানি না সাব," খবরি মাথা নাড়ে, "কেউ বলতে পারল না। তবে একথা ঠিক, লোকটা একটু পৌঁচা। 'আরি'র মতো কটাস-কটাস ধারালো কথাবার্তা বলে। ওকে শিশমহলের কিছু-কিছু লোক খুব ভালবাসে। ভরত শেরগিল তাদের মধ্যে অন্যতম। বাকিরা ভয় পায়। এ লোক ভাল হলে নিজের মর্জিতে হবে, খারাপ হলেও ওর নিজের মর্জি।"

লোকটা যে ধারালো কথা বলে তা ক্যাপ্টেন দত্তা নিজেও জানেন। নমুনা নিজের কানেই শুনেছেন। আর দুঃসাহসের মাত্রাটাও তখনই বুঝে গিয়েছেন, যখন সে রাঠৌরের হাত চেপে ধরেছিল। ক্যাপ্টেন নিজে ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু গুলজার একটুও ভয় পায়নি।

গুলজার আহমেদ— ভয়ংকর এবং সুন্দর। গোটাটাই খারাপ খবর।

এই লোক যদি জিহাদ করতে নামে তাহলেও ভয়ংকরভাবে করবে। কোথায় গিয়ে থামবে বলা মুশকিল। ক্যাপ্টেন দত্তা ভাবছিলেন, কী থাকতে পারে লোকটার মনে? কী বলতে চায় সুর্মা পরা নীল চোখদুটো। 'গুলজ়ার ফ্যান ক্লাবে' আবার পয়লা নাম ভরত শেরগিলের। সে আবার পঞ্জাবি জাঠ। এমনিতে জাঠ শান্তিপ্রিয় শ্রেণি। কিন্তু খেপিয়ে দিলে ভয়ংকর।

ক্যাপ্টেন দত্তা ভাবতে-ভাবতেই অশান্ত হয়ে ওঠেন। শিশমহলে ঠিক হচ্ছেটা কী। যাই হোক, খুব ভাল কিছু হচ্ছে না। ভিতরের খবর জানা জরুরি, বাই হুক অর ক্রুক!

"ওই লোকটাকে নিয়ে ভাবছেন স্যার?"

রাঠৌর কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পাননি ক্যাপ্টেন। এবার মুখ ফিরিয়ে একঝলক দেখে নিলেন তাকে। অন্যমনস্ক স্বরে বললেন, "এসো রাঠৌর। বোসো।"

রাঠৌর তার সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। প্রশ্নটা আবার ছুড়ে দিল তার দিকে, "গুলজ়ারকে নিয়ে ভাবছিলেন, তাই না?"

"হুঁ," তিনি সদর্থক মাথা নাড়েন, "আমি ঠিক ভাবছি না। লোকটা আমায় ভাবাচ্ছে। যা ইনফরমেশন পেয়েছি, কোনওটাই সুবিধের নয়। তার উপর আবার 'সওয়াগতা হে জিহাদি' স্লোগানটা পঞ্জাবি বা গুর্মুখী স্ক্রিপ্টে লেখা, আর লিফলেটগুলো কাশ্মীরিতে, পার্শো-অ্যারাবিক, বা পার্শিয়ান অ্যালফাবেটে।"

রাঠৌর অবাক হয়, "তাতে কী স্যার? শ্রীনগরের সব লোকই তিনটে ভাষা জানে। পঞ্জাবি, কাশ্মীরি আর হিন্দি।"

ক্যাপ্টেন একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন রাঠৌরের দিকে, "হ্যাঁ। কিন্তু সবাই হিন্দি ছাড়া বাকি দুটো ভাষাই একসঙ্গে লিখতে পারে না। যেমন যারা জন্মগত কাশ্মীরি, তারা পঞ্জাবি জানে। পড়তেও পারে। কিন্তু লেখে না। আবার যেসব পঞ্জাবি ফ্যামিলি মাইগ্রেটেড, তারা কাশ্মীরি বোঝে, পড়ে ও দিব্যি বলতে পারে। কিন্তু লিখতে পারে না। কোনও কাশ্মীরি যদি পঞ্জাবি ভাষায় লেখে তবে দেবনাগরী হরফে লিখবে, গুর্মুখীতে নয়। একজন পঞ্জাবি যদি কাশ্মীরি লেখে তবে সেখানেও একই নিয়ম।" একটু থেমে যোগ করলেন তিনি, "আর গুলজ়ার আহমেদ শিশমহলের একমাত্র লোক যে, দুটো ভাষাই সমান দক্ষতায় লিখতে পারে। ওর বাবা পঞ্জাবি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পঞ্জাবি ভাষাটা ও বলতে লিখতে জানে। ওর বোন আর্দিকাও গুর্মুখী লিখতে জানত। আবার লোকটা নিজের চেষ্টায় কাশ্মীরি ভাষাটাকেও গুলে খেয়েছে। দিব্যি লিখতে পারে। শের ও শায়েরি ওর দুর্বলতা। তার মানে উর্দুও জানে। আরও কী-কী জানে ভগবান জানেন। বেশি দূর পড়াশোনা করেনি। অথচ ছড়-বেছড় গালিব, দাগ-দহেলভি আওড়ায়। সেদিন আমাদের সবার সামনেই রামপ্রসাদ বিসমিল আওড়াল। একজন সাধারণ খেটে খাওয়া কাশ্মীরির কাছে তুমি কি আদৌ রামপ্রসাদ বিসমিল-মির্জা গালিব এক্সপেক্ট করতে পারো?"

রাঠৌর একটু চুপ করে থেকে বলে, "মানছি, লোকটা অন্যরকম।"

"সেলফ টট পার্সন। ইন্টেলিজেন্সের মাত্রাটা একবার ভাবো।" বিড়বিড় করে বলেন ক্যাপ্টেন দত্তা, "যে-লোক এত কিছু ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও এতখানি পড়াশোনা করে, যার অমন ভারী-ভারী শায়রির মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা আছে, তার মাথাটা মোটেই অবহেলার বস্তু নয়।"

রাঠৌর মৃদু হাসে, "চমৎকার মাথা। কিন্তু স্যার, আপনার জায়গায় আমি থাকলে ওই মাথা নিয়ে এত মগজমারি করতাম না। বরং মহারাণার কসম, এক গুলিতে মাথাটাই উড়িয়ে দিতাম। ব্যস, চিন্তা খতম!"

ভুরুতে ভাঁজ পড়ে ক্যাপ্টেন দত্তার। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "তুমি কি মারপিট, গোলাগুলি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না রাঠৌর? এত রাগ কেন কতগুলো গরিব লোকের ওপর?"

রাঠৌর একটু হাসল, "রাগ নয় শ্রীমান! আপনি আমার থেকে পদে বড় হলেও বয়সে ছোট। আপনার আগে থেকেই আমি এই বজ্জাত কাশ্মীরিগুলোকে দেখছি। লাদাখে আর কার্গিলে ওদের দেখা আর চেনা হয়ে গিয়েছে আমার। আপনিও স্যার কিছু দিন এল ও সি-তে গিয়ে কাটান। দেখবেন আর হমদরদি থাকছে না। কারওর নয়। কোনওদিন কারওর হয়নি। ওদের সঙ্গে ভালভাবে পেশ এলে দুর্বল ভাবে। তাই সকতি কায়ম রাখা জরুরি।"

কথাটা বলাই বাহুল্য পছন্দ হল না ক্যাপ্টেনের। তিনি রসিকতা করে বললেন, "তুমি তো ভাই একটা অসহ্য গিরিয়ালের তস্য অসহ্য সুপার ডিলেনের মতো ডায়লগ দিচ্ছ—'অদ্ধেরা কায়ম রহে।'"

"ঠিক বলেছেন," রাঠৌর কিন্তু হাসল না, "অদ্ধেরা কায়ম করাই জরুরি শ্রীমান। ওরা আলো দেখলেই ঝামেলা করে। ওই পোকাগুলোকে দেখেছেন? যেগুলো আলো জ্বললেই ভিনভিন করে ছেঁকে ধরে। চোখে-মুখে-নাকে ঢুকে পড়েশান করে— ওরা হল ওই কিরার জাত। অদ্ধেরাই ওদের জন্য ঠিক। চাপে রাখবেন, বশে থাকবে।"

ক্যাপ্টেন দত্তা স্তম্ভিত। এত ঘৃণা। এত ঘৃণা রয়েছে লোকটার মধ্যে। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। কতগুলো নিরীহ মানুষ এমন কী অপরাধ করেছে যে ওদের মানুষ বলে গণ্যই করে না রাঠৌর?

অন্যমনস্কভাবে সিগারেটে বেশ কয়েকটা টান মারল রাঠৌর। ইতিমধ্যেই টেবিলের ওপরে নানারকম খাবারের সঙ্গে পানীয় সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে বেয়ারা। আর্মি অফিসাররা অফিসে থাকলে কাজের পাশে মুখ চালিয়ে যেতে পছন্দ করে। তাদের খাওয়ার বহর দেখলে হয়তো বকরাক্ষসও ফিট পড়বে। অথচ এই লোকগুলোই প্রয়োজনে অসম্ভব কষ্টে, উপবাসে থেকে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে।

ফুলকপি রোস্ট একটুকরো মুখে দিয়ে গ্লাস তুলে নিয়েছে রাঠৌর। একটু অন্যমনস্ক স্বরে বলল, "জানেন স্যার, আমরা যখন এল ও সি-তে থাকতাম তখন এমনভাবে খাওয়া-দাওয়া হত না। সুখা রোটি খেয়েই কাটিয়েছি কত দিন। ভেজা কাঠে আগুন জ্বলত না। জল বরফ হয়ে যেত। 'রাশন' ঠিক মতো পৌঁছত না, তাই খানা-পিনায় অনেক রকম প্রবলেম ছিল।"

এই অবধি বলেই থামল সে। হাতের সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে একটা আইস কিউব ফেলল গ্লাসে। তারপর আলতো চুমুক দিয়ে বলল, "ওখানে এক বক্করবন্দার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল আমাদের। অন্যের ভেড়া-বকরি চড়াত ছেলেটা। বয়েস হার্ডলি বারো কী তেরো। তখন বেশ কয়েক দিন টানা বরফ পড়েছিল। একদিন রাতে আচমকা চলে এসেছিল আমাদের ছাউনিতে। দেখলেই বোঝা যায় ঠিকমতো খেতে পায় না। খিদের জ্বালায় লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু রুটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। আমাদের খুব প্রিয় দোস্ত সুবেদার খান ওকে ধরে ফেলেছিল। সুবেদার খান অসম্ভব সাহসী সিপাহি। শত্রুর ধড় থেকে মাথা আলাদা করার আগে একমুহূর্তও ভাবে না। আবার সেই লোকটাই ভিতরে-ভিতরে ভীষণ নরম। অন্যান্য জওয়ানরা ছেলেটাকে বকাবকি করছিল। মারধোরও খেত নির্ঘাত। সুবেদার খানই আমাদের সবাইকে থামাল। ছেলেটাকে খুব সুন্দর করে বোঝাল, "ভুখ লেগেছে বেটা? তাই বলে চুরি করবি? আগে শরাফৎসে চেয়ে দ্যাখ দিই কিনা। তারপর না হয় চুরি করিস।"

রাঠৌর আবার একটু বিরতি দিল। তার মুখে অদ্ভুত একটা অর্থবহ হাসি, "ছেলেটা মাথা নিচু, মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়েছিল। সুবেদার খানের কথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নাজড়ানো গলায় যা বলল তা "দিল দেহলদেনওয়ালা কিসসা!' ছেলেটার বাপু বেকার। কোনও কাম-কাজ নেই, স্রেফ মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। অথচ বছর-বছর একটা করে বাচ্চা হয়েই যাচ্ছে। ও মেজ ছেলে। ওর বড়দাদাও ওর মতো মেষপালক। ওর পর আরও আটজন ভাই বোন লাইন দিয়ে আছে। মা কিছু ছোটখাটো কাজ করে। আর ওরা দুই ভাই মেষপালকের কাজ করে টাকা রোজগার করে। তাতেও কুলোয় না। তার উপর হঠাৎ বরফ পড়ায় বেশ কয়েকদিন কাজ করতে পারেনি। খাওয়াও জোটেনি।

সুবেদার খান কথা শুনে চোখ মুছল। আমাদের অনেকেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল। সুবেদার খান কোনও কথা না বলে কিচেন থেকে একগোছা রুটি নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল। বলল, "আজ থেকে তুই

আর ভুখা থাকবি না। যত ভারতীয় আছে, সব আমাদের ভাই। যখন খুশি এসে রুটি চেয়ে নিস। কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু চুরি করবি না। ইমানদারি দিয়ে রুটি কামালে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু একবার বেইমানির রাস্তায় গেলে আর ফিরতে পারবি না। বুঝেছিস?"

সেই থেকে আমাদের সবার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেল ব্যাটার। ও আমাদের মজুদ খাবারে ভাগ বসাত, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলত না। এমনও হয়েছে, সুবেদার খান তার ভাগের রুটি দিয়ে দিয়েছে ছেলেটাকে। নিজে না খেয়ে সারা রাত জেগে কাটিয়েছে। আমরা কেউ জানতেই পারিনি। ছেলেটা সুবেদার খানকে 'ভাইয়া' ডাকত। গল্প করত।"

"তারপর?" রাঠৌরের গল্পটা ক্যাপ্টেনের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল।

রাঠৌরের গ্লাসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে গ্লাসটা ভরে নিয়ে বলে, "ফির হোনা ক্যায়া থা? ছেলেটা রোজই আসে। রুটি নেয়। গালগল্প করে চলে যায়। খবর দিয়ে যায় ওর ছোট-ছোট ভাইবোন কত বড় হয়েছে। সুবেদার খান খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। লোকটার নিজের ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। বহুদিন তাদের মুখ দেখেনি। ছেলেটার গল্প শুনে নিজের ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ত ওর। ছেলেটা খাবারের জন্য ভুখা ছিল, ওদিকে খানভাই নিজের ভালবাসা, লাড— কাউকে দেওয়ার জন্য প্যায়াসা ছিল। ওই কাশ্মীরি ছেলেটা যেন ওর নিজের 'সপুত'ই হয়ে উঠেছিল আস্তে-আস্তে।

এরপর একদিন ছেলেটা চুপচাপ এসে দাঁড়াল। কোনও কথা বলে না। হাতে মুঠো করে কী যেন ধরে আছে। খানভাই বলল, "কী রে ব্যাটা, রুটি নিবি?"

সে মাথা নাড়ল, "না। রুটি দরকার নেই। ওরা আমাকে অনেক রুটি দেবে বলেছে।"

খানভাই অবাক, "কারা?"

ছেলেটা বলল, "সে আছে। ওরা বলল তোমাকে এটা দিতে। তাহলেই ওরা আমায় অনেক রুটি দেবে বলেছে। বস্তা বস্তা রুটি।"

"কী জিনিস? দেখি।"

সে হাত খুলল। সে দিকে তাকিয়েই খানভাইয়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা আস্ত গ্রেনেড। মুখ খোলা। সেফটি ক্লিপ নেই।

রাঠৌর একটু থামল। ক্যাপ্টেন দত্তা রুদ্ধশ্বাসে শুনে চলেছেন। তাঁর মুখের দিকে আলতো দৃষ্টিপাত করে বলল রাঠৌর, "একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। আমরা বাইরে ছিলাম বলে বেঁচে গেলাম। কিন্তু যারা ভিতরে ছিল, কেউ বাঁচেনি। খানভাইয়ের কিছু করার ছিল না। গ্রেনেড তার কাজ করে দিয়েছে। যখন আমরা ছুটে গেলাম, তখন খানভাই আর ছিল না। ছিল শুধু ধোঁয়া... ধুঁয়া হি ধুঁয়া।"

ক্যাপ্টেন দত্তা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, রাঠৌরের গলা বুজে এসেছে। পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল আগুনের ফুলকি। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ওরা দাবি করে কাশ্মীরকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র করবে। ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে জিহাদ করছে সালোঁ। কিন্তু সেদিন যারা মারা গিয়েছিল তাদের কারওর সারনেম রাঠৌর, ভার্মা বা দত্তা ছিল না। আসিফ, খালেদ, হোসেন বা খানভাই কোন মজহবের লোক স্যার? আমি জানি না ওদের ধর্ম কী ছিল। শুধু এইটুকু জানি, ওরা আমার ভাই। আর যাদের জন্য, যে বেওকুফ বাচ্চাটার লোভের জন্য ওরা অকালে শেষ হল, আমার চোখের সামনে 'রাখ' হয়ে গেল, তাদের আমি ছাড়ব না।" বলতে-বলতেই বুক টান করে উঠে দাঁড়াল রাঠৌর। উদ্ধত, গর্বিত কণ্ঠে বলে, "আমি মহারাণা প্রতাপের জমিনের লোক। মহারাণা প্রতাপ মৃত্যুর আগেও শত্রুর সঙ্গে আপস করেননি, আমিও করব না। মরব কিংবা মারব। মারব... মারব... ঔর মারব! এটাই ওদের সঠিক ট্রিটমেন্ট।"

ঠক করে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল রাঠৌর। ক্যাপ্টেন দত্তার চোখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টিপাত করে বলল, "এর পরও আপনি ওদের বিশ্বাস করতে বলেন স্যার?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে গটগট করে চলে গেল। ক্যাপ্টেন দত্তা স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন। তাঁর কানে তখনও বাজছে মেজর ভার্মার কথাগুলো—

'ধর্ম সমস্যা নয় দত্তা। মেন প্রবলেম হল পভার্টি।'

একটু রাত হতেই শিশমহলের আলো একটা-একটা করে নিভে গেল। কেউ যেন ফুঁ দিয়ে টুপ-টুপ করে নিভিয়ে দিল একটার পর একটা মোমবাতি। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। সবার ঘরেই তেলের ল্যাম্প জ্বলে। এমন নয় যে, এখানে নদীর অভাব। বরং উলটোটাই। দুরন্ত গতিবেগে ছুটে চলা পাহাড়ি নদীর সংখ্যা জলবিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট। চেনাব, দোড়া, দ্রাস, ইন্দাস, রাভি, শ্যোক, শিঙ্গো, তাওয়াই ইত্যাদি নদীগুলোকেও দরকার নেই, শুধু লিডার বা ঝিলম থেকেই যা জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়, জম্মু-কাশ্মীরের জন্য তা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি।

কিন্তু সেই জলবিদ্যুৎ কাশ্মীরের গরিব মানুষগুলোর কপালে জোটে না। যাদের ক্ষমতা আছে, তারাও পুরোপুরি ইলেকট্রিসিটি পায় না। মধ্যরাত থেকেই লোডশেডিং শুরু হয়। আর কারেন্ট আসে সকাল ছ'টায়। অবশ্য আর্মি ব্যারাকে সব সময়ই আলো জ্বলে। ইলেকট্রিসিটির অর্ধেকই খেয়ে বসে থাকে আর্মি। বাকি অর্ধেকের সামান্য অংশই পায় সাধারণ মানুষ। বাকিটা পঞ্জাবে বা বিহারে বিক্রি করে দেয় সরকার। তা নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে যথেষ্টই রাগ আছে।

ক্যাপ্টেন দত্তা চুপচাপ আর্মিবোটে বসে সিগারেট টানছিলেন। এখন কোনও আওয়াজ নেই শিশমহলে। একদম নীরব। অন্ধকারে একটু চোখে সয়ে যেতেই শিশমহলের ছায়া প্রকট হয়ে উঠল। একের পর এক কাঠের বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে গুলজার আহমেদের বাড়ি। খবর বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছে। লোকটার উপর সন্দেহ আছে। তাই পালা করে তার বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে আর্মি। শুধু গুলজার আহমেদের বাড়িই নয়, গোটা শিশমহলকেই এই মুহূর্তে ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী। সবার হাতেই ওয়াকিটকি। মেজর ভার্মার ইনফর্মারের খবর অবহেলা করা যায় না। তাই এই ব্যবস্থা। দফায়-দফায় প্রহরা দিচ্ছে সবাই। ক্যাপ্টেন দত্তা ওয়াকিটকি তুলে নিলেন, "হ্যালো, শের শাহ স্পিকিং। এনি অ্যাকশন নেপোলিয়ন?"

বলাই বাহুল্য 'নেপোলিয়ন'টা কোড নেম। ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, "নো, শের শাহ।"

'শের শাহ' ক্যাপ্টেন দত্তার কোড নেম। মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল তাঁর। আর্মির জওয়ানদের যার যেটা ধর্ম নয়, তাকে সেই ধর্মের কোড নেমই দেওয়া হয়েছে। যেমন এই মুহূর্তে পাশে যে-ছেলেটি বসে আছে তার কোড নেম 'মহারাণা' কিন্তু সে মুসলিম। হেসেই বললেন, "কোই হলচল?"

"নহিঁ শের শাহ।"

"ওকে নজরে রাখো নেপোলিয়ন।"

কাল ক্যাপ্টেন এদিকে ছিলেন না। অন্য দিকে রাউন্ড দিচ্ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে শিশমহলে পাহারা দিচ্ছেন, সেদিন থেকে এক-একটা রাত যেন এক-একটা গল্প বলে যাচ্ছে। যেমন কাল রাত্রের ঘটনাটাই। নিজের চোখে যা দেখেছেন, তা কাউকে বলা যায় না। সহ্য করাও যায় না। এই ঘটনার সাক্ষী শুধু তাঁর সঙ্গী 'মহারাণা'।

কালকেও এমন ভাবেই ওঁৎ পেতে বসেছিলেন তাঁরা। অবিকল আজকের মতোই নিস্তব্ধ পরিবেশ। অনেক দূরে সারি-সারি স্ট্রিটলাইটের পিঙ্গল আলো দেখা যায়। মাঝেমধ্যেই হাওয়ায় দুলে-দুলে উঠছে বাঁশবন। সরসর করে পাতা নড়ার আওয়াজ শোনা যায়। ঘাসবনে মাঝেমাঝেই জলজ প্রাণীর খলবল। শিশমহলের জল ক্রমাগতই যেন ঠান্ডা হচ্ছে। ভিজে ধোঁয়া হিমেল শিস নিয়ে উঠে আসছে জল থেকে। গরম জ্যাকেট পরে থাকা সত্ত্বেও শীত করছিল ক্যাপ্টেনের। সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাবেন, হঠাৎই হুপহুপ শব্দ। কেউ যেন সাঁতার কেটে

কোথাও যাচ্ছে।

তিনি বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে জোরালো টর্চ দানবের চোখের মতো দপ করে জ্বলে উঠল শব্দের উৎসের দিকে। ভারী গলায় বললেন, "হু-স্ট!"

আলোর বৃত্তের মধ্যে তখন দুই কিশোরী ধরা পড়ে গিয়েছে। দুই সদ্যমুকুলিত নিষ্পাপ নারী। না:, নারী বললে ভুল হয়। নারীত্ব হয়তো আসেনি। প্যাকাটির মতো শরীর নারীর সহজাত বাঁক এখনও নেয়নি তবে 'নেব-নেব' করছে। আকস্মিক চোখে আলো এসে পড়ায় স্তম্ভিত, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"কে রে?" 'মহারাণা' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাচ্ছিস?"

দুই মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। কী করবে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। গায়ে নিতান্তই পাতলা একটা সালোয়ার কামিজ। ওড়নাটা কোমরে বাঁধা। বেচারিরা শীতে 'হি হি' করে কাঁপছে। ক্যাপ্টেন দত্তা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিলেন ওদের। মেয়ে দুটো এই কালঠান্ডা জলে নেমেছে! তিনি নিজে গরম জামায় আপাদমস্তক ঢেকে বোটে বসে আছেন, তা সত্ত্বেও কাঁপুনি ধরছে। আর এই দুটো মেয়ে পাতলা সালোয়ার পরে জলে ডুবে বসে আছে। নিউমোনিয়াতেই মরে যাবে যে!

"স্যার," 'মহারাণা' জানায়, "ওদের ওড়নায় কিছু বাঁধা আছে। কিছু স্মাগলিং করছে নির্ঘাত।"

ক্যাপ্টেন এবার ভাল করে মেয়ে দুটোকে দেখলেন। সত্যিই ওদের কোমরে শক্ত করে বাঁধা ওড়নার নিচে কিছু একটা উঁচু হয়ে আছে। কী নিয়ে যাচ্ছে? তাও এমন চুপিচুপি! গম্ভীর স্বরে বললেন, "কী নিয়ে যাচ্ছে? মহারাণা, দেখো জরা।"

"ইয়েস স্যার।"

'মহারাণা' ওদের ওড়নাদুটো খুলে দুটো বোতল বের করে আনে। আপাতদৃষ্টিতে দুটো নিরীহ বোতল হলেও কিছু বলা যায় না! এমন নিরীহ বোতলের মধ্যেই থাকে 'মলোটোভ ককটেল'-এর মতো মারাত্মক বিস্ফোরক! ক্যাপ্টেন দত্তা সসন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ফের একবার ওদের মাপলেন। জিহাদি নাকি? কিছুই বলা যায় না!

"কুটচি শরাব স্যার," মহারাণা ততক্ষণে বোতল খুলে ভিতরের তরল পদার্থটাকে শুঁকে দেখেছে। মুখ বিকৃত করে বলে, "দেশি দারু। বেআইনি চিজ নিয়ে যাচ্ছে সা-লি! কাশ্মীরের বাজারে ব্যান্‌ড! ধরবো নাকি দুটোকে?"

ধরার আগেই মেয়েদুটো হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরেছে ক্যাপ্টেন দত্তার পা! তিনি অপ্রস্তুত। বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এ কী! কী করছ তোমরা?"

"আমাদের ধরবেন না সাব," ওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট মেয়েটি কেঁদে ফেলল, "আমাদের ধরলে মারা পড়ে যাব!"

"মানে!"

অন্য মেয়েটি এবার মুখ খুলল, "ঘরে চাওয়াল-বাজরা কিছু নেই সাব। দো দিন হল ভুখা রয়েছি। কোলের ভাইটা দুধও পায়নি। দু'দিন আটা জলে গুলে খাইয়েছে মাই। কিন্তু আজ আটাও নেই!"

বিহ্বল হয়ে ওর কথা শুনছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। ছোট মেয়েটা এবার ভেউভেউ করে কেঁদে উঠে বলে, "এক ট্যুরিস্ট সাহিব কুটচি শরাবের ফরমায়েশ করেছেন। বলেছিলেন, দু'বোতল দিতে পারলে 'সও'রুপিয়া দেবেন। ওঁর লোক এসে দাঁড়াবে ন'নম্বর শিকারা ঘাটে। তাই আমি আর বোন চুপিচুপি বোতল নিয়ে যাচ্ছি। যাতে কেউ নজর না করে, তাই মাঝরাতে সাঁতার কেটে যাচ্ছি। নাও নিতেও পারিনি।"

"তোরা জানিস এই মদ কাশ্মীরে ব্যান্‌ড?" মহারাণা এক পেল্লায় ধমক দেয়, "কুটচি শরাব খেয়ে করাচিতে কত লোক মারা গিয়েছে জানিস? তাও এই নিয়ে যাচ্ছিস!"

"কী করব সাব?" জলভরা চোখদুটো তুলে বলে বড় মেয়েটা, "আমরা অনপঢ়' লোক। কিন্তু যিনি অর্ডার করেছেন, তিনি তো পড়াশোনা জানা। তিনি কি জানেন না 'কুটচি শরাব' খাওয়া বেআইনি? যদি জেনেশুনে তিনি বিষ অর্ডার করেন, তবে আমরা কী করব? আমাদের তো পাপী পেটের সওয়াল!"

"সালি! ওকিলের মতো জবান লড়াচ্ছিস। ট্যুরিস্টকে কুটচি শরাব পিলাচ্ছিস! যদি মরে যায়, তবে কী হবে? মারব এক ঝাপড়!" 'মহারাণা' প্রায় তেড়ে মারতেই যায়। এবার ভয়ে বড় মেয়েটাও কেঁদে ফেলেছে, "সাব! আপনাদেরও নয় খুশ করে দেব। যদি চান, আপনাকেও খাতির করব। যখন, যেখানে বলবেন, দুই বোন জিসম নিয়ে খাতিরদারি করতে পৌঁছে যাব। বা চাইলে এখনই... এখানে... যা চাইবেন দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওই 'সও' রুপিয়া না পেলে ঘরে চুলা জ্বলবে না। সবাই না খেয়ে থাকবে হুজুর। আমাদের ধরবেন না।"

ধরণী দ্বিধা হও! তরুণ ক্যাপ্টেনের কর্ণমূল রক্তাভ হয়ে যায়। বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। বাকশক্তিরহিত হয়ে ভাবছেন, এখনও দুধের দাঁত পড়েনি মেয়েদুটোর। এখনই কী সব বলছে!

'মহারাণা' ফের তেড়ে যাচ্ছিল। তাকে ইশারায় থামালেন ক্যাপ্টেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের টর্চ নিভিয়ে দিয়েছেন তিনি, "এখান থেকে নৌকো সরিয়ে নাও মহারাণা!"

মহারাণা থেমে গেল। তার মুখভঙ্গি বলে দেয়, সে বিস্মিত হয়েছে। তবু বিনা বাক্যব্যয়ে চুপচাপ নৌকোটাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে থামাল। সে জানে সিনিয়র অফিসারের অর্ডার চুপচাপ তামিল করতে হয়। তবু কতকটা যেন আপনমনে বলল, "কুটচি শরাব বিষাক্ত হতে পারে। মেয়েদুটো বেআইনি কাজ করছে স্যার।"

"জানি মহারাণা, আবার না-ও হতে পারে," তিনি আত্মমগ্ন স্বরে বলেছিলেন, "আইনের উপরেও কিছু আছে। আর আইনি-বেআইনি তখনই বিচার করা যাবে, যখন আমরা তেমন কিছু হতে দেখব। আমি তো কিছু দেখিনি। তুমি কি দেখেছ?"

'মহারাণা' নির্বিবাদে উত্তর দিয়েছিল, "নো স্যার।"

শীত মেয়েদুটোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাঠৌরের গল্পটা জানা ছিল না। জানলে হয়তো অত সহজে ওদের ছেড়ে দিতেন না। অন্তত একবার ভেবে দেখতেন, যে মেয়েদুটো পঞ্চাশ-একশো টাকার বিনিময়ে মরিয়া হয়ে 'কুটচি শরাবের' মতো নিষিদ্ধ জিনিস ঝুঁকি নিয়ে বোতলে করে নিয়ে যাচ্ছে, আরও কিছু টাকা পেলে 'মলোটোভ ককটেল'-এর বোতলও নিয়ে যেতে পারে কিনা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন দত্তা। অবিশ্বাস কী জিনিস।

ষোলো

"তারপর?"

প্রফেসরসাহেব মৃদু হাসলেন। তাঁর চশমার কাচে খেলা করছে উন্মত্ত সবজে লিডারের ছায়া। পাহাড়ের মাথায় ঘনিয়ে এসেছে সাদা মেঘের দল। হাওয়ায় সবুজ পাইনবনের সারি একসঙ্গে মাথা নাড়িয়ে চলেছে। সেদিকেই অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে বললেন তিনি, "১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা সহদেবের শাসনকালে ইসলাম ধর্ম প্রথম কাশ্মীরে পদার্পণ করে। তুর্কিস্তানের এক সুফি সাধক, বুলবুল শাহ্-র মাধ্যমে আরও একটি নতুন ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হল কাশ্মীর। এই ধর্ম এরপর ১৩৩৯ সাল থেকে সুলতানী আমল, মোঘল ও আফগান শাসনের সময় পেরিয়ে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করে চলল। এর মধ্যেই নিষ্ঠুর মুসলিম শাসকেরা কখনও মন্দির ভেঙেচুরে একসা করেছেন, কখনও ইসলাম ধর্মেরই অন্তর্গত শিয়া-সুন্নি দুই মতবাদ নিজেদের মধ্যেই মারপিট করেছে। আবার কখনও উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী মরাঠারা মসজিদ লুঠ করে চলেছে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই মরাঠাদের অত্যাচার বাড়ছিল। ১৭৫৩ সালে আহমেদ শাহ্ আবদালির আগমন, এবং আফগান কুলের শুরু। তার মধ্যেই চলছে মুহুর্মুহু বর্গী আক্রমণ। ১৭৫৪ থেকে ১৭৫৬ অবধি মরাঠারা নির্মমভাবে লুঠপাট করে চলেছে সর্বত্র। অবশেষে ১৭৬১ সালে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আহমেদ শাহ আবদালির হাতে পরাজিত হলেন বালাজি বাজি রাও। কট্টর হিন্দুত্বের

উপদ্রব কমল বটে, কিন্তু আফগান শাসনের ধর্মান্ধ নারকীয় অত্যাচার তখনও অপ্রতিহত!"

প্রোফেসরসাব মুচকি হেসে বলেন, "এক পার্শি কবি বলেছিলেন, 'সর বুরিদাঁ পেশ ইন সঙ্গিন দিলিয়াসি গুল চিদান অস্ত।' ওদের কাছে বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ে নেওয়া, আর মানুষের মুন্ডু কেটে নেওয়া, একই ব্যাপার।"

স্বরাজ বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিল কাশ্মীরের ইতিহাস। সে নিজে কাশ্মীরের বাসিন্দা হয়েও এত কথা জানত না। অথচ...

...বহু বছর আগের সেই শিশু স্বরাজ সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তারপর?"

তিনি হাসলেন, "তারপর?

"স্বয়ং হাক্সব্যান্ড বলেছিলেন, 'The Sikhs, who succeeded the Afgans were not so barbarically cruel, but they were hard and tough master.' ১৮১৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। কশ্যপমুনি, গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য ও হজরত মহম্মদের দেশে এবার গুরুনানকও এসে পড়লেন। 'ওয়াহেগুরু দি ফতেহ' হল। গুরুনানক এলেন, শান্ত-ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেন, এবং মানুষের হৃদয় জয় করলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব ও ইসলামের পর এবার শিখ। এই ধর্মও যথারীতি মিশে গেল কাশ্মীরের মাটিতে। কাশ্মীরের রাজধানীর নাম মুসলিম পিরিয়ডে 'কাশ্মীর' ছিল। শিখ শাসকেরা রাজধানীর নাম বদলে রাখলেন শ্রীনগর।

"এর পরে অবশ্য আবার হিন্দুধর্মের তথাকথিত রংবাজি শুরু হয়ে গেল ডোগরাদের হাত ধরে। ১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের শাসক হলেন মহারাজা গুলাব সিংহ ডোগরা। সেদিন থেকে ১৯৪৭ অবধি রাজা হরি সিংহ ডোগরার সময়ে এসে শেষ হয় রাজতন্ত্র। রাজা হরি সিংহ ডোগরার ধর্ম কী ছিল? তিনি নিজে জানিয়েছিলেন, 'জাস্টিস।'

"এরপর 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির ধাক্কায় কাশ্মীর অশান্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ— প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি জাতির হাতে উঠে আসে তরোয়াল।

"সেই থেকে অশান্তির শুরু। সেই থেকে লোক জানের কথা তোলে। 'কৌম'-এর কথা বলে। কোন কৌমে সাধারণ মানুষের প্রাণ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে? কোন ধর্মগ্রন্থ হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়?"

স্বরাজ আকুলস্বরে প্রশ্ন করে, "প্রফেসরসাব, লালার ধর্ম তবে কী? লালার ধর্ম আর আমার ধর্ম কি এক?"

প্রফেসরসাহেব উঠে দাঁড়ালেন। অদ্ভুত একটা আলো তাঁকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সূর্যের আলোর মতোই ভাস্বর এক সোনালি আলো দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার পিছনেই দেখা যাচ্ছে রামধনুর আভাস। কিন্তু আশ্চর্য, রংগুলো যেন একভাবে ছড়িয়ে নেই! বরং ধাপে-ধাপে যেন সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে নিচের দিকে।

"প্রফেসরসাব!" নিরুপায়ের মতো ডাকল সে, "আপনি সব সময় ফাঁকি দিয়ে চলে যান। আমার সওয়ালের জবাবটা দিয়ে যান। আমার ধর্ম কী? লালার ধর্ম কী?"

প্রফেসরসাহেব হেসে ফিরে তাকালেন, "ধর্ম কাকে বলে ভাই? যে যেমন কাজ করে, সেটাই তার ধর্ম। যখন একটা শিশু জন্ম নেয়, তখন তার কোনও ধর্ম থাকে না। পরে সে নিজের ধর্ম গ্রহণ করে। লালা ধ্বংসের ধর্ম বেছে নিয়েছে। তুমি কোন ধর্ম বাছবে সেটা তোমার কর্মের উপর নির্ভর করে। বুঝেছ?"

ঘুমটা ফের ভেঙে গেল তার। ঘুম ভাঙাই স্বাভাবিক। একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে কানের কাছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল স্বরাজ। হাতের কাছেই তেলের বাতি আর দেশলাই ছিল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখল, বুড়োবুড়িদের ভিড়ে একজন কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। এই সেই বুড়ো যার প্রায়ই গিফট পাওয়ার শখ হয়। হাত-পা কেমন বেঁকে গিয়েছে। মুখে কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু বলতে পারছে না। এ লক্ষণ তার চেনা। পক্ষাঘাত! সে প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ। আজ যে ভরতও বাড়ি নেই! ট্যুরিস্টদের নিয়ে লম্বা ট্যুরে গিয়েছে। তিনদিনের আগে ফিরবে না।

"দাদাজি! ও দাদাজি! কী হল?" চিৎকার করে বুড়োকে ভাল করে শোওয়াল স্বরাজ। সময় নেই, একদম সময় নেই। এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে গুরপ্রীতকে ডাকে।

"ভাবিজি! ভা-বি-জি!"

গুরপ্রীত সারাদিনের ধকলের পর সবে দু'চোখের পাতা এক করেছিল। স্বরাজের আর্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসল, "কী হৈয়া! কী হল?"

"ভা-বি-জি!" স্বরাজ বলল, "চেতি হি আ! হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি এসো!"

"হায় রব্বা! কী হৈয়া!" স্খলিত জামাকাপড় দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিয়ে তড়বড় করে নেমে এল গুরপ্রীত। ডাকাডাকিতে উঠে পড়েছে কন্নু। সেও মায়ের পিছন-পিছন নেমে আসে। বৃদ্ধ তখনও কঁকিয়ে যাচ্ছে। গলা দিয়ে অস্ফুট ঘড়ঘড় আওয়াজটা নিস্তেজ হলেও স্পষ্ট। তার অবস্থা দেখে কী করবে প্রথমে বুঝে পেল না গুরপ্রীত। ঘরে ভরতও নেই। এমন সময়েই এই সর্বনাশ ঘটতে হল। তার মাথা কাজ করছিল না। তবু কোনও মতে বলল, "ভাই, গুলজার ভাইজান ঘরে আছে কিনা জানো? সকালে ট্যুরিস্টপার্টির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাতে ফিরেছে কি?"

স্বরাজ মাথা নাড়ল। একটু আগেই গুলজার আহমেদকে আরিফার ঘরে ঢুকতে দেখেছে। দৃশ্যটা না দেখলেই ভাল হত। কিন্তু চোখে পড়ে গিয়েছে।

ঘুম আসছিল না বলে বারান্দায় পায়চারি করছিল স্বরাজ। হঠাৎ একটা মোমবাতির আলো দেখে সচকিত হয়ে উঠল। গুলজারের হাতে মোমবাতি। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছন-পিছন 'রণং দেহি' নার্গিস। ভাইজান পিছন ফিরে দেখলও না তাকে। বরং পাশের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে নরম আদরের সুরে ডাকল, "আরিফা... আরিফা..."

এরপর স্বরাজ যা দেখল তাতে চক্ষু চড়কগাছ! এক নগ্নিকা বিদ্যুৎগতিতে বাইরে বেরিয়ে এল। স্বরাজ লজ্জায় লাল! চোখ বুজবে কিনা ভাবছিল। একটা সুতোও নেই আরিফার গায়ে। বাজপাখির মতো দু'হাতে এমনভাবে গুলজারকে খামচে ধরে ছোঁ মেরে ঘরে ঢুকিয়ে নিল যে, আর একটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল লোকটা। কানে এল তার নরম, মৃদু কণ্ঠস্বর, "আরামসে। আস্তে আরিফা। আমি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না। এসেছি তো।"

তারপরই সশব্দে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ! জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে ফুঁসছিল নার্গিস। হতভম্ব হয়ে ভাবছিল স্বরাজ— এটা ঠিক কী হল...

"এই কন্নু!" গুরপ্রীত ভয়ার্ত গলায় বলে, "দ্যাখ তো, গুলজারচাচা ঘরে আছে কিনা।"

"ওকে দেখতে হবে না," স্বরাজ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এবার সজাগ হয়ে উত্তর দেয়, "আছে। আমি একটু আগেই দেখেছি।"

"তাহলে একটু ডেকে আনবে ভাই?" গুরপ্রীত হাতজোড় করেছে, "বড় উপকার হয় তাহলে।"

"আহো!"

দ্রুত নৌকোয় উঠে গুলজার আহমেদের বাড়ির সামনে পৌঁছে যায় স্বরাজ। ইতিমধ্যেই চিৎকার-চেঁচামেচিতে শিশমহলের অনেক ঘরেই আলো জ্বলে উঠেছে। অনেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলে। আফসানাও কৌতূহলী দৃষ্টিতে উঁকি মারছিল। স্বরাজকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কী হল ভাই?"

"দাদাজিকে লাকওয়া মেরেছে।"

কোনও মতে উত্তরটা ছুড়ে দিয়ে গুলজার আহমেদের বাড়িতে উঠে পড়ল স্বরাজ। ওদের বাড়ি এখন অন্ধকার। নার্গিস সম্ভবত শুয়ে পড়েছে। স্বরাজ ব্যাকুলভাবে আরিফার ঘরের দরজায় করাঘাত করতে করতে

ডাকে, "গুলজারভাই... ভাইজান। দরজা খোলো।"

বার দুই তিন ধাক্কা মারার পর ভিতর থেকে গুলজারের নিদ্রাজড়িত বিরক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কে? কী হয়েছে?"

স্বরাজ ঢোঁক গেলে। এই লোকটাকে বড় ভয় পায় সে। যত কম মুখোমুখি হওয়া যায়, তত ভাল। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সামনাসামনি দাঁড়াতেই হবে তাকে। আর কোনও উপায় নেই।

সে ভয়ে ভয়েই উত্তর দেয়, "আমি স্বরাজ। দাদাজিকে লাকওয়া মেরেছে।"

খুট করে দরজা খোলার শব্দ। মুহূর্তের ভগ্নাংশে দরজার পিছনে আবির্ভূত হল গুলজার আহমেদ। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখ, উস্কোখুস্কো চুল, অবিন্যস্ত পাঞ্জাবি। বিরক্ত হয়ে বলে, "এই রাতদুপুরে কী তামাশা করছ? তোমার দাদাজি আবার কোথা থেকে আমদানি হল?"

"আমার না। ভরতভাইয়ার।" স্বরাজ কোনওমতে বলে, "তাড়াতাড়ি চলুন। গুরপ্রীতভাবি আপনাকে ডেকেছে।"

এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হল গুলজারের। বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত না হয়ে বলল, "তুমি যাও। আমি একটু পরেই আসছি।"

"লেকিন ভাইজান..."

"কোই লেকিন নহিঁ।" নিস্পৃহ, নিরাসক্ত স্বরে উত্তর এল, "তোমার চেঁচামেচিতে আরিফার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। যতক্ষণ ও জেগে থাকবে, আমায় ছাড়বে না। তুমি এগোও, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে-ভুলিয়ে-ভালিয়ে আসছি।"

"দেরি হয়ে যাবে যে।"

গুলজার শীতল দৃষ্টিক্ষেপ করে, "দেরি হলে বড়জোর কী হবে? বুড়ো মরে যাবে। এমনিতেই ওদের মরার বয়স হয়েছে। প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি বেঁচেছে। এবার মানে-মানে গেলে কারওর উপকার ছাড়া কোনও ক্ষতি হবে না। ভরতের তো ক্ষতি হওয়ার প্রশ্নই নেই। তুমি যাও, আমি আসছি।"

এ তো নির্দেশ নয়, আদেশ। স্বরাজ আর লোকটার সামনে দাঁড়ানোর সাহস দেখাল না। তার মনে আবার একটা প্রশ্ন খলবলিয়ে উঠল। এ লোকটা ঠিক কী? ওর হৃদয় বলে আদৌ কি কিছু আছে? থাকলেও হয়তো পাথরে গড়া। কী অবলীলায়-ই না বলে দিল, 'দেরি হলে বড়জোর কী হবে? বুড়ো মরে যাবে।'

গুরপ্রীত তখন মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বুড়ো এখন অনেকটাই নিস্তেজ। আপনমনেই কী সব ভুলভাল বকে যাচ্ছে কে জানে। অন্যান্য বুড়ো-বুড়িরা অবশ্য নিরাসক্তের মতোই ঘটনাটা দেখতে ব্যস্ত। বারান্দায় তখন লোক ভেঙে পড়েছে। কেউ বলছে 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও', কেউ বলছে 'বাঁচার আশা কম', কেউ নুন-জল খাওয়াতে বলছে তো কেউ মরার আগে মুখে শেষ জল দিতে বলছে। গুরপ্রীত এর মধ্যে কোনটা করবে বুঝে উঠতে না পেরে অসহায়ের মতো খালি কেঁদেই যাচ্ছে।

আফসানা গুরপ্রীতের কাছে বসেছিল। তার চোখদুটো জনগণের ভিড়ে বিশেষ একজনকে খুঁজছিল। ওই একটি লোক এলেই সে এবং গুরপ্রীত ভরসা পায়। বাকিরা স্রেফ জ্ঞানই দেবে, কাজের কাজ কিছু করবে না। স্বরাজকে দেখে দু'জনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

"ভাইজান আসছে।" স্বরাজ একটু অপ্রস্তুত হয়েই উত্তর দেয়। বলে তো দিল, আসছে। কখন আসবে কে জানে। আদৌ আসবে কি না— তাও বলা মুশকিল। সবই তেনার মর্জি।

"চিন্তা কোরো না দিদি," আফসানা সান্ত্বনা দেয়, "সব ঠিক হয়ে যাবে। এমনিতেই তো উনি অসুস্থই থাকতেন।"

"না রে। সে তো ছোটামোটা বিমারি। বুখার কিংবা ছুখাম। তার থেকে বড় কিছু হয়নি," গুরপ্রীত আঁচলে মুখ চেপে বলল, "আর নসিব দ্যাখ। এমন সময়েই বিমার হতে হল। ঘরে কোনও মর্দ নেই। বুঝতে পারছি না কী করব।"

ভিড়ের পিছন থেকে পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উত্তর এল, "ঘরে মর্দ নেই কে বলল? যাকে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলে, তিনি পর্দানশিন বেগম সাহিবা নাকি!"

স্বরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক, এসেছে লোকটা। কিন্তু মন্তব্য শুনে গা জ্বলে গেল। আফসানা তার চোখমুখের অসন্তোষ বুঝতে পেরে চোখের ইশারা করে। অর্থাৎ লোকটা এরকমই তেড়িয়া। চুপচাপ থাকো।

"কী ব্যাপার?" গুলজার বিরক্ত হয়ে অবাঞ্ছিত ভিড়টার দিকে তাকায়, "সিনেমা হচ্ছে?"

ব্যস। ওইটুকুই যথেষ্ট। সবাই সুড়সুড় করে কেটে পড়ল।

"ও-যে দাদাজি।" সে এবার বুড়োর দিকে মুখ ফিরিয়েছে, "যমকে আর পরেশান না করলে চলছে না তোমার? সেক্ষুরি তো মেরে দিয়েছ, এবার অন্তত প্যাভিলিয়নে ফেরো।"

বুড়ো এতক্ষণ কেতরে পড়ে ছিল। এই জাতীয় ডায়লগ শুনে উঠে বসার চেষ্টা করতে-করতে ধারাল গলায় খঁউখঁউ করে বলে ওঠে, "ফিটে মুহ তেরি। অনামুখো কোথাকার! তুই মর, তোর বাপ মরুক। আমি মরছি না। এখনও ভরতের শাদি দেখা বাকি আছে। ভরতের নতুন বউয়ের মুখ দেখে যাব।"

স্বরাজ হাঁ। ভরতের শাদি দেখবে মানে। ভরত কো কোনকালেই বিয়ে করেছে। এখন তারই মেয়ের বিয়ের কথা চলছে। আর বুড়ো বলে কি না ভরতের বিয়ে দেখবে। সবই ভুলে মেরে দিয়েছে।

"ওই আশাতেই বিড়ি বাঁধো বসে।" গুলজার ভুরু কুঁচকে বুড়োকে টিপেটুপে চেক করছে। তার নাড়ি দেখতে-দেখতে বলল, "তোমার জন্য ভরত আর কতগুলো বিয়ে করবে? জম্মু-তাওয়াই ট্রেনের মতো টিকটিকিয়ে লেট-এ চলা এবার বন্ধ করো। ওই দ্যাখো, তোমার ভরতের 'লুগাই।' নতুন 'বিবি' আর এ জন্মে কপালে নেই ভরতের। শুধু এ জন্মে কেন! অগলি সাত জন্মোঁ তক ইয়েহি মিলনেওয়ালি হ্যায় উসকো। আট নম্বরে যদি নতুন 'লুগাই' মেলে। তত দিন টেকার সাদ্দিশ করছ? তুমি ইনসান না কিছুয়া?"

পঞ্চশরের তুলনাটা মোটেই ভাল লাগেনি বুড়োর। যতটা সম্ভব দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "কছুয়া বোলা মৈনু? মুখশোড়া লম্বু! সা-লে কুত্তেয়া, টিট্টা বন্দর, খোতা কহঁহ্যা।"

গুলজার দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার গুরপ্রীতের দিকে তাকায়, "দেখেছ? কেমন একসঙ্গে কুত্তা, বাঁদর, গাধা সব বলল। রোয়াব দেখো একবার। যমও ভয়ে ভেগে যাবে দেখলে। মালটা এখনও অনেক দিন জ্বালাবে তোমাদের। এখনই মরছে না।"

গুরপ্রীত এত দুঃখেও হেসে ফেলেছে। কোনও মতে চোখ মুছে বলল, "কন্নুকে বলব নাও বের করতে?"

"বাচ্চাটাকে এর মধ্যে টেনো না," সে স্বরাজের দিকে তাকায়, "ও আছে কী করতে?"

"আমি যাব?" আফসানা উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, "আমরা গেলে হয়তো সুবিধা হবে।"

গুলজার নিস্পৃহ মুখেই ধমক দেয়, "বাইরে আর্মি টহল দিচ্ছে। মেয়েদের না বেরনোই ভাল। মেয়ে দেখলে ওদের মাথার ঠিক থাকে না। তুই বরং আরিফার কাছে যা। আজ রাতে আমাদের আর ফেরা হবে না শায়দ। চলো, কাটরাসাহেব। তুমি আর আমিই কাফি।"

"ওকে নিয়ে যাবে?" গুরপ্রীত দ্বিধাগ্রস্ত, "কিন্তু ও মেহমান..."

"মেহমান তো কী?" তার মসৃণ কপালে ভাঁজ, "মেহমান বলে এত বড় বিপদেও বসে থাকবে? এখন বুঝেছি, তোরা মেহমানকে 'উপরওয়ালা' বলিস কেন। সা-লে দুটোই সমান। ভাল করে খাওয়াও-দাওয়াও, পুজো করো-আরতি উতারো, কিন্তু দরকারের সময় শত মাথা খুঁড়লেও একটাও নড়বে চড়বে না।"

আর্মির নাম শুনেই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল স্বরাজের। আর্মি নজরদারি করছে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? এখন বেরোবার কথা ভাবতেই তার বুক দুরুদুরু করছে। কিন্তু গুলজার আহমেদের কথাগুলো শোনার পর আর বসেও থাকা যায় না। রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তীব্র স্বরে বলল, "চলুন যাচ্ছি।"

গুলজার মুচকি হাসল, "তুমি নৌকো বের করো। আমি বুড়োকে

নামাচ্ছি।"

"আপনি একা পারবেন।" স্বরাজ বিস্মিত। ভরতের দাদাজি মোটেই কৃশকায় খুনখুনে সিড়িঙ্গে চেহারার লোক নয়। বরং রীতিমতো খানদানি পঞ্জাবির লম্বাচওড়া চেহারা তার। এই বুড়োর অর্ধেক অনড় ভারী শরীরটা একাই নামাবে। বলে কী।

"কেন? আমি কমসিন কলি নাকি?"

উত্তর শুনে আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না স্বরাজ। এই লোকটার টিপ্পনী শুনে মাথা ঠান্ডা রাখা দুষ্কর। যেতে-যেতেই শুনল গুরপ্রীত বলছে, "ভাইজান, ও ছেলেটাকে অমন তিখি-তিখি বলো না। কষ্ট পাবে।"

গুলজ্জার এক ঝটকায় বুড়োকে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, "যার জীবনে শুধু 'মিঠি কা তড়কা' তার 'মিঠি বাত' সহ্য হয় না। বেঁচে থাক আমার তিখি।"

বুড়ো মিনমিন করে বলল, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?"

"বেড়া পার করাতে নিয়ে যাচ্ছি। বুঝেছ?"

ফের হাউ-হাউ করে খিস্তি-খেউড় জুড়ল বৃদ্ধ। ভাবলেশহীন মুখে বুড়োকে ঘাড়ে নিয়েই বাইরে চলে আসে গুলজ্জার। ততক্ষণে স্বরাজ নৌকোটা বারান্দায় লাগিয়েছে।

"তুমি দাদাজিকে ধরে বসো। আমি টানছি।"

স্বরাজের হাতে বৃদ্ধকে তুলে দিল গুলজ্জার। আর একটু হলেই টাল খেয়ে পড়ছিল স্বরাজ। বুড়ো যথেষ্ট ভারী। এই ওজন একাই ঘাড়ে তুলে আনল কী করে লোকটা? মনে-মনে তারিফ না করে পারল না স্বরাজ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার তাকে দেখে নিয়ে দাদাজিকে সামলে বসল স্বরাজ। তাকে নাস্তানাবুদ হতে দেখে গুলজ্জারের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম কৃপা, মুখে কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। স্বরাজের মুখে কোনও কথা নেই। গুলজ্জারও চুপচাপ দাঁড় টেনে চলেছে। ওর মধ্যে আজ পর্যন্ত একটুও কোমলতা দেখল না স্বরাজ। কণ্ঠস্বরে কোনও 'সারেগামা' নেই। সব সময় একই রকম বরফের মতো নিরুত্তাপ গলা। অথচ এই লোকটাই সামনে এসে দাঁড়ালে খুব ভরসা করতে ইচ্ছে করে। ঠিক লালার সমগোত্রীয় বলে মনে হয় না। ডাল লেকের কালো জলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল স্বরাজ। গুলজ্জার আহমেদকে কি বিশ্বাস করা যায়?

"তোমার প্রবলেম কী জানো কাটরাসাব?" কিছুক্ষণ পর গুলজ্জারই মুখ খুলল, "সব সময়ই তুমি ভুল সময়ে, ভুল জায়গায় পৌঁছে যাও। এমন নজারা দেখে ফেলো যা তোমার দেখা উচিত নয়। আজ মাঝরাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী করছিলে?"

ভয়ে সিঁটিয়ে যায় স্বরাজ। কোনওমতে বলল, "আপনি... আপনি কী করে..."

"কী করে দেখলাম?" গুলজ্জার আহমেদ হাসল, "আমার মাথার এদিকে ওদিকে অনেকগুলো চোখ আছে। কে কোথায় কী করছে সব চোখে পড়ে যায়। তবে তোমায় ঠিক দেখিনি। একটা ছায়া দেখেছিলাম ঠিকই, তবে ওটা কে জানতাম না।"

"তবে জানলেন কীভাবে?" ঢোঁক গিলে বলল সে।

"যখন তুমি এসে সিধা বেঝিঝক আরিফার ঘরের দরজায় কড়া নাড়লে, তখনই বুঝেছি।" রহস্যময় হাসিটা গুলজ্জারের ঠোঁটে লেগেই আছে, "অন্য কেউ এলে নার্গিসের ঘরের দরজা ধাক্কাত। রাতে বিবির কাছেই 'শওহর'কে পাওয়া যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি তা করোনি। জানতে আমায় কোথায় পাওয়া যাবে। তার মানে রাতে যে ছায়া আমি দেখেছিলাম, সে তুমিই।"

কী সর্বনাশ! লোকটার ধারাল বুদ্ধি তো গোয়েন্দাকেও হার মানায়। স্বরাজের মনে ফের সেই সন্দেহটা ফিরে এল। গুলজ্জার আহমেদ আসলে কী!

"কী ভাবছ বলো তো? ভাবছ, লোকটার ক্যারেক্টার বলে আদৌ কিছু আছে? যে বোনের সঙ্গে রাত কাটায়, তার ক্যারেক্টারের সবক'টা ক্রু ঢিলা। তাই তো ভাবছিলে এতক্ষণ?"

"না," জোরাল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় স্বরাজ।

"তবে তুমি আমার বিবির চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখো।"

কথাটা বলেই গুলজ্জার সামনের দিকে তাকায়। একটু দূরেই কখনও-কখনও জোনাকির মতো আলো জ্বলে উঠছিল। সে জানে ওগুলো আর্মির টর্চ। ছায়া-ছায়া প্রেক্ষাপটে দেখতে পেল আর্মির বোট এগিয়ে আসছে এদিকেই। ফিসফিস করে বলল, "খাঞ্জা খাঁর বেটারা আসছে। তৈরি থেকো।"

হৃৎপিণ্ডটা ফের চড়াৎ করে উঠে এসেছে স্বরাজের গলার কাছে। আর্মি আসছে। বুকের ভিতরে চাপা একটা কষ্ট। হঠাৎ করেই পেটের যন্ত্রণাটা টের পেল সে। যন্ত্রণাটা ক্রমাগতই যেন বাড়ছে। তীব্র ব্যথা পেট থেকে গলা অবধি দপদপিয়ে উঠে এসে যেন বলতে চাইছে, 'আমি এখানে... আমি এখানে...'

কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র। পরক্ষণেই একটা তীব্র আলো মুখের উপর এসে পড়ল। ওদের নৌকোর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে আর্মির বোট। সঙ্গে সঙ্গেই ভারী কণ্ঠস্বর, 'হ-ল্ট।'

গুলজ্জার হাত তুলে মুখ আড়াল করে। আর্মির একটি জওয়ানকে দেখে চিনতে পারল স্বরাজ। এই লোকটাই তো কদুকে ফেরত দিতে এসেছিল। এই লোকটাই জানতে চেয়েছিল, শিশমহলে নতুন কেউ এসেছে কিনা। এই লোকটাই...

ক্যাপ্টেন দত্তা টর্চের আলোটা গুলজ্জারের মুখের ওপর থেকে সরালেন। শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, "এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? সঙ্গে কে আছে?"

তার চেয়েও শীতল কণ্ঠস্বরে জবাব এল, "ইনকিলাব করতে যাচ্ছি। সঙ্গে জিহাদি রয়েছে সাব।"

একটা অদ্ভুত যান্ত্রিক শব্দ। ক্যাপ্টেন দত্তার সঙ্গীর হাতে বিদ্যুৎগতিতে উঠে এসেছে রাইফেল। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "শালাকে তুলে নেব স্যার?"

স্বরাজের তখন অবস্থা সঙ্গিন। গুলজ্জার তবে জানে সে জিহাদি। আর্মির হাতে তুলে দেবে তাকে। সেই জন্যই ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখনই যদি কেউ ওই বোতামটা টিপে তাকে মুক্তি দিয়ে দিত। অথবা কোনও ডাবে পালানো যেত। আর্মির টর্চের আলো তার মুখ ছুঁয়েছে। জওয়ানের হাতে উদ্যত রাইফেল। হয়তো এখনই গর্জন করে উঠবে। সে দাঁতে দাঁত পিষে শক্ত হয়ে বসে থাকে। পেটের যন্ত্রণাটা যেন তীব্র... আরও তীব্র... তীব্রতম। পৃথিবী দুলছে...

ক্যাপ্টেন দত্তা হাত তুলে সঙ্গীকে বারণ করলেন। তিনি তখনও গুলজ্জার আহমেদকে দেখছেন। লোকটার নার্ভের প্রশংসা করতেই হয়। রাইফেল দেখেও ভয় পায়নি। বরং ওর চোখে আবার সেই দুর্বোধ্য কৌতুক। এই দৃষ্টিটার মানে কিছুতেই বুঝতে পারেন না তিনি। কখনও মনে হয় শুধুই ব্যঙ্গ। কখনও মনে হয় ব্যঙ্গ-কৌতুকের পেছনে হয়তো স্নেহের ঝিলিকও খেলা করছে। ব্যঙ্গ থাকতেই পারে। কিন্তু স্নেহ! অসম্ভব।

টর্চের আলোটা তীব্রভাবে স্বরাজের মুখে পড়েছিল। সে তখন রুদ্ধশ্বাসে পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে আছে। ঘামছে দরদর করে। ক্যাপ্টেন চোখ কুঁচকে তাকেই দেখছেন, "জিহাদিটা কে? তুমি না ও?"

গুলজ্জার হেসে ফেলল, "আমরা কেউ নই। ওর কোলে যে বুড়াকে দেখছেন, সে-ই জিহাদি।"

ক্যাপ্টেনের মাথা গুলিয়ে যায়, "মানে।"

"মানে ওই বুড়ো যমের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে," গুলজ্জার মিটিমিটি হাসে, "একশো বছর পার হয়ে গেছে ওর। দোজখের সরকার টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে, তবু নিজের জমি ছেড়ে নড়ে না। কিছুতেই মরবে না— জিদ ধরে বসে আছে। এবার দোজখ গভর্নমেন্ট কড়া নোটিস জারি করেছে। কিন্তু বুড়ো নাছোড়বান্দা, তাই মওতের বিরুদ্ধে ইনকিলাব চলছে। আমরাও সেই ইনকিলাবে সামিল হয়ে ব্যাটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। একটু পরেই ডাক্তারসাবও আমাদের ইনকিলাবে যোগ দেবেন। জোরদার লড়াই হবে।"

ক্যাপ্টেনের সঙ্গী 'মহারাণা' হাঁ। সে রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন দত্তা কী বলবেন বুঝে পেলেন না। স্বরাজের কোলে শুয়ে থাকা বুড়ো কঁকিয়ে বলে উঠল, "ওরা কে? ডাগদরসাব?"

"না দাদাজি।" গুলজার মুখ টিপে তার পেটেন্ট দুষ্টু হাসি হাসছে, "যমদূত! তোমায় নিতে এসেছে। যাবে?"

"সা-লে চিত্তরচোর্ত, নহি যানা মৈনু।" বুড়োর মুখ দিয়ে তুবড়ির মতো গালাগালির ফোয়ারা ছুটল, "যা, অপনা ব্রাহ নু ... সালা কঞ্জার। মেরা লান তেরা তুয়েহ কি পার্সি। তেরি মা কী তো..."

ক্যাপ্টেন দত্তা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অবাক হয়ে গুলজারের দিকে তাকিয়েছেন। সে ঠোঁট উলটে নিরুপায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকায়। স্লগ ওভারের ব্যাটসম্যান তো প্রত্যেকটা বলই তেড়ে খেলবে। কার কী করার আছে?

"মহারাণা, নৌকো সরাও। ওদের যেতে দাও," তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "যাও। খুদা হাফেজ।"

গুলজার মৃদু হাসল। ওঁর কথার উত্তর না দিয়ে অস্ফুটে বলল, "বনি থি কুছ ইক উসসে, মুদ্দত কে বাদ/ সো ফির বিগড়ি পেহলি হি সোহবত কে বাদ।"

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মীর তকি মীরের শায়রিটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু এই শায়রিগুলোর মধ্য দিয়ে কী বলতে চায় গুলজার? তিনি অপলকে তাকিয়ে থাকেন। ও মানুষ, না আস্ত দুর্বোধ্য শায়রি? বৃদ্ধকে নিয়ে নৌকোটা চলে গেল। আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।

"ছেড়ে দিলেন কেন স্যার?" 'মহারাণা' পাশ থেকে বলল, "আপনাকে খিস্তি দিয়ে গেল, আপনি কিছু বললেন না?"

"কাকে বলব?" তিনি উত্তর দেন, "একটা আধমরা বুড়োকে? যার মরার সময় হয়েছে তাকে ফালতু গালি দিয়ে কী লাভ?"

"স্যার," 'মহারাণা' বলে, "বুড়ো শতরঞ্জের মোহরা মাত্র। এসব ওই গুলজারেরই বদমায়েশি। যে বুড়ো মরতে চায় না, তার সামনে ইচ্ছে করেই আমাদের 'যমদূত' বলল। ও জানত বুড়োকে 'যমদূত' দেখালেই মা-বাপ তুলে খিস্তি দেবে।"

এবার হেসে ফেললেন ক্যাপ্টেন দত্তা। মহারাণা ধরেছে ঠিকই। এটা গুলজারেরই কাজ। এমন মসৃণভাবে নিজে কিছু না বলেও আর্মিকে কড়া খিস্তি খাইয়ে গেল যে কিছু বলার নেই। চালটা মোক্ষম দিয়েছে লোকটা। ক্যাপ্টেন দত্তা পুরো মাত এবং কাত।

"স্যার, কিছু মনে করবেন না," 'মহারাণা' গজগজ করে, "আপনি বড্ড নরমসরম। আপনার জায়গায় রাঠৌর বা অন্য কেউ থাকলে লোকটাকে ঠুকে দিত। অথবা স্রেফ জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে জিন্দা পুঁতে দিত। এমন 'বেহুদা মজাক' করতে পারত না।"

ক্যাপ্টেন দত্তা 'মহারাণার' দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "অন্য কেউ থাকলে ও এরকম ফাজলামি করত না। আমাকে দেখলেই ওর বোধহয় বদমায়েশি করতে ইচ্ছে করে।"

সে বিড়বিড় করে, "কেমন মুসলমান বলুন তো? আপনি হিন্দু হয়েও 'খুদা হাফেজ' বললেন। অথচ ও শালা বললই না।"

"ছড্ডো উসকো।" ক্যাপ্টেন বললেন, "চলো, অন্য দিকে যাই।"

'মহারাণা' কোনও কথা না বলে নির্বিবাদে নৌকোর দিক পরিবর্তন করে। সে ঠিকই বলেছে। গুলজার তাঁর 'খুদা হাফেজ'-এর প্রত্যুত্তরে কোনও প্রীতি সম্ভাষণ জানায়নি। আসলে তাঁরই ভুল। বোঝা উচিত ছিল, 'খুদা হাফেজ' শব্দটা গুলজার বলবে না। কারণ ওই প্রীতি সম্ভাষণটা উচ্চারণ করতে হলে প্রথমেই 'খুদা' শব্দটা উচ্চারণ করতে হয়।

ক্যাপ্টেন দত্তা আকাশের দিকে তাকান। গুলজারের চাউনি বড্ড ভাবায়। ঠিক এরকম চাউনি বাবার চোখে দেখেছেন। বাবা যখনই তাঁর পিছনে লাগেন, তখনই এমন একটা অনাবিল স্নেহ তাঁর চোখে হালকা হাসির সঙ্গে উপচে পড়ে। কিন্তু যে লোকটা আর্মিকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তার চোখে স্নেহ থাকবে কেন?

ক্যাপ্টেন দত্তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে ওয়াকিটকি শব্দ করে ওঠে।

"শের শাহ স্পিকিং।"

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল রাঠৌরের কণ্ঠস্বর, "সাব সিকন্দর রিপোর্টিং, এখনই মেন রোডের দিকে চলে আসুন। কিছু গড়বড় আছে।"

"এখন লক্ষ রাখো, আমি না পৌঁছনো অবধি কিছু করবে না। নো অ্যাকশন।"

"রজার, অ্যাফার্মেটিভ।"

"ওভার অ্যান্ড আউট।"

সতেরো

স্বরাজকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে গুলজার বুড়োকে ঘাড়ে তুলে দোতলার দিকে চলে গেল। গোটা রাস্তায় সে বেশি কথা বলেনি। শুধু একবার স্বরাজের অবস্থা দেখে বলেছিল, "আর্মিকে দেখে একেবারে পসিনা ছুটে গেল যে। এটা কাশ্মীর ভাই। এখানে রাস্তায় এত কুত্তাও ঘোরে না, যত আর্মির জওয়ান ঘোরে। তুমি সত্যিই জম্বুর লোক, না 'কোই মিল গয়া'র 'জাদু'?"

স্বরাজ প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে বলে, "আমি ভয় পাইনি।"

মৃদু হেসে চুপ করে যায় গুলজার। মেন রোডে উঠে দিব্যি বস্তা তুলে নেওয়ার মতো করে বুড়োকে তুলে নিল। স্বরাজ হাত লাগাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু গুলজার বাধা দেয়, "থাক। মেহমানদের আমরা নিজেদের বোঝা তুলতে দিই না। সে জম্বু থেকেই আসুক, কী পহেলগাঁও থেকে।"

ফের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল স্বরাজের। কিন্তু গুলজারের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়েও তো কিছু বোঝা যায় না। তারপর থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছে স্বরাজ।

এই মুহূর্তে তারা এস এম এইচ এস হসপিটালে বসে আছে। শ্রী মহারাজা হরি সিং গভর্নমেন্ট হসপিটাল। একটু আগেই ডাক্তার চেক করেছেন। তাঁর সন্দেহ এটা বড়সড় অ্যাটাক। পেশেন্টকে ভরতি করতে হবে।

"ব্যস। লেগে গেল চুনা।" গুলজার বিড়বিড় করে। স্বরাজ এবার বিরক্ত হয়। লোকটার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলে কিছু নেই? অসুস্থ বৃদ্ধ লোকটাকে মারতে পারলেই যেন বাঁচে। স্বরাজের মুখ দেখে গুলজার হয়তো কিছু আন্দাজ করেছিল। তাই মৃদু হাসল, "সরি ভাই, আমি তোমাদের মতো যন্ত্রবাতি হতে পারি না। তুমি ভাবছ বুড়োর কী হবে। আর আমি ভাবছি ভরতের কী হবে।

এবার আক্ষরিক অর্থেই লজ্জিত হল স্বরাজ। সত্যিই এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। একেই ভরতের ঘাড়ে মেয়ের বিয়ের গুরুদায়িত্ব। তার উপর এই দুর্যোগ। সামলাবে কী করে?

"আমার বাবা পহেলগাঁও-এ ছিল। আমিও বহু বছর ঘোড়া চালিয়েছি," শান্ত চোখদুটো তুলে বলে গুলজার, "পঁয়ত্রিশ বছর ছিলাম ওখানে। ঘোড়ার নিয়ম কী জান? ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে তাকে মরবার জন্য ছেড়ে দিতে হয়। নয়তো বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গরিবের ঘরে ওই একই নিয়ম হওয়া উচিত। একবার ভেবে দেখো, দশজন বুড়ো-বুড়িকে খাওয়াতে কী রকম পরিশ্রম করতে হয় ভরতকে।"

বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেলে স্বরাজ। গুলজার পঁয়ত্রিশ বছর শুধু পহেলগাঁওতেই ছিল। অথচ শিশমহলেও বহুদিন রয়েছে। তবে ওর বয়স কত।

"আমার বয়স এখন পঞ্চান্ন," তার অনুক্ত প্রশ্নটা বুঝেই হয়তো গুলজার মৃদু হাসল, "আমিও বুড়ো ঘোড়া হতেই চলেছি। দাদাজিদের মতো অবস্থা আমারও হবে। তবে পার্থক্য একটাই। দাদাজিকে ঘাড়ে তোলার জন্য আমি বা ভরত আছি। কিন্তু আমার কেউ থাকবে না।"

বোকার মতো বলে বসল স্বরাজ, "সে কী। পঞ্চান্ন। বোঝাই যায় না তো।"

তার পিঠে হাত রেখে বন্ধুর মতো বলল গুলজার, "মেহনতি মানুষ ভাই। চোদ্দো থেকে একচল্লিশ বছর বয়স অবধি ঘোড়া চালিয়েছি নিয়মিত। চন্দনওয়াড়ি থেকে অমরনাথ পর্যন্ত সওয়ারি সুদ্ধ ঘোড়া টেনে

AMARBOI.COM

নিয়ে গিয়েছি। সাতাশ বছরের মেহনতে শরীরটাও লোহার হয়ে গিয়েছে। তাই হয়তো বুঝতে পারোনি। পারলে তুমিও ঘোড়া চালিয়ে দেখো...”

গুলজারের এদিকটা এত দিন স্বরাজের কাছে অপ্রকাশিতই ছিল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, গুলজারকে যেমন মনে হয়, মানুষটা হয়তো তেমন নয়। হৃদয়টা হয়তো সত্যিই পাষাণ নয়। কারণ একটু পরে সে নিজেই ফর্ম-টর্ম ভরে, নিজের ট্যাক থেকেই টাকাপয়সা দিয়ে, বুড়োকে ভরতি করতে নিয়ে চলে গেল।

মনে-মনে হেসে গুলজারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয় স্বরাজ। গুলজারের সামান্য আন্তরিকতাটুকু ভারী ভাল লেগেছে তার। স্বরাজের বাবা বলতেন, সব সময়ই বাইরে থেকে যা দেখা যায়, তা হয় না। ‘ঔর যো হোতা হ্যায় উয়োহ দিখতা নহি,’ বাবার কথাটা অন্তত গুলজারের ক্ষেত্রে খেটে গেল।

বাবার কথা মনে পড়তেই মুখ কালো হয়ে গেল তার। তরুণ মুখটায় চিন্তা আর ভয়ের ছাপ যুগপৎ ফুটে উঠল। বাবা কেমন আছে কে জানে। মা, বোনটার কী হল তাও জানা নেই। ওরা কি বেঁচে আছে? না আগেই খতম করে ফেলেছে লালা? আজ তিনদিন হল, তার লোকের হুমকি অগ্রাহ্য করেছে সে। রিমোটটা জানালার কাছে রাখেনি। বলা ভাল, রাখতে পারেনি। কিন্তু তার এই অসহায়তার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। লালা কি আদৌ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক? স্বরাজের অবাধ্যতার শোধ যদি তার পরিবারের ওপর তোলে?

প্রতি মুহূর্তেই নানা রকমের চিন্তা এসে স্বরাজের মনটাকে ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। অসহায়ের মতো বারবার একই অন্ধগলিতে এসে পৌঁছয় সে। এ যেন এক ‘ভুলভুলাইয়া।’ ছটফট করতে-করতে যত বেরনোর চেষ্টা করছে, ততই দিশেহারা হয়ে পথ হারিয়ে ফেলছে। যে-মৃত্যুর সামনে থেকে পালানোর চেষ্টা করছে, সেই মৃত্যুর সামনে এসেই সব পথ যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত চোখে স্বরাজ দেখছিল, আশেপাশে কত রোগী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। স্ট্রেচারে করে ত্রস্তব্যস্ত ওয়ার্ডবয় নিয়ে চলেছে প্রসব যন্ত্রণা ওঠা গর্ভবতীকে। একটু পরেই তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন একটা জীবন। তীব্র শিশুকণ্ঠের কান্নায় মৃত্যু ও যন্ত্রণার বিরুদ্ধে জেহাদ জানাবে সদ্যোজাত। স্বরাজ নিজেও গর্ভে বয়ে নিয়ে চলেছে আর এক জেহাদকে। সেই জেহাদে কোনও জীবন নেই— আছে শুধু মৃত্যু।

তার থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন তরুণ ডাক্তার। রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলছেন। স্বরাজের মনে হল, দুধ-সাদা অ্যাপ্রনে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু কথা বলতে-বলতেই বার দুয়েক অন্যমনস্ক চোখে দেখে নিলেন তাকে। যেন স্বয়ং অন্তর্যামী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইছেন, ‘আমি তো জীবন দান করতেই এসেছি। বাঁচতে চাও?’ সাদা ইউনিফর্মে ব্যস্ত সিস্টার রাজহংসীর মতো চলে যেতে-যেতে যেন একই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে, ‘বাঁচতে চাও না তুমি?’ সমস্ত হাসপাতালের দরজা, জানালা, প্রত্যেকটা স্তম্ভ, কড়ি-বরগা থেকে ভেসে আসছে একই কথা, ‘বাঁচতে চাও?... বাঁচতে চাও... বাঁচতে চাও না তুমি?’

বাঁচার লোভ বড় লোভ! সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল স্বরাজ। তার দেহ যেন শিথিল হয়ে আসছে। বুকের ভিতরে কে যেন ফিসফিস করে বলে চলেছে, ‘এগিয়ে যা...এগিয়ে যা। এই সুযোগ।’ সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ডাক্তারবাবুর দিকে। তরুণ ডাক্তার কথা বলতে-বলতেই স্নিগ্ধ মুখ ফেরালেন। তাঁর কৌতূহলী চোখ দেখছে স্বরাজকেই। স্বরাজের মনে হল, চতুর্দিকের সব কিছু যেন স্থির হয়ে গিয়েছে। সবার চোখই যেন এই মুহূর্তে তার দিকে নিবদ্ধ। এক্ষুনি সে ওই অ্যাপ্রন পরা মানুষটার সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে বসে পড়বে বুঝি বা। ভিখারির মতো সর্বহারা কণ্ঠে বলবে, ‘আমায় জীবন দিন ডাক্তারবাবু। আমার পেটের ভিতরে প্রতিমুহূর্তে দপদপ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে মৃত্যু। যেমন প্রসূতির পেট কেটে নতুন জীবন বের করে আনেন, তেমনই এই মৃত্যুকেও বের করে ছুড়ে ফেলে দিন। আমি বাঁচতে চাই... আমায় বাঁচান...।’

স্বরাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা তার কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। পিছন থেকে ভেসে আসে একটা কটকটে কড়া গলা, “স্বরাজ, দাঁড়া।”

স্বরাজ চমকে পিছনে তাকায়। এই কণ্ঠস্বর গুলজারের নয়। তবে কার গলা! বিস্মিত ও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে স্বরাজ দেখল, তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন মানুষ। প্রত্যেকেরই চাদরে মুখ ঢাকা। শুধু ওদের মধ্যে একটা পরিচিত মানুষ মুখ থেকে চাদর সরিয়েছে। সে আঁতকে ওঠে, এ কী। এরা কারা। এ তো ইসমাইল। ইসমাইলকে সে খুব ভাল ভাবেই চেনে। এক সময়ে দু’জনেই লালার আড্ডারে কাঠ চুরি করতে যেত। পরমিন্দরের মতোই ইসমাইলও ওর বন্ধু ছিল। পরবর্তীকালে স্বরাজ কাঠচোরাইয়ের কাজ ছেড়ে চন্দনওয়াড়িতে ভুট্টা বেচার কাজ করত। আর ইসমাইল লালার দলে ভিড়ে গেল পুরোপুরি।

স্বরাজের বুকের ভিতরে দামামা বেজে ওঠে। ওরা তাকে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলেছে। কী করে জানল সে এখানে? গুলজার বলেছে? গুলজারই কি তবে...

“তোর সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে,” উদ্ধত অথচ চাপা শাসানির সুরে ইসমাইল বলল, “একটু তফাতে আয়।”

স্বরাজের চোখদুটো যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখল। লালা গুন্ডা পাঠিয়ে দিয়েছে। গুন্ডার দল তাকে মেরে ফেলবে। কী করবে সে? আর বাঁচার পথ নেই... পালাবার পথ নেই। গুলজার তাকে এভাবে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে কে ভেবেছিল?

“চল।” ইসমাইল তার বাহু খামচে ধরেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে চলল অন্যদিকে। স্বরাজ নিরুপায়ের মতো দেখল তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তারবাবু, মিলিয়ে যাচ্ছে জীবনের শেষ আশাটুকুও।

হাসপাতাল থেকে তাকে রাতের নির্জন রাস্তায় বের করে আনল ইসমাইল। ওর কোমরে গোঁজা রিভলভারটার দিকে প্রচণ্ড ভয়ে তাকাল স্বরাজ। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলল, “তুই আমার দোস্ত ছিলি ইসমাইল।”

“ছিলাম। এখন আর নেই,” নিষ্ঠুর কণ্ঠে উত্তর আসে, “তুই গদ্দারি করেছিস স্বরাজ। আজাদের মওতের সুযোগ নিয়েছিস। লালার সঙ্গে বেইমানি করে ঠিক কাজ করিসনি। তোকে এখন আর মাফ করা যায় না।”

“না।” সে কোনও মতে বলে ওঠে, “আমি বেইমান নই। বিশ্বাস কর।”

“আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে শিখিনি স্বরাজ,” ইসমাইল শাণিত স্বরে জানায়, “যদি তুই গদ্দারই না হবি, তবে বলার পরেও রিমোটটা আমাদের লোকের হাতে দিসনি কেন?”

স্বরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ইসমাইলের চোখে ব্যগ্রতা। বাকিরা চুপ করে ওদের কথোপকথন শুনছে। সে বুকে মুখ গুঁজে জবাব দিল, “রিমোটটা হারিয়ে গিয়েছে।”

“ঝু-ঠ।” গর্জন করে উঠল ইসমাইল। পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর নরম হয়ে আসে, “ন্যায় স্বরাজ, চাইলে এখনই তোকে এক গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তোর দোস্ত ছিলাম বলেই এখনও বাতচিত করছি, বোঝানোর চেষ্টা করছি। এখনও কিছু বিগড়ায়নি। এখনও সময় আছে। রিমোটটা আমাদের দিয়ে দে। তারপর তোকে নিয়ে আমরা পহেলগাঁও চলে যাব। কিছু করব না। নয়তো কী হবে তুই জানিস।”

“আমার কাছে নেই,” সে কাতরভাবে বলে, “আমি জানি না সেটা কোথায়। অ্যাক্সিডেন্টের পর গুম হয়ে গিয়েছে।”

ইসমাইলের মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, সে স্বরাজের কথা বিশ্বাস করেনি। কড়া গলায় বলল, “ইয়ুম চেহ চিজ ছুই সু দি মেহ। জালসাজি করেখ তহ মারথ।”

সেই জেনারেল হুমকি। জিনিসটা দিয়ে দে। বিশ্বাসঘাতকতা করলে মেরে ফেলব। কী বললে, কী করলে বিশ্বাস করবে এরা? শেষ চেষ্টা করে স্বরাজ, “ইসমাইল, বোঝার চেষ্টা কর...” স্বরাজ মরিয়া, “লালা তোদের মজহবের ভুলভাল পাঠ পড়াচ্ছে। খুন গরম করছে... লালা...”

"মক্কহব, ধরম গয়া তেল লেনে," তাকে থামিয়ে দেয় ইসমাইল, "আগে তুই বোঝার চেষ্টা কর স্বরাজ। আমাদেরও কিছু করার নেই। আমি লালার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে এসেছি। তুই জানিস না, আব্বু মারা গিয়েছে। মায়ের বুকে জল জমেছে। চোদ্দোটা ভাই-বোন আমার। ছোট ভাইটার অ্যাপেনডিক্স ফেটে যাবে," বলতে-বলতেই তার গলা কেঁপে যায়, "লালার কাছ থেকে এই শর্তে টাকা নিয়েছি যে, তোকে রিমোটসুদ্ধ ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ফিন্দা ইয়া মুর্দা! খালি হাতে আমার ফেরার উপায় নেই ভাই। খালি হাতে ফিরলে টাকা ফেরত দিতে হবে, যা আমি পারব না। তাই বলছি, রিমোটটা দিয়ে দে। আমায় তোকে খুন করতে বাধ্য করিস না। মেহ মা কর খুন কর নস ইয়ট মজবুর!"

স্বরাজ তার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকায়। ইসমাইলও মজবুর! তার সঙ্গীরাও হয়তো তাই। কিন্তু ফিরে গেলে লালা তাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। বাঁচার বিন্দুমাত্রও আশা একেবারেই নেই কি?

স্বরাজ পায়ে-পায়ে পিছোতে থাকে। ইসমাইল কিছু বোঝার আগেই পিছন ফিরে টেনে দৌড় মেরেছে। জানে না ইসমাইলের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে কিনা! শুধু এইটুকু জানে, দৌড়তে হবে। পালাতে হবে।

পিছন থেকে ভেসে এল ইসমাইলের হুঙ্কার, "তুই কাজটা খুব খারাপ করলি স্বরাজ। চেহ ত্রভথ ন কেঁই ওয়াথ, জেহনমস মঞ্জ সামখাও! আর কোনও রাস্তা রাখলি না। চল, জাহান্নমে দেখা হবে!"

সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দুক গর্জন করে উঠল! একটা নয়, একাধিক! স্বরাজ বুঝল ওদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র উঠে এসেছে। তার পিছনে ধাওয়া করেছে ওরা পাঁচজন, তাকে তাক করে গুলি চালাচ্ছে। যে-কোনও একটা বুলেট তার হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। তবু থামল না সে। বরং দাঁতে-দাঁত চেপে প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়চ্ছে। পালাতে হবে, পালাতেই হবে তাকে। হঠাৎ বহুবছর আগে শেখা একটা বিদ্যা মনে পড়ে গেল তার। যখন চোরাই কাঠ কাটার কাজ করত, তখন লালা শিখিয়েছিল বি এস এফ-এর গুলি থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়। পরমিন্দর পারেনি, কিন্তু স্বরাজ তখনও পেরেছিল। এই চূড়ান্ত মুহূর্তেও লালার কথাই তাকে পথ দেখাল লালারই বিরুদ্ধে। সে সোজা না, পাঁচটা এঁকেবেঁকে দৌড়ল।

"ক্লক যা সা-লে!"

শ্রীনগরের ঘুমন্ত রাস্তায় তখন একটা মানুষও নেই। রাজপথের বুকে এই মুহূর্তে একটি ছায়ার পিছনে দৌড়চ্ছে পাঁচজন মৃত্যুদূত। নীরবতাকে চিরে বারবার গর্জে উঠছে বন্দুক!

"স্ব-রা-জ! দাঁড়া বলছি!"

পিছন থেকে একটা গুলি সাঁত করে বেরিয়ে গেল তার কানের পাশ ঘেঁষে। লাগেনি ঠিকই, কিন্তু সেই অনুভূতিটুকুতেই গোটা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল! মৃত্যু কি প্রেমিকার মতোই? বন্ধুদের মুখে শুনেছে, প্রেমিকা যখন স্পর্শ করে তখন দেহে কয়েকশো ভোল্টের ছ্যাঁকা লাগে। প্রিয় নারীর স্পর্শ কখনও পায়নি সে, কিন্তু এইমাত্র মৃত্যু ছুঁয়ে গেল। স্বরাজ বুঝল এঁকেবেঁকে দৌড়নোর দরুন ওরা ঠিকমতো তাকে টার্গেট করতে পারছে না! তাই পিছন থেকে আওয়াজ দিয়ে তাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করেছে। যতই চিৎকার করুক, কিছুতেই থামছে না সে। দৌড়তে-দৌড়তেই তার চোখে পড়ল উলটো দিক থেকেও কারা যেন এদিকেই আসছে! আরও লোক পাঠিয়েছে নাকি লালা? এটা কি তাহলে একটা ফাঁদ? ইসমাইলরা হয়তো তাকে বধ্যভূমির দিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সে ভাবার সময় পেল না। তার আগেই ওদিক থেকে আর একটি তাড়া খাওয়া মানুষ দৌড়তে-দৌড়তে এসে পড়ল তার দিকেই। কিছু বোঝার আগেই তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েলি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "ভাইজান! ভাইজান! আমায় বাঁচা! ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে! ওরা আমায় ধরতে আসছে। দুশমন... ওরা দুশমন..."

স্বরাজ তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল! পিছন

বাঁচার লোভ বড় লোভ! সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল স্বরাজ।... সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ডাক্তারবাবুর দিকে।

থেকে ফের গর্জন করে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র। সে ভয়-বিস্ফারিত চোখে দেখল নারীমূর্তির শরীর ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। মেয়েটা যেন শেষবারের মতো বাতাসে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। কোনও মতে উচ্চারণ করল, "ভা-ই-জা-ন।" পরক্ষণেই ঝুপ করে পড়ে গেল তার নিষ্প্রাণ শরীরটা। স্বরাজের মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তেই সেও মরতে চলেছে। তার পিছনে ধাওয়া করে আসা দুর্বৃত্তদের গুলি ফুঁড়ে গিয়েছে একটি মানুষকে। এবার তার পালা।

"সিকন্দর, মহারাণা টেক ইওর পোজিশন।" চোখ বুজে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল স্বরাজ। হঠাৎই শুনতে পেল ভারী এবং কড়া কণ্ঠস্বরের নির্দেশ, "কভার দে-ম!"

এই কড়া নির্দেশ অতি পরিচিত! ভারী বুটের ধপাধপ শব্দ। একটা সবল হাত তাকে এবং নারীদেহটাকে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। স্বরাজ অতিকষ্টে চোখ খুলল। না, ওরা লালার গুন্ডা নয়। আর্মি। চিরশত্রু আর্মিকে 'দেবদূত' মনে হল তার। কোনও মতে বলতে চাইল, 'আমায় বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই।'

তার আগেই চেতনাটুকু ঝুপ করে নিভে গেল। চোখের সামনে ঘন অন্ধকার। শুধু অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে শুনতে পেল আর্মির রাইফেল গর্জে উঠেছে...

আঠারো

লেফটেন্যান্ট রাঠৌর তখন শ্রীনগরের রাস্তায় রাউন্ড মারছিল। আজ তার মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্যাপ্টেনকে অত কথা শোনানো ঠিক হয়নি হয়তো। ক্যাপ্টেন দত্তা মানুষটা অন্যান্য আর্মি অফিসারদের মতো কড়কছাপ নন। বরং খানিকটা মোলায়েম। প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই ভদ্র। কাশ্মীরিদের একবার চিনে ফেললে হয়তো আর অত ভদ্র, নম্র থাকবেন না।

রাঠৌরের চোয়াল শক্ত হয়। কাশ্মীরের লোকগুলো কিছুতেই শোধরাবে না। থাকবে ভারতের দয়ায়, খাবে ভারতের থালায়, আর সাপোর্ট করবে পাকিস্তানিদের। আজও শ্রীনগরের মধ্যে লালচকে পাকিস্তানি পতাকা তোলার সাহস রাখে ওরা! ইন্ডিয়া-পাকিস্তান খেলায় পাকিস্তান জিতলে ব্যাটারা আবার পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ নিয়ে বিশ্রী মিছিল বের করে! সীমান্তে অনেকবার এ দৃশ্য দেখেছে। অথচ এই লালচকেই শেখ আবদুল্লাহ, জওহরলাল নেহরুর প্রেমে 'লোটপোট' হয়ে খোদাই করে দিয়েছিলেন লম্বা প্রেমপত্র, 'মন তু গুদি, তু মন গুদি, তা কস না গোয়েদ, মন দেগ্রাম তু দেগড়ি।' অর্থাৎ 'এবার তোমার আমার মিলন হল। কেউ আমাদের আলাদা বলতে পারবে না।'

কী দরকার ভারত সরকারের এত প্রেমের? কী দরকার এত সহনশীলতার? জম্মু ব্লক করে দিলে কুত্তার বাচ্চাগুলো না খেয়ে মরত। পাকিস্তানিরা এসে কচুকাটা করত সবগুলোকে। ঠিক হত। মাঝেমধ্যেই তার ইচ্ছে করে সবক'টাকে রাইফেলের গুলিতে উড়িয়ে দেয়। এর আগে খেপে গিয়ে এক পাকিস্তানি ফ্ল্যাগধারীকে সত্যিই গুলি করে দিয়েছিল রাঠৌর। তার পরিণামে প্রচুর ধমক আর কড়া ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে তাকে। এমনকী, আর একটু হলেই কোর্টমার্শাল হচ্ছিল। বরাতজোরে লোকটা বেঁচে যায়। কিন্তু রাঠৌরের মনে হয়, এর চেয়ে তার কোর্টমার্শাল হওয়াই ভাল ছিল। একটা পাকিস্তানের সাপোর্টার তো কমত। সে উত্তেজিত হয়ে চুরুট টান দেয়। না, ক্যাপ্টেন দত্তার মতো নরম হলে চলবে না। অত ধমক-ধামক, ওয়ার্নিং খেয়েও সে বিন্দুমাত্রও পালটায়নি। পালটাবে না কোনওদিন। কসম মহারাণা প্রতাপ কী। 'দুধ মাঙ্গো তো ক্ষীর দেঙ্গে, কাশ্মীর মাঙ্গো তো চিড় দেঙ্গে।' শা-লা।

আচমকা একটা বলবল শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে রাঠৌর। তার সঙ্গী ফিসফিস করে, "সিকন্দর, কেউ নাও নিয়ে এদিকেই আসছে।"

একটু আগেই একটা নৌকো এসেছিল। সেই অভদ্র, অসভ্য গুলজার আহমেদ এক বুড়োকে ঘাড়ে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিল। রাঠৌর চুপ করে ব্যাপারটা দেখেছে। কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার ছিল না বলে কিছু করেনি। যদিও গুলজার আহমেদকে দেখলেই তার মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে যায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন দত্তার আবার অদ্ভুত দুর্বলতা আছে ওর উপর। একা ক্যাপ্টেন দত্তা নন, ভরা বাজারে তাকে অসম্মান করার পর সে মেজর ভার্মার কাছেও নালিশ করেছিল। মেজর ভার্মা তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, "ছেড়ে দাও রাঠৌর। ওকে আর মেরে কী করবে? ভাগ্যই ওকে মেরে রেখেছে। চোদ্দো বছর এখানে আছে। জঙ্গি বা জিহাদিদের দলে নাম লেখালে ঠিক কানে আসত। ভুল যাও।"

"কিছু গড়বড় আছে," চাপা গলায় তার সাথী বলল, "লোকটা কে বুঝতে পারছি না। আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। দোকানের শাটারে কিছু একটা লিখছে বলে মনে হয়।"

উত্তেজনায় সমস্ত ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে যায় রাঠৌরের। তার সঙ্গী এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছিল। রাঠৌর বাধা দিল। ক্যাপ্টেন দত্তাকে না জানালে তিনি আবার গোঁসা করবেন। সে ওয়াকিটকিতে ক্যাপ্টেন দত্তাকে ব্যাপারটার আভাস দেয়। তিনি এখনই কোনও অ্যাকশন নিতে বারণ করলেন। যথারীতি।

লোকটা তখন দোকানের শাটারে বড়-বড় করে গুর্মুখী স্ক্রিপ্টে লিখতে শুরু করেছে, 'সওয়াগতা হৈ জিহাদি।' আধা অন্ধকার, আধা আলোয় মুখ দেখা যায় না। কে এই হারামজাদা? গুলজার আহমেদকে সন্দেহ করছিলেন ক্যাপ্টেন। অথচ একটু আগেই গুলজারকে চলে যেতে দেখেছে। তবে এটা কে? রাঠৌরের রক্ত গরম হয়ে যায়। কিন্তু ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করাও যায় না।

কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। তারপরই ক্যাপ্টেন দত্তা চলে এলেন। সঙ্গে মহারাণা, নেপোলিয়ন সহ বাকিরাও উঠে এসেছে। লোকটা কিন্তু তখনও আর্মির উপস্থিতি টের পায়নি। সে আপনমনেই পর-পর দোকানের শাটারে, কাচে লিখে চলেছে একই কথা—'সওয়াগতা হৈ জিহাদি।'

"নো গুটিং," ক্যাপ্টেন দত্তা বিশেষ করে রাঠৌরকে শুনিয়ে কথাটা বললেন, "জ্যান্ত ধরব। টিম..."

সবাই নিচু স্বরে বলল, "ইয়েস স্যার।"

"ঘের লো উসকো। চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরো। পালাতে না পারে। এনি ডাউট?"

"নো স্যার।"

ক্যাপ্টেনের কথামতোই সাবধানে গুটিগুটি এগিয়ে গেল জওয়ানরা। হাতে রাইফেল প্রস্তুত। এখনই কিছু করবে না। তবে সাবধানের মার নেই। যদি ওদিক থেকে কোনও আক্রমণ আসে তবে প্রত্যুত্তর দিতে হবে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে ওরা। যেন বাঘ নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে তার শিকারের দিকে। ভারী আর্মি বুট পরে হাঁটছে, অথচ একটু শব্দও নেই।

সবার প্রথমে জিহাদি লোকটার কাছে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। পিছন ফিরে সঙ্গীদের ইশারা করলেন। হাত নামিয়ে বলছেন, 'চতুর্দিক ঘিরে দাঁড়াও।' নিঃশব্দে জাল বিছিয়ে অপরাধীর ধরা পড়ার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে আর্মি।

ক্যাপ্টেন দত্তা একটা শ্বাস টানলেন। পরক্ষণেই মনে হল একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে। চোখের পাতা ফেলার আগেই পিছন থেকেই কষে চেপে ধরলেন লোকটাকে। এমনভাবে ঘাড় চেপে ধরেছেন যে, লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না। ক্রুদ্ধ বাঘের মতো ছটফট করতে করতে তর্জন করে উঠল, "কৌণ হানা? ছোড় দে মেঁনু।"

কণ্ঠস্বর শুনে ক্যাপ্টেন মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের জোরালো বাঁধন আলগা হয়ে গেল। এ কী। এ তো বাঘ নয়, বাঘিনী। এত দিন ধরে দেওয়ালে, শাটারে যে জিহাদের বাণী লিখছে সে পুরুষ নয়, নারী। মুহূর্তের স্খলিত বাঁধনের সুযোগ নিয়ে মেয়েটি হাঁচোড়-পাচোড় করে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারল না। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে ফের তাকে চেপে ধরেছেন ক্যাপ্টেন। নারীটি তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। তাঁর কপাট বুকে সর্বশক্তি দিয়ে

গুমগুম কিল মারতে-মারতে বলল, "ছেড়ে দে। দুশমন... তুই দুশমন... তুই দুশমন।"

কয়েক জনের হাতে তখন টর্চ জ্বলে উঠেছে। বাকিদের রাইফেল অপরাধীর দিকে উদ্যত। সেই আলোতেই নারীটির মুখ দেখে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। নারীটি বয়স্ক, সম্ভবত তাঁর মায়েরই বয়সি। কিন্তু সে কী রক্তজল করা মুখ। উন্মত্ত চোখদুটো বনবন করে ঘুরছে। মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছে। উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করতে-করতে বলল, "তুই দুশমন, তো-রা দুশমন... তো-রা দুশমন।"

জওয়ানদের মধ্যে একজন মুখ খুলল, "স্যার, আমি ওকে চিনি। ও আরিফা। গুলজার আহমেদের বোন। বদ্ধ পাগল। এই একটা ডায়লগই বলে। আর্মির সব লোকই ওর কাছে দুশমন।"

কেন 'দুশমন' তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন এর আগের গল্পটা জানেন। আরিফার অবচেতনে আর্মির প্রতি ঘৃণা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ঘৃণা যে এভাবে ফেটে বেরোবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি।

"রাইফেল নামাও।" তিনি কড়া সুরে আদেশ করলেন, "মহিলা নিরস্ত্র। ওর হাতে চক ছাড়া আর কিছু নেই।"

রাঠোর যথারীতি বিরক্ত, "বুঝুন ঠ্যালা! একের পর এক পনৌতি এসে হাজির। একা গুলজার আহমেদ কি মগজমারির জন্য কম ছিল, যে, এবার তার পাগল বোনও এসে জুটেছে? স্যার, আপনি শুধু একবার বলুন, ভাই-বোন দুটোকেই উড়িয়ে দিই। আপদ যায়।"

ক্যাপ্টেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রাঠোরকে দেখে নিলেন। বলাই বাহুল্য কথাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমি মেয়েটার কোনও দোষ দেখছি না সিকন্দর। তোমার মতো কিছু আর্মি অফিসার আর পুলিশের অত্যাচারে আজ ওর এই অবস্থা! যে-মেয়েটাকে গ্যারেপ করে আর্মি এমন ভেজিটেবল বানিয়ে দিয়েছে, সেই মেয়ে জিহাদের বাণী লিখবে না তো কি তোমায় প্রেমপত্র লিখবে?"

রাঠোর চুপ করে যায়। ক্যাপ্টেন দস্তার বাহুবন্ধনে তখনও অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আরিফা। লম্বা-লম্বা নখ দিয়ে ঘাড়, মুখ আঁচড়ে দিচ্ছে। কাঁধে কামড়ে দিয়েছে। তবু তিনি ছাড়ছেন না। তাঁর মস্তিষ্কে তখন অন্য একটা সম্ভাবনা উঁকি মারছে। যত দূর তিনি জানেন, আরিফার মস্তিষ্ক চোদ্দো বছর আগেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণটা হয়েছে এত বছর পরে হল কেন? শুরুতেই তো আরিফা জেহাদ করতে পারত। একজন উন্মাদিনী, হিংস্র মেয়ের পক্ষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা স্বাভাবিক।

তাঁর মন বলছিল, এ আরিফার নিজস্ব মস্তিষ্কের কাজ নয়। কেউ ওকে দিয়ে এটা করাচ্ছে। হিংসায় উন্মত্ত, ভারসাম্যহীন মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করা খুব সহজ। মেয়েটা যা লিখছে, নিজের হাতেই লিখছে— কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই হয়তো লিখছে না।

তিনি আরিফাকে ছাড়লেন না। বরং তাকে আরও জোরে চেপে ধরে বললেন, "আরিফা, তাকাও আমার দিকে। আরিফা, আমার কথা শোনো... আরিফা..."

আরিফা কোনও কথাই শোনে না। সে তখনও এলোপাথাড়ি মেরে চলেছে ক্যাপ্টেন দস্তাকে, "তুই দুশমন... তুই দুশমন... তুই দুশমন!"

"আরিফা।"

ক্যাপ্টেন দস্তার মুখটা আকস্মিকভাবে শক্ত হয়ে যায়। তিনি ঠাস করে মোক্ষম চড় বসিয়ে দিলেন আরিফার গালে। ক্যাপ্টেন জানেন, অনেক সময় উন্মত্ত মানুষকে এরকম একটা আচমকা শক খানিকটা শান্ত করে দেয়। চড়টা খেয়ে আরিফাও চুপসে গেল। সে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনকে দেখছে। এবার তার চোখে আর ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা নেই, বরং একটা ভয়ের ছাপ পড়েছে। রাঠোর আপনমনেই বিড়বিড় করে, "বেশ হয়েছে। আমাদের সবার তরফ থেকে আরও গোটা কয়েক ঝাপড় বসিয়ে দিন স্যার। এতদিন ধরে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে হারামজাদি। ওর 'সওয়াগতা হৈ জিহাদি'র ঠ্যালায় পাগল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল সবার। দিন আচ্ছা করে তুলো ধুনে।"

"আরিফা, মন দিয়ে শোনো," রাঠোরের টিপ্পনীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই ক্যাপ্টেন দস্তা এবার একটু নরম গলায় বললেন, "তুমি এগুলো কী লিখছ?"

আরিফা গালে হাত বোলাল। ভয়ার্ত, জলভরা চোখদুটো তুলে বলল, "তুই দুশমন... তোরা দুশমন... জিহাদি আসবে... তোদের মারবে, আমাদের বাঁচাবে। দুশমন— তোরা সবাই দুশমন, তোদের শেষ করবে জিহাদিরা। কাশ্মীর স্বাধীন হবে।"

"সা—লি, তে-রি-তো।" রাঠোর তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে গেল, "তোর ভাইজান বাওয়ার্চি না? ওই গরম তেলে ফেলেই ভাজব তোকে। মহারাণার কসম! অথবা তন্দুরের মধ্যে ফেলে পোড়াব। তারপর তোর ভাইজানকে খাওয়াব। আরিফা-তন্দুর ঔর আরিফা-কবাব। স্বাধীন কাশ্মীরের পেহলা স্পেশ্যাল ডিশ।"

"শা-ট আ-প।" ক্যাপ্টেন দস্তা এবার গর্জন করে ওঠেন, "এনাফ ইজ় এনাফ সিকন্দর! অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছি। এবার তুমি শুধু তখনই কথা বলবে, যখন আমি তোমাকে কথা বলতে বলব। এনি ডাউট?"

রাঠোর ধারাল দাঁতে ঠোঁট কামড়ে প্রত্যুত্তর দেয়, "নো স্যার।"

তিনি আবার আরিফার দিকে তাকালেন, "আরিফা, আমরা দুশমন ঠিকই। জিহাদিরা আসবে, কাশ্মীরও স্বাধীন হবে। কেউ আর তখন তোমাকে জ্বালাতন করবে না, কেউ মারবে না। এসব কথা যে তোমায় বলেছে, সও টাকা ঠিক বাতই বলেছে। কিন্তু কে তোমায় এ কথাগুলো বলেছে বলো তো? তার নাম কী?

"কে বলেছে? কে বলেছে?" আরিফা এখন অনেকটা শান্ত। উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা দেখে নিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "ও বলেছে।"

"ও বলেছে?" ক্যাপ্টেন বুঝলেন একদম সঠিক পথটাই ধরেছেন। তিনি আরও কোমল স্বরে জানতে চান, "ও কে? ভাইজান?"

"না ভাইজান বলেনি," সে মাথা নেড়ে বলল, "ভাইজান আমায় কিছু বলে না। ও বলেছে।"

"ও কে?"

"ওই তো। ওই যে। যে শিশমহলে থাকে..." বলতে-বলতেই কথাগুলো ফের ভুলে গেল আরিফা। আবার অস্থির হয়ে উঠেছে। ফের ছটফটিয়ে উঠে বলে, "ভাইজান। ভাইজান কোথায়?"

ক্যাপ্টেন দস্তা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, "ভাইজান চলে আসবে। তুমি বলো, ওর নাম কী?"

হঠাৎই রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠছে। হতবাক ক্যাপ্টেন দস্তা রাঠোরের দিকে তাকিয়েছেন। এটা কী হচ্ছে। আর্মির পুরো টিম এদিকে। তবে ওদিকে ফায়ারিং হচ্ছে কেন?

তাঁরা সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই আরিফা একঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। চিৎকার করে বলল, "না... নহিঁ। কিছু বলবো না। ভাইজান জিহাদিদের নিয়ে আসছে। তোদের মারার জন্য আসছে।"

খণ্ডমুহূর্তে অবিন্যস্ত, বিহ্বল সেনাবাহিনীর ঘেরাটোপকে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে উন্মাদিনী প্রাণপণ দৌড়ল বন্দুকের শব্দের উৎসের দিকে। চিৎকার করে উঠল, "ভা-ই-জা-ন! ওরা দুশমন। ওরা আমাকে মারবে। ভা-ই-জা-ন! আমায় বাঁচা।"

রাঠোরের হাতেও মুহূর্তের মধ্যে উঠে আসে রাইফেল। উদ্দেশ্য, পলায়নপর মানুষটির পায়ে গুলি মারা। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডোন্ট শুট। ওকে থামাও। ওদিকে শুট-আউট হচ্ছে।"

রাজপথ ধরে মেয়েটির পিছন-পিছন ছুটল জওয়ানরা। ফায়ারিংয়ের শব্দটা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। ক্যাপ্টেন দস্তা বুঝতে পারছিলেন, ফায়ারিংটা কোনও রাইফেল থেকে হচ্ছে না, ওটা রিভলভারের শব্দ। তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়। এমন হেভি ফায়ারিং কারা করছে? আবার জিহাদির আক্রমণ।

"কভার দ্য গার্ল মহারাণা।"

'মহারাণা' দ্রুত গতিতে দৌড়ে আরিফার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আরিফা যেন বাঘের ভয়ে পালাচ্ছে। উন্মাদ যখন জেদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার সঙ্গে পেরে ওঠা অত সহজ নয়। উলটোদিক থেকে ততক্ষণে একজন পুরুষের ছায়ামূর্তি এদিকেই দৌড়ে

আসছে। তার পিছন-পিছন আরও লোকজন।

"ভা-ই-জা-ন!" আরিফা উন্মত্তের মতো পুরুষমূর্তির দিকে ধেয়ে যায়। দৌড়তে-দৌড়তেই চোখ সরু করে উলটোদিকের লোকটাকে চেনার চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন। লোকটা আরও একটু এগিয়ে আসতেই স্পষ্ট হল তার অবয়ব। সাদা পাঞ্জাবি উড়ছে, গায়ে চাদর নেই। সম্ভবত দৌড়নোর সময়েই পড়ে গিয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ গুলজারের মতোই। কিন্তু তার মতো সুগঠিত চেহারা বলে মনে হচ্ছে না। না, গুলজার হতেই পারে না। এ লোকটি রোগা-সোগা! আরিফা ভুল করেছে। সে প্রায় আছড়েই পড়ল লোকটার ওপর। লোকটা ধাক্কা সামলাতে না পেরে লুটিয়ে পড়েছে... আরিফা তখনও সটান দাঁড়িয়ে... সর্বনাশ!

ক্যাপ্টেন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলেন, পিছনের লোকগুলোর হাতের বন্দুক ফের আওয়াজ করল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "আরিফা, সিট ডাউন। বৈ-ঠ যা-ও।"

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি আরিফার দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আরিফা কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থেকে মাটিতে পড়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওর দেহে আর প্রাণ নেই।

প্রচণ্ড আফসোসে ঠোঁট কামড়ালেন ক্যাপ্টেন। টিমকে নির্দেশ দিলেন, "বসে পড়ো... বসে পড়ো সবাই। সিকন্দর, মহারাণা টেক ইওর পোজিশন্স... কুইক। নেপোলিয়ন, কভার দে-ম!"

রাঠৌর সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ক্যাপ্টেন দত্তার দিকে। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করছে। ওদিকের ফায়ারিং তখন থেমে গিয়েছে। নেপোলিয়ন নামের সঙ্গীটি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় মাটিতে লুটিয়ে থাকা নারী ও পুরুষ দেহদু'টির দিকে। দু'হাতে হিড়হিড় করে অবলীলায় টেনে নিয়ে আসে দু'জনকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায়।

"কভার।"

দেহদু'টিকে কভার করে এবার প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেনাবাহিনী। ওদিকের বন্দুকবাজরাও এবার ভয় পেয়ে গিয়েছে। ইসমাইল ভয়ার্ত স্বগতোক্তি করে, "ইন্ডিয়ান আর্মি! এত তাড়াতাড়ি কী করে এসে পড়ল।"

ওর পাশের সঙ্গীর গলা কেঁপে গেল, "লালা তো বলেছি ধৈর্য, আর্মির সঙ্গে লড়তে হবে! আমি এখনই মরতে চাই না ভাই!"

কী অদ্ভুত পরিহাস! একটু আগেই ওরা কাউকে মারার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সে মানুষটাও মরতে চায়নি! আর এখন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওদের মরতে ইচ্ছে করছে না! একজন বলল, "সারেন্ডার করব?"

ইসমাইল চোখ বুজল। কী হবে সারেন্ডার করে? ছোট ভাইটার অ্যাপেন্ডিক্স। অপারেশন না করালে মরে যাবে। এখানে আসার আগে টাকা জমা দিয়ে তাকে হাসপাতালে ভরতি করে এসেছে। আম্মি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল সেদিকে। কোনওমতে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথায় পেলি এত টাকা?"

অসুস্থ মাকে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করেনি তার। আসলে সে নিজেও জানত, স্বরাজকে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ কাজ হবে না। লালার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, যদি সে বেইমানি করে থাকে, তবে মুখের কথাতে কাজ হবে না! তার মন বলছিল, হয়তো মাকে সে শেষবারই দেখছে। আর এই মুহূর্তে মিথ্যে কথা বললে মরেও শান্তি পাবে না ইসমাইল।

মুখ নিচু করে বলল, "লালার কাছ থেকে নিয়েছি। ওর একটা ছোট কাজ করে দিতে হবে আমায়।"

মা তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে। যেন কথাটার গুরুত্ব বুঝতে চাইছে। পরক্ষণেই ঠাস করে এক চড়। সে স্তম্ভিত। গালে হাত দিয়ে বলল, "আমায় মারলি কেন আম্মি? আমি কী করলাম?"

"এখনও করিসনি," মায়ের চোখে রক্তিমাভা। রোদে পরিশ্রমে ভেজে যাওয়া তোবড়ানো গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল, "কিন্তু করতে যাচ্ছিস! আমি আনপঢ়, বেওকুফ হতে পারি। কিন্তু লালার কাছ থেকে টাকা নিলে কী হয় তা নিজের চোখে বহু বছর ধরে দেখেছি। আজ পর্যন্ত যারা ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তারা সব এমনই 'ছোটা মোটা কাজ' করতে গিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছে। কেউ তাদের আর খুঁজে পায়নি! আজ তুইও চললি 'ছোট কাজ' করতে!" মায়ের কঠিন পরিশ্রম করা লাবণ্যহীন কঠোর মুখ কঠোরতর হয়ে উঠেছিল, "একটা কথা শুনে যা। যে-কাজ করতে যাচ্ছিস, তার দায় নিজেই নিবি। তোর লাশ নিয়ে যদি পহেলগাঁও পুলিশ বা আর্মি পুছতাছ করে, তবে একটা কথাই বলব— আমি তোকে চিনি না।"

বলতে-বলতেই বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মা। ইসমাইল কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে চলে গিয়েছিল। আর দাঁড়ানোর সাহস ছিল না!

সে সারেন্ডার করলে লালা তার গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকে মেরে ফেলবে। তাই ধরা দেওয়ার রাস্তা বন্ধ। তাছাড়া আর্মির বডি ল্যাঙ্গোয়েজে স্পষ্ট, তারা আজ 'শামত'-এর মুডে আছে। আর্মির চোখের সামনেই একজনকে গুলি করে মেরেছে ওরা। ভারতীয় সেনা আজ ছেড়ে কথা বলবে না!

"ওরা আমাদের ছাড়বে না!"

ইসমাইল বলল, "উপায় নেই। আমনা-সামনা যখন হয়ে গিয়েছে, তখন মোকাবিলা করতে হবে।"

"ওদের হাতে রাইফেল ভাইজান," পাশের জন জানায়, "রিভলভার নিয়ে কতক্ষণ লড়ব? কী হবে?"

সে হাসল, "ইয়ে পেন লকমুত ছুম আজলাস টে ছুম তাওয়ান নখওয়ালন। কী আর হবে? নসিবে যা লেখা আছে তাই হবে।"

"উয়োহ হি হোগা যো মনজুর-এ-খুদা হোগা!" অন্য একজন ম্লান হাসল, "দেহ ওয়েই, খুদায়াস হাওয়াল।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই পাঁচজনের হাতের রিভলভার একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। ক্যাপ্টেন দত্তা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তাঁর উচ্চস্বর শোনা গেল, "ফা-য়া-র।"

এতক্ষণ এই শব্দটা শোনার জন্যই বসেছিল রাঠৌর। 'ফায়ার' শব্দটা যেন তার কানে মধু ঢেলে দিল। এই অর্ডারটা তার বড় প্রিয়। র‍্যাট-ট্যাট করে গর্জন করে উঠল তার রাইফেল! প্রথম চোটেই তার গুলিতে ওদিকের দু'জন ধপধপ করে পড়ে গেল। বুলেট তাদের মর্মস্থান ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছে।

"সা-লা, নওসিখিয়া!" রাঠৌর স্বগতোক্তি করে। ছেলেগুলো এখনও ঠিকমতো বন্দুক ধরতেই শেখেনি। বড়জোর এক মাসের ট্রেনিং পেয়েছে। তাতেই এত গুমোর! যার হাতের টিপ এখনও পাকেনি, তার আর্মির সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার দুঃসাহস হয় কী করে। রাঠৌর দাঁতে দাঁত পিষল, "বন্দুক ধরেছে দেখো! আবে গাড়ু, ওটা আসলি বন্দুক, ক্যাপ বন্দুক নয়। তাক করে চালাতে হয় সালো! ধড়াদ্ধড় চালালেই হয় না। তোদের জন্য একা আমিই যথেষ্ট। 'শুট টু কিল' কাকে বলে দেখিয়েই ছাড়ব তোদের, মহারাণার কসম!"

"সিকন্দর! লিড নিও না। পিছিয়ে এসো।" রাঠৌর গুলি করতে-করতেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ক্যাপ্টেন দত্তা তাকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দেন। রাঠৌর মাথা নাড়ে।

"আসছি স্যার। সবক'টাকে উড়িয়ে দিয়েই আসছি।"

"সিকন্দরকে কভার দাও মহারাণা।" ক্যাপ্টেন দত্তা বললেন, "ও লিড নিচ্ছে।"

"জি স্যার।"

ইসমাইল সভয়ে দেখল, দু'জন সঙ্গী ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে। আর্মি একদম নিকেশ করার মতলব করছে তাদের। ওদিকে গুলির রসদে টান পড়েছে! আর্মির মুখে পড়বে জানলে আরও বুলেট নিয়ে আসত। এখন আর উপায় নেই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। সে একটু পিছিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির পিছনে কভার নিল। বাকি দু'জনও প্রমাদ গুনেছে! ফায়ার করতে গিয়ে দেখল, বন্দুকে আর গুলি নেই। এখন ওরা পাগলের মতো একটু নিরাপদ জায়গা খুঁজছে। কিন্তু তার

AMARBOI.COM

আগেই উলটোদিক থেকে ছুটে আসা ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিল তাদের। সবচেয়ে বিধ্বংসী একদম সামনের সেনাটি, যাকে সিকন্দর বলে ডাকছে ওরা। অন্যরা কভারে থেকে ফায়ারিং করছে। কিন্তু এ একেবারে বুক চিতিয়ে এগিয়ে এসে সামনাসামনি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে সবাইকে।

গাড়ির পিছনে চুপ করে বসে থাকে ইসমাইল। এখন ফায়ার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ক'টা গুলি আছে কে জানে।

ফায়ারিংয়ের আওয়াজ যেমন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনই আকস্মিকভাবে থেমে গেল। আর্মির জওয়ানদের হাতে এখনও উদ্যত রাইফেল। কিন্তু ফায়ার করছে না।

"চারজন গেছে স্যার," মহারাণা বলল, "কিন্তু পাঁচজন ছিল না? আর একটা কোথায়?"

দত্তা নিচুস্বরে বললেন, "আশেপাশেই আছে। কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে বোধহয়। মহারাণা, সিকন্দর, নেপোলিয়ন— খোঁজো শালাকে, তবে বি অ্যালার্ট।"

ইসমাইল দেখল জওয়ানরা আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। সম্ভবত তাকেই খুঁজছে। সে দাঁতে দাঁত চাপল। ব্যাটারা শয়তানের জাত। ঠিক খুঁজে বের করবে। যেখানে সে এই মুহূর্তে লুকিয়ে আছে, সেখান থেকে ওকে টেনে বের করতে বড়জোর ওদের ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে। ওদের মধ্যে এক জওয়ান প্রবল দুঃসাহসে এদিকেই এগিয়ে আসছে রাইফেল তাক করে। একদম দুই হাত দূরত্বে চলে এসেছে। সাবধানী ভঙ্গিতে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। আর এক পা এগিয়ে এলেই দেখতে পেয়ে যাবে ওকে।

সে মনস্থির করে। এমনিও মরবে, অমনিও মরবে। আর্মিকে সে ঠেকাতে পারবে না ঠিকই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওদের একটাকেও শেষ করতে পারবে না।

"ম-হা-রা-ণা। হট উ-ধা-র সে।"

ইসমাইল ট্রিগারে চাপ দিল। কিন্তু যাকে লক্ষ করে দুরন্ত বুলেট হাওয়ার বুক চিরে এগিয়ে গেল, তার গায়ে লাগল না। উলটোদিক থেকে অন্য এক জওয়ান বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বুক পেতে দিয়েছে তার সামনে। এই সেই জওয়ান, যে সামনাসামনি লড়ছিল। সঙ্গীর নিয়তির মৃত্যুটা সে নিজের কপালেই টেনে নিল। ইসমাইল দেখল, বুলেটটা সোজা ওর বুকে লেগেছে। কিন্তু আশ্চর্য। লোকটা থামল না। বরং তার দিকে বেয়নেটটা উঁচু করে এগিয়ে আসছে। সে সভয়ে পরপর তিনটে গুলি চালায়। জওয়ান গুলির আঘাতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। কিন্তু কিছুতেই থামানো গেল না তাকে।

"মহারাণা প্র-তা-প কী জ-য়।" লোকটা নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বেয়নেটটা সর্বশক্তিতে আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে। মাত্র বাইশ বছরেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল ছেলেটা।

রাঠৌরের নাক, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। হাত-পা যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে। চারটে গুলি অব্যর্থভাবে লেগেছে বুকে ও পেটে। তবু অতিকষ্টে মুখ মুছে সে বেয়নেটটা একটানে বের করে নিল শত্রুর দেহ থেকে। ছেলেটি বেয়নেটের এক আঘাতেই মরে গিয়েছিল। তবু চরম নিষ্ঠুরতায় পাগলের মতো তার লাশটাকে কোপাতে-কোপাতে বলছে, "কুত্তিয়ার ঔলাদ! তোর বাপ বলেনি যে, ইন্ডিয়ান আর্মির গুলির ডুখ একটু বেশি? এক-একটা জওয়ানকে মাথা থেকে পা অবধি ফুঁড়ে দিলেও শালারা থামতে জানে না। হিম্মত থাকলে তোর বাপকে আসতে বল। তোর মতোই তাকেও চিড়কে-ফাঁড়কে রেখে দেব— মহারাণার কসম! মর্দ হলে ওঠ... সামনাসামনি লড়াই কর। ওঠ। উঠ সা-লে!"

"সিকন্দর!" ক্যাপ্টেন দত্তা দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলেছেন। রাঠৌরের দেহে আর শক্তি ছিল না। সে ক্যাপ্টেনের বাহুতে এলিয়ে পড়ল। তার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। অসম্ভব ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। কিন্তু বেয়নেটটা তখনও হাতে ধরা। কার উদ্দেশে কে জানে, কোনও মতে বলল, "দুধ মাঙ্গো তো ক্ষীর দেঙ্গে/ কাশ্মীর মাঙ্গো তো চিড় দেঙ্গে— মহারাণা কি শপথ।"

"কল দি অ্যাম্বুল্যান্স," রাঠৌরের মুখ থেকে রক্ত মুছতে-মুছতে ব্যগ্রভাবে বলেন ক্যাপ্টেন দত্তা, "ব্যারাকে খবর দাও। মেডিক্যাল টিমকে আসতে বলো। কুইক। সিকন্দর— হোল্ড! চোখ বন্ধ কোরো না। কিছু হবে না তোমার।"

কয়েকজন জওয়ান ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল হুকুম তামিল করতে। রাঠৌর অতিকষ্টে চোখ খুলল। তার এখন বেশ হাসি পাচ্ছে। ক্যাপ্টেন অ্যাম্বুল্যান্স ডাকতে পাঠালেন ঠিকই, কিন্তু সে টের পাচ্ছে তার হৃৎস্পন্দন আস্তে-আস্তে কমে যাচ্ছে। শিরার ভিতর আশ্চর্য শীতল শান্তি। এই অবাধ্য জওয়ানটিকে অনেক ধমক-ধামকেও সোজা করতে পারেনি কেউ। আজও পারবে না। আজও ক্যাপ্টেন দত্তাকে নিরাশ করতে চলেছে রাঠৌর।

"এটা কী করলি সিকন্দর!" মহারাণা ব্যাকুলভাবে ক্যাপ্টেনকে বলল, "সব আমার ভুল স্যার! মরার কথা তো আমারই। ও মাঝখান থেকে চলে এল। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই..."

"সা-লে বুচ্চক।" রাঠৌর হাসছে, "তোকে কে বাঁচাচ্ছিল? তুই ভুলে গিয়েছিস যে, তোর কোড নেম 'ম-হা-রা-ণা।'"

বলতে-বলতেই ক্যাপ্টেনের চোখে স্থির হয়ে গেল রাঠৌর। ক্যাপ্টেন দত্তা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। লোকটা উদ্ধত ছিল, অত্যাচারী ছিল, অবাধ্য ছিল। কিন্তু পাশাপাশি সাহস ও কৃচ্ছ্রসাধনেও তার জুড়ি ছিল না। হয়তো অনেক পাপ কাজ করেছে। অনেককে মেরেছে। কিন্তু আজ প্রমাণ করে দিয়ে গেল, সে মারতে যতটা ওস্তাদ ছিল, মরতেও ঠিক ততটা ওস্তাদ।

ক্যাপ্টেন টুপি খুললেন। হাত দিয়ে রাঠৌরের খোলা, স্থির চোখদুটো বন্ধ করে দিয়ে ফের আকাশের দিকে তাকালেন। রাঠৌর স্বর্গে যাক কি নরকে— ভাল কি শয়তান, যেমনই হোক, সে তার নিজের মতোই ছিল। লেফটেন্যান্ট রাঠৌর, তোমার গল্প আমি সবাইকে বলব।

'ঊ্যার শহীদ এ-মুস্ত-ও-মিল্লত, ম্যায় তেরে উপর নিসার,
অব তেরি হিম্মৎ কা চর্চা গৈর কী মেহফিল মেঁ হ্যায়।
সরফরোশি কী তমন্না, অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়...।'

উনিশ

"ওই লোকগুলো তোমার পিছু করছিল কেন?"

এক বিপদের পর আর এক বিপদ। যদি বা লালার লোকদের হাত থেকে বাঁচল, তবু রক্ষে নেই। এবার আর্মির পালা। যতক্ষণ অজ্ঞান ছিল, ততক্ষণই বোধহয় ভাল ছিল। জ্ঞান ফেরার পর থেকেই শ্রীনগর পুলিশ ও আর্মির সাঁড়াশি আক্রমণে স্বরাজের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে অত রাতে বাইরে কী করছিল, কেন লোকগুলো ওকে তাড়া করল, কেন এত লোক থাকতে তাকেই টার্গেট করল— একের পর এক বুলেটের মতো প্রশ্ন আসছে। শুধু প্রশ্নই নয়, একটু আগে ওরা তাকে পাঁচজনের লাশ দেখিয়ে শনাক্ত করতে পারে কিনা জানতে চাইছিল। স্বরাজ চিনতে পারেনি। সে ইসমাইলকেই একমাত্র চিনত। কিন্তু গুলিতে ফোঁপরা দেহগুলোর মধ্যে ইসমাইলকেও চিনতে পারেনি সে।

স্বরাজ ঠোঁট চেটে বলল, "আমি... আমি জানি না।"

আর্মি অফিসার বিরক্ত হলেন, "মানে। এমনি-এমনি কতগুলো লোক তোমাকে লক্ষ করে গুলি ছুড়ছিল? উইদাউট এনি কজ? তুমি জানো ওরা কারা? ওরা জিহাদি।"

স্বরাজ ভয়ে-ভয়ে তাকায় তাঁর দিকে। আর্মি অফিসারটি নির্ঘাৎ তাকে সন্দেহ করেছেন। তাঁর চোখেমুখে অবিশ্বাসের ভাব প্রকট।

একটু দূর থেকেই ভেসে এল শান্ত স্বর, "ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে পৌঁছে যাওয়া কাটরাসাবের পুরানা বিমারি। সব সময়ই এমন দৃশ্য দেখে ফেলে, যা ওর দেখা উচিত নয়। এবারও তেমন কিছু দেখে থাকবে। খামোখা ওকে খোঁচাচ্ছেন কেন? জিহাদির গুলি থেকে বেঁচে গেছে বলে দুঃখ হচ্ছে?"

স্বরাজ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় সংলাপের উৎসের দিকে। গুলজার

আহমেদ একটু দূরেই বসেছিল। আরিফার মৃতদেহের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী ভাবছিল কে জানে। ওর মুখ দেখে বোঝাই দায় মনের মধ্যে কী চলছে। একমাত্র বোনের মৃত্যুতে যতখানি ভেঙে পড়ার কথা, তেমন প্রবল শোক আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

গুলজারের দিকে তাকিয়েছেন ক্যাপ্টেন দত্তা। যুক্তিটা জোরদার মনে হয়েছে তাঁর। নয়তো সাধারণ একটা ছেলেকে তাড়া করবে কেন জিহাদির গ্যাং। তবু বাজাতে ছাড়লেন না।

"তুমি তো গুলজারের মেহমান..." তিনি বাক্যটা শেষ করার আগেই ভেসে এল বরফশীতল প্রতিবাদ, "ও ভরত শেরগিলের মেহমান। আমার নয়।"

ক্যাপ্টেন দত্তা একটু থেমে বললেন, "সরি, ভরত শেরগিলের মেহমান। দাদাজিকে হসপিটালাইজ করতে নিয়ে গিয়েছিলে। তবে অত রাতে নিচে নেমে এলে কেন? তাও একা?"

এবার সড়াৎ করে মিথ্যে কথাটা বলেই ফেলল স্বরাজ। সে বুঝে গিয়েছে, গুলজার তাকে এই মুহূর্তেও সাপোর্ট করছে। তাই এবার সাহসে ভর করে বলেই ফেলল, "সিগারেট খেতে নেমেছিলাম সাব। হাসপাতালে সিগারেট খাওয়া যায় না।"

সহজ ও অকাট্য যুক্তি। ক্যাপ্টেন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, "তারপর?"

"ওই পাঁচজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। একজন আমার কাছে মাচিস চাইল। যখন মাচিস ধরাল, তখনই দেখলাম ওর কোমরে গোঁজা বন্দুক... আর..."

গল্পটা চমৎকার বানিয়েছিল স্বরাজ। বিশ্বাস না করে ক্যাপ্টেনের উপায় ছিল না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে ছেড়ে দিলেন। গুলজার তখনও মুখ নিচু করে বসেছিল। আজ ভোরেই তাকে আরিফার মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়েছে। কী করতে গিয়ে মারা গিয়েছে তাও জানিয়েছেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন। দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন, "সরি। আমরা ওকে বাঁচাতে পারিনি।"

ক্যাপ্টেন দত্তার গলায় যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল। গুলজার নীল চোখ দুটো তুলে যখন তাঁর দিকে তাকাল, মনে হল ওর চোখে নীলাভ আগুন জ্বলছে। চাপা গলায় বলল, "বেঁচেই বা কবে ছিল আরিফা।" ঝরার আগুনের ফুলকি চোখ ছেড়ে কণ্ঠস্বরে নামল, "আমি গর্বিত, আরিফা আর্মির দেওয়া খয়রাতের জীবনের চেয়ে জিহাদির গুলিতে মৃত্যু বেছে নিয়েছে। ও আর্মিকে মরার আগেও বিশ্বাস করেনি। ঠিকই করেছে।"

ক্যাপ্টেন দত্তা এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া আশা করেননি। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরেও আগুনের আঁচ, "তার মানে জিহাদের স্লোগানগুলো তুমিই ওকে দিয়ে লেখাচ্ছিলে।"

"গুলজার নিজের কাজ কখনও অন্যকে দিয়ে করায় না," গুলজার আহমেদের মুখ পাথরের মতো কঠিন, "একটাই দুঃখ। আমার বোন পাগল হয়েও যা পেরেছে, আমি তা পারিনি। এই কাজটা আমারই করা উচিত ছিল।"

ক্যাপ্টেন স্তম্ভিত। কী বলে লোকটা। উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আচমকা মেজর ভার্মার দিকে চোখ পড়ল। উনি চোখের ইশারায় বারণ করছেন। এত বড় একটা শোকের মধ্যে গুলজার আহমেদের মতো লোককে বেশি না ঘাঁটানোই ভাল।

"তোমার বোনের বডি..."

তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিল গুলজার, "দরকার নেই। পঞ্চনামা করার পর যা খুশি করতে পারেন। ফেলে দিন, কুত্তা দিয়ে খাওয়ান— আপনাদের মর্জি। মরা লোকের কোনও নিজস্ব ইচ্ছে নেই। ভূখ-প্যায়াস নেই। যা খুশি করুন। কিন্তু এবার আমাদের ছেড়ে দিন। আরিফার যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও বেঁচে আছি। এখনও নাশতা হয়নি। পেটে চুহা দৌড়চ্ছে। প্যায়াসে গলা শুকিয়ে গিয়েছে। কাল রাত থেকে দু'জনে একটুও ঘুমোইনি। এখন কি দয়া করে ছাড়বেন?"

"কিন্তু..." ক্যাপ্টেন প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলেন। মেজর ভার্মা ফের চোখের ইশারায় তাঁকে শান্ত হতে বলছেন। গুলজার আহমেদের প্রতি ক্রমাগত বিকর্ষণ বাড়ছে তাঁর। অথচ একটু অদ্ভুত আকর্ষণকেও উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

স্বরাজের জবানবন্দি লিখে নেওয়ার পর ফের অধৈর্য হয়ে উঠল গুলজার। বিরক্ত হয়ে বলল, "এর চেয়ে আমাদের গ্রেফতারই করুন না সাব। জেলে অন্তত দুটো রুটি আর শোওয়ার বালিশ পাব।"

কেউ বলবে যে, একটু আগেই ওর একমাত্র বোন মারা গিয়েছে। বরং সে এখন খাওয়া আর ঘুমের জন্য বেশি ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন দত্তা কথা না বাড়িয়ে বললেন, "এখন যেতে পারো। পরে পুছতাছ করার দরকার পড়লে যেন পাই। তোমরা কেউ এ শহরের বাইরে যাবে না।"

"বহোত খুব।"

গুলজার উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে স্বরাজও দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে এখনও তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। গুলজার আহমেদ মর্মান্তিক দৃষ্টিতে দেখে নিল তাঁকে। বিড়বিড় করে বলল, "না উসকি খতাহ থি, না মেরি সক্কা থি/ বস মুকদ্দর থা, উসকি ভি, মেরি ভি।"

ক্যাপ্টেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই পরিস্থিতিতেও লোকটা শায়রি বলে গেল। এর অর্থ কী।

"ক্যাপ্টেন," মেজর ভার্মা ডাকলেন, "একবার আমার কেবিনে এসো।"

"ইয়েস স্যার।"

তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখলেন। তারপর গুটি-গুটি চলে গেলেন মেজর ভার্মার ঘরে। মেজর ভার্মা তখন টেবিলের উপর একগাদা ফাইল রেখে তন্ন-তন্ন করে কী যেন খুঁজছিলেন। তাঁকে দেখে ইশারায় বসতে বললেন।

"স্যার, ওই গুলজার আহমেদ লোকটা ঠিক নয়।"

"কেকেখাঁ ঠিক ছিল? চিরকালই অমন ট্যারা। ছাড়ো ওকে।" মেজর ভার্মা ফাইলের স্তূপ ঘাঁটতে-ঘাঁটতেই বললেন, "আর কোনও ইনফর্মেশন পেলে?"

"এই আতঙ্কবাদীরা সবাই বোধহয় লোকাল লোক স্যার," ক্যাপ্টেন বললেন, "ওদের পকেট থেকে তিনদিন আগের লোকাল খবরের কাগজের কাটিং আর পহেলগাঁও টু শ্রীনগর বাসের টিকিট বের করেছে পুলিশ।"

"কোন কাটিং? ইমামসাবের আসার খবরটা?"

এবার অবাক হওয়ার পালা ক্যাপ্টেনের, "কী করে বুঝলেন?"

"ইন্ট্যুইশন ক্যাপ্টেন, ইন্ট্যুইশন," বলতে-বলতেই তিনি লাল রঙের বিশাল একটা ফাইল বের করে ফেলেছেন। ফাইলটা ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "এই মুহূর্তে গুলজার আহমেদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ফাইলটা। এটা দু'দিনের মধ্যেই পড়ে শেষ করে ফেলবে। টপ সিক্রেট ফাইল। দেখবে, আর কারওর হাতে না পড়ে। এটা পড়ে আমায় তোমার মতামত জানাবে। আর্জেন্ট। আমার মনে হচ্ছে শিশমহলে আরও বড় কিছু হতে চলেছে।"

একঝলক ফাইলটা দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। ওপরেই বড়-বড় করে লেখা আছে 'প্রজেক্ট বিষপুত্র, টপ সিক্রেট।' হতাশ কণ্ঠে বললেন, "তবে কি গুলজার আহমেদকে ছেড়ে দেব স্যার?"

"ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ক্যাপ্টেন," মেজর ভার্মা গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যেতে দেওয়া আর ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। চব্বিশ ঘণ্টা ওর উপর নজর রাখো। পারলে তুমিই টিম নিয়ে নজরদারি করো। আর ইন দ্য মিনটাইম, ফাইলটাও পড়ে শেষ করে ফেলো।"

"অ্যাফার্মেটিভ স্যার!"

আর্মি অফিস থেকে বের হয়েই গুলজার সোজা ঢুকে গেল কাছেরই একটা ধাবায়। তার মুখ এখনও ভাবলেশহীন। যেন কিছুই হয়নি। স্বরাজ আপনমনেই ভাবে, আরিফা আপৌ ওর নিজেরই বোন ছিল তো? নাকি বোনের পরিচয়ে অন্য কেউ? অন্য কিছু? যেভাবে রাতে আরিফা

গুলজারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমন ভাবে কি কোনও বোন দাদার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে? বোনের মৃতদেহ দেখার পর কি কোনও দাদাও এমন নিস্পৃহ থাকতে পারে? কে জানে।

"আরে। গুলজার মিঞা।" ধাবার মালিক সম্ভবত চেনা লোক। তাকে দেখেই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ওঠে, "দো প্লেট পরাঠা ঔর চিকন দোপেঁয়াজ্জা!"

গুলজার বিরক্ত হয়, "যেমন ভঁইসের মতো চেহারা, তেমন বুদ্ধি। পেহলে পুছ তো লো।" সে স্বরাজের দিকে দেখায়, "ও কাটরা। হিন্দু ব্রাহ্মণ। ওকে চিকেন খাওয়াবে তুমি?"

"দো প্লেট পরাঠা ঔর পনির।"

স্বরাজের গলা দিয়ে তখনও খাবার নামছে না। তার বুক ধড়ফড় করছে। পেটের ভিতরে চাপা অস্বস্তি। আর্মি এত সহজে ছাড়বে ভাবতে পারেনি। কিন্তু তার যে আবার উভয় সঙ্কট। কিছুতেই স্বস্তি নেই। আর্মি ছাড়ল, কিন্তু লালা ছাড়বে কি? সে এখন প্রায় নিশ্চিত যে, গুলজার আহমেদই লালার খবরি। নয়তো ইসমাইলরা জানল কী করে যে, সে হাসপাতালে আছে? আর্মির হাত থেকেও একরকম সে-ই বাঁচিয়েছে! কায়দা করে আর্মির কাছ থেকে বের করে আনল স্বরাজকে। ইসমাইলরা পারেনি। এবার হয়তো লালা কোনও চালই নেবে না। হয়তো গুলজার নিজেই তাকে খুন করবে।"

এতক্ষণ খুব মন দিয়ে খাচ্ছিল গুলজার। এবার মুখ তুলে স্বরাজের অবস্থা দেখে বলল, "চিন্তা-ভাবনা পরে করবে। এখন খেয়ে নাও। গুরপ্রীত আজ সকালে তোমার জন্য নাশতা করতে পারবে না। দাদাজিকে দেখতে যাওয়ার পালা এবার ওর। আর নার্গিসের কাছে ঝাঁটার বাড়ি ছাড়া আর কোনও খাওয়ার জিনিস পাওয়া যাবে না। অতএব জলদি-জলদি ঠুসলো।"

এ আদেশ অলঙ্ঘ্য। অগত্যা তাড়াতাড়ি খাবার উদরসাৎ করল সে। খেতে-খেতে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে গুলজার আহমেদকে দেখে নিচ্ছিল। নিজের বোনটা মরে গেল, অথচ লোকটা দিব্যি নিস্পৃহ মুখে খাবার খাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি। লালার মুখেও এমনই একটা নিরাসক্তি কাজ করে। কোনও রকম দুঃখই প্রভাব ফেলতে পারে না। অবিকল এমনই। লালার জাতভাই না হয়ে যায় না।

পেটে বোমা, আর নাকের সামনে জল্লাদ বসে থাকলে কার পক্ষেই বা ভাল করে খাওয়া সম্ভব? আবার না খেলে লোকটা কী মনে করবে কে জানে। তাই প্রাণের দায়ে যতখানি সম্ভব ফেলে-ছড়িয়ে খেল। গুলজার খাওয়া শেষ করে তার দিকে তাকিয়েছিল। স্বরাজ ক্রমাগত ওর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যাচ্ছে। লোকটার দৃষ্টিটা অদ্ভুত। নীল চোখের অতলান্তে কী যে লুকিয়ে আছে, বোঝা মুশকিল।

"হয়ে গেছে।"

"খতম?" গুলজার উঠে দাঁড়িয়েছে, "পান, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, খৈনি— কোনও একটা চলবে?"

"জি?" সে ঘাবড়ে যায়।

"মানে আমার এখন কোল্ডড্রিঙ্ক, বেনারসি পান আর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিং সাইজ দামি সিগারেট। তুমি খাবে?"

স্বরাজ ভেবে পায় না তার ঠিক কী বলা উচিত। কিছু বুঝতে না পেরে ভ্যাবলার মতো মাথা নাড়ল।

"ইয়ে হুই না বাত।" সে মাথা ঝাঁকায়, "চলো, সেলিব্রেট করি।"

সেলিব্রেশন। কিসের সেলিব্রেশন করবে। স্বরাজ বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। লোকটার মাথার ঠিক আছে তো?

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা পান-বিড়ির দোকান থেকে বেনারসি পান আর দামি সিগারেটের আস্ত প্যাকেট কিনল গুলজার। তারপর কোল্ডড্রিঙ্কের দোকানে দুটো পানীয়ের অর্ডার দিল। স্বরাজ হাঁ করে তার কাণ্ড দেখছে। আজ পর্যন্ত গুলজারকে সে পান, সিগারেট খেতে দেখেনি। সাধারণ দাঁত মাজার তামাক আর খৈনিই ছিল তার নেশা। অথচ এখন লোকটা রীতিমত দামি সিগারেটের প্যাকেট কিনে বসে আছে। এই আকস্মিক বিলাসিতার কারণ সে শত ভেবেও খুঁজে পেল না।

কোল্ডড্রিঙ্কের বোতলে চুমুক দিয়ে আপনমনে হাসছে গুলজার। স্বরাজের ব্যথাতুর দৃষ্টি লক্ষ করে বলে উঠল, "'দর্দ কো না দেখিয়ে দর্দ সে,/ দর্দ কো ভি দর্দ হোতা হ্যায়/ দর্দ কো ভি হ্যায় জরুরত প্যায়ার কী/ আখির প্যায়ার মেঁ দর্দ হি তো হমদর্দ হোতা হ্যায়।' শুধু আনন্দের উৎসব করলেই চলবে ভাই? দর্দেরও সেলিব্রেশন হওয়া উচিত। আনন্দ ক'দিন থাকে? কিন্তু সব সময়ই দর্দ তোমার হমসফর। এই দুনিয়ায় যন্ত্রণা যার নেই, সে সবচেয়ে সুখী মানুষ। আর সেই সুখী ইনসান আদতে মৃত। যার জীবনে ব্যথা নেই, তার আবার জীবন কিসের? তাই আমি দর্দকে ভালবাসি। একমাত্র সে-ই বুঝিয়ে দেয়, ভাই গুলজার, তুই এখনও বেঁচে আছিস।"

স্বরাজের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়ছে। সে কী বলবে ভেবে পায় না। একটা প্রশ্ন মাঝেমধ্যেই তার মুখে এসে আটকে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই।

"তখন থেকে কী ভাবছ বলো তো?" একটা সিগারেট বের করে তার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়েছে সে, "এরকম বোকার মতো পিটপিট করে না তাকিয়ে থেকে যা জিজ্ঞাসা করার, একদম স্ট্রেট করো। তোমার নিয়ত ঠিক লাগছে না আমার। মনে মনে গাল দিচ্ছ কিনা কে জানে।"

"কী বলব?" সে আস্তে-আস্তে বলে, "যা বলব, আপনি তো তার উলটো মানে করবেন।"

এবার সজোরে হেসে উঠল গুলজার, "এতদিনে ঠিক চিনেছ। তবু কোশিশ তো করো।"

"থাক," মনে-মনে বাকি কথাগুলো বলল স্বরাজ, "আমার এখনও প্রাণের মায়া আছে।"

"ঠিক হ্যায়।" মৃদু-মৃদু হাসছে গুলজার, "কথা দিচ্ছি, উলটো মানে করব না। পুছ লো যো পুছনা হ্যায়। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবে না। আর্মির বিষয়ে আমি কিছু বলব না। আর বিছানার নিচে টাকাটা কোথা থেকে এল সে কৈফিয়ত দেব না। এছাড়া যা খুশি জিজ্ঞাসা করো। উত্তর পাবে।"

"আপনি কি জিহাদিদের সমর্থন করেন?"

অদ্ভুত কৌতুকে ওর দিকে তাকাল গুলজার। একটু মাথা নাড়ল, "জরাসি ছুট দিলাম বলে একেবারে অ্যাটম বমটাই মাথায় ফেললে কাটরাসাব? তবু প্রশ্নটা একটু ভুল ভাবে পেশ করলে। জিজ্ঞাসাই করবে যখন ঠিকঠাক ভাবে জিজ্ঞাসা করো। জিজ্ঞাসা করো, আপনি কি জিহাদি?"

স্বরাজ কথা না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। গুলজার কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। সিগারেটটা ধীরে সুস্থে শেষ করে অবহেলাভরে ছুড়ে দিল রাস্তায়। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি তো হিন্দু। ঠাকুর দেবতাকে বিশ্বাস করো। তোমাদের ভোলে-বাবা, মানে শঙ্করজির লাইফ হিস্ট্রিটাই দেখো। বোকার মতো জিজ্ঞাসা করবে না, আমি মুসলমান হয়ে কী করে জানলাম। বছরের পর বছর অমরনাথের পথে হিন্দু সওয়ারি নিয়ে গিয়েছি। ওখানে যারা ফুল বেচে, ছবি বেচে, পুজোর জিনিসপত্র বিক্রি করে রুটি রোজগার করে, তারা সবাই মুসলমান। আর তারা তোমার চেয়েও ভাল হিন্দু দেবদেবীর গল্প জানে।"

শঙ্কর দেবতার গল্প স্বরাজও জানে। তাই কোনও প্রশ্ন না করে চুপচাপ শুনে যায়।

"লোকটার নসিব দেখো। সও কড়োর দেবতা কো তুমহারে পুরাণ নে মক্কে মে রকখা, পর ইসকো তিখারি বনাকে ছোড় দিয়া। 'বিচারা' থাকে একেবারে বরফিলা পাহাড়ের মাথায়। চতুর্দিকে বরফ হি বরফ। এর মধ্যে বেচারিকে পরতে কী দিয়েছে।" হাসতে-হাসতেই বলল গুলজার, "মাত্র একখানা বাঘছাল। উয়োহ ভি পুরা বদন মেঁ নহীঁ। শীতে হি-হি করে কাঁপে। স্বর্গে বসে অন্য দেবতারা মণ্ডামিঠাই খাচ্ছেন, নর্তকীর নাচ দেখছেন আর এ বিচারা হাতে কটোরা নিয়ে দোরে-দোরে

AMARBOI.COM

ভিক্ষা চেয়ে পেট ভরাচ্ছে। বড় বউটা মরে গেল, তারপর রেগে-মেগে তপস্যা নিয়েই শান্তিতে ছিল। কিন্তু হাঁটুর বয়সি ছোট বউ তার মধ্যেই নাকের সামনে ধেই-ধেই করে নাচছে। শান্তিতে তপস্যাটাও করতে দেবে না। আর সবাই দিব্যি ইচ্ছেমতো বর দিতে পারে, কিন্তু শঙ্কর বাবাজির তো সে আব্দাদিও নেই। বর দিলেও মুশকিল, না দিলেও মুশকিল। বরের আশায়, দানোগুলো তপস্যা করে কৈলাসে ভূ-কম্প ফেলে দেয়। বর দিলে তো সেই বরের জোরেই, অথবা আত্মহত্যার জন্য অসুরগুলো ও বেচারির পিছনেই হাত ধুয়ে পড়ে। থোড়া কসর বাকি থা, উয়োহ্ ভি নহি ছোড়া। যাতে বেগড়বাই না করে তার জন্য গলায় জ্বহরিলা সাপ আটকে দিল। একেই শীতে হি-হি করে কাঁপছে, তার উপর ভক্তরা মাথায় গ্যালন-গ্যালন জল ঢেলে অতিষ্ঠ করে তোলে। এত কিছুর পরে লোকটা তাণ্ডব করবে না তো কী করবে?"

স্বরাজ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি গুলজার কী বলতে চায়। হচ্ছিল অন্য কথা। আচমকা শঙ্কর ভগবান এর মধ্যে এসে পড়লেন কোথা থেকে? লোকটা বড্ড হেঁয়ালি করে।

গুলজারের মুখ থেকে আস্তে-আস্তে হাসিটা মুছে গেল। সে এবার বলল, "খেমকরণে ইন্ডিয়া-পাক আর্মির যুদ্ধে আমার গোটা পরিবারই ধ্বংস হয়ে গেল। নসিব ভেবে চুপ করে ছিলাম সবাই। অমরনাথে সলমন আর আব্বু চলে গেল। পোড়া নসিবকে গালি দিয়ে চুপ করে থাকলাম। ইন্ডিয়ান আর্মি পিটিয়ে-পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিল। ম্যায় চুপ রহা। জওয়ান আর পুলিশ আরিফাকে বলাৎকার করে পাগল করে দিল। ফিরভি চুপ রহা। বড় বউ বিমার ছিল, মরে গেল। দ্বিতীয় বউটা শান্তিতে থাকতে দেয় না। দিন আনি দিন খাই, জমিতে জায়গা নেই, জলের উপর কোনও মতে বাঁচি। তার উপর গলায় জ্বহরিলা সাপের মতো ইন্ডিয়ান আর্মি চেপে বসে রয়েছে। জিহাদিদের সাপোর্ট করো তো আর্মি মারবে। আর্মিকে সাপোর্ট করো তো জিহাদি মারবে। কাউকে সাপোর্ট না করলে দু'জনই মারবে।" চোখ দুটোয় চরম আক্রোশ জ্বেলে গুলজার বলল, "এর পরও যদি আমি জিহাদি হয়ে যাই, তবে কি খুব অন্যায় হবে কাটরাসাব? ভগবান হয়েও শঙ্করজির সহ্যের সীমা আছে। আর আমি তো মানুষ।"

কথাটা শুনে শিউরে ওঠে স্বরাজ। তার আর কোনও সন্দেহ নেই। গুলজারই লালার লোক। আর কেউ হতেই পারে না।

কুড়ি

শিশমহলে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বরাজ। যতক্ষণ গুলজার আহমেদের সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে ছিল। যতবার ও পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, ততবারই মনে হচ্ছিল এই বুঝি একটা আস্ত ছুরি বের করে বুকে বসিয়ে দিল। শেষপর্যন্ত যে সশরীরে এসে পৌঁছতে পেরেছে, এটাই তার কপাল। সৌভাগ্য বলতে হবে, শিকারা ঘাটের কাছে এসে গুলজার তাকে ছেড়ে দিল, "তুমি একাই ফিরে যাও। গুরপ্রীতকে বোলো দাদাজিকে যেন সময়মতো দেখতে যায়।"

"আপনি আসবেন না?"

"আমি গেলে ধাবার ডিউটি কে দেবে?" গুলজারের চোখে ব্যঙ্গ, "তুমি।"

বেশ কিছু দিন ধরেই বৃষ্টি নামছে। কাশ্মীরে এরকম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়। এখন বর্ষারই মরশুম। শ্রীনগরে তেমন ঠান্ডা নেই এখন। কিন্তু পহেলগাঁও এইটুকু বৃষ্টিতেই প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে যায়।

পহেলগাঁও-এর কথা মনে পড়তেই কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল স্বরাজের। পহেলগাঁও-এর ঠান্ডা বাতাসই যেন চিলিক করে বৈদ্যুতিক শীতলতা বইয়ে দিল তার দেহে মনে। কাল রাতে আর্মি না এসে পড়লে...

কিন্তু এখন কী করবে? শিশমহলের দিকে যেতে-যেতে ঠান্ডা মাথায় সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিল স্বরাজ। এখন সে নিশ্চিতভাবে জানে গুলজার আহমেদ লালার লোক। এবং যে-কোনও কারণেই হোক, রিমোটটা তার হাতে নেই। গুলজার হয় তাকে মেরে ফেলে লাশটা লালার কাছে পাচার করে দেবে, নয়তো রিমোটটা প্রাণপণে খুঁজে বের করবে। ইমামসাবের আসতে আর দেরি নেই। তাঁকেই যদি ওড়াতে না পারল, তবে মানববোমা বানানো কী জন্য? স্বরাজকে মরতেই হবে। হয় দু'দিন আগে, নয় দু'দিন পরে।

কিন্তু স্বরাজ যদি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে? তাহলে তো থেকে যাচ্ছে বাঁচার সম্ভাবনা। গুলজার ধাবায় গিয়েছে। স্বরাজের উপর নজর রাখার কেউ নেই। এই সুযোগটা নেওয়া যায় না? কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে? আর্মি তাকে শহর ছাড়তে বারণ করেছে। এখন লালার লোক পিছনে পড়েছে, এরপর আর্মি আর পুলিশও পড়বে। মানববোমা জানলে আগেই গুলি করে মারবে। তারপর পেট কেটে বের করবে বোমাটা।

দাঁতে দাঁত চাপল স্বরাজ। যাই হয়ে যাক, আজ রাতেই যে করেই হোক পালিয়ে যাবে। শিশমহলে রাত ন'টার পর সবাই শুয়ে পড়ে। তখন রাস্তা ফাঁকা। পালাবার সেই সুবর্ণ সুযোগ। তারপর দেখা যাবে।

শিশমহলের লোকেরা তখনও ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যতটা না ভরতের দাদাজির জন্য চিন্তান্বিত, তার থেকেও বেশি আরিফার মৃত্যুসংবাদে শোকগ্রস্ত। আফসানা, নার্গিস, গুরপ্রীত, বিলাল-সহ আরও অনেকে ভিড় জমিয়ে বসেছিল ভরতের বাড়ির চিলতে বারান্দায়। স্বরাজকে আসতে দেখে তাকে নিমেষে ছেঁকে ধরল।

"তুমি একা। গুলজারভাইজান এলো না?" গুরপ্রীত প্রথমেই প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়।

"না, ভাইজান ধাবায় গিয়েছে।" সে উত্তর দেয়, "তোমায় দাদাজির সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।"

গুরপ্রীত সজল চোখে মাথা ঝাঁকায়, "আহো।"

নার্গিস চুপ করে বসেছিল। আরিফার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর একটি কথাও বলেনি। বোঝা যায়নি এই নীরবতা দুঃখের না নিশ্চিন্ততার। এতক্ষণে কড়কড়ে গলায় বলে ওঠে, "আরিফা গুলি খেয়ে মরে গেল, আর তার পেয়ারের ভাইজান এখন ধাবায় গিয়ে ঢুকেছে। বাঃ। কেয়া বাত।" ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় তার চোখে জল এসে পড়েছে। সে চোখ মুছে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে জানায়, "বলেছিলাম না। পাথর... পাথর... লোকটা পাথর।"

বিস্ময়ের ধাক্কায় নার্গিসের দিকে তাকায় আফসানা। আরিফার জন্য ওর আবার কবে এত দরদ হল যে, সে মারা যাওয়ায় চোখের জল ফেলছে! বরং ও মরলেই তো তার বাঁচার কথা।

গুরপ্রীতের চোখেও জল এসে গিয়েছে, "গুলজারভাইয়ের জন্যই দুঃখ হয়। ওর আর কেউ থাকল না।"

মুহূর্তে নার্গিসের চোখ জ্বলে ওঠে, "ওঃ, আচ্ছা। গুলজারের শুধু বোনই ছিল। আর কেউ ছিল না, তাই না? কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেছ, কেন ও লোকটার সঙ্গে ঘর করছি আমি? কীভাবে ঘর করছি? অনেক গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি, মেরেছি বকেছি, কিন্তু একসঙ্গে থেকেছি। একবারও ভেবে দেখনি যে, আমার কেমন লাগে? নিজের পুরুষ যখন বুকের উপর দিয়ে হেঁটে দুসরি ঔরতের ঘরে ঢোকে, তখন কেমন লাগে বোঝো তোমরা?" বলতে-বলতেই সে কেঁদে ফেলেছে, "রোজ শয়তানী নঙ্গি হয়ে বসে থাকত ওর ভাইজানের জন্য। জীবনে কখনও কোনও বোনকে তার দাদার সামনে ওভাবে যেতে দেখেছ? আমি নিজে শরম সে পানি-পানি হয়ে যেতাম। ইচ্ছে করলে কি আরিফাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারতাম না? কেন পারিনি জানো? কারণ, আমি জানতাম আরিফা গুলজারের 'জান'। আর গুলজার আমার!" বলতে-বলতেই হুড়মুড় করে উঠে গেল নার্গিস।

আফসানা চুপ করে তাকিয়েছিল। নার্গিস কী বলল? আরিফা গুলজারের 'জান', আর গুলজার ওর। একথা তো নতুন শুনছে সে। নার্গিসের মতলবটা কী? আরিফা বেঁচে থাকতে যে-দাম্পত্যজীবন ভেঙে গিয়েছিল, তাকে ফের জোড়া দেওয়ার কথা ভাবছে নাকি?

ভাবতে-ভাবতেই তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। গুলজার এখনও তার

AMARBOI.COM

মুঠোর মধ্যে পুরোপুরি আসেনি। সে কি তবে নার্গিসেরই জন্য? এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার তাদের মিলন হয়েছে। কিন্তু তৃষ্ণা কমেনি। বরং ক্রমাগত লেলিহান হয়ে উঠেছে কামনা। আফসানা কী করেনি। লজ্জার মাথা খেয়ে সুযোগ পেলেই কেড়ে নিয়েছে তাকে। দু'হাতের আলিঙ্গনে টেনে এনেছে কাছে। আদরে-আদরে পাগল করে দিয়েছে। তবু গলেনি গুলজার। চরম দুর্বল মুহূর্তে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে আফসানা, "বলো, আমায় ভালবাসো।"

"না।"

"বলো, ভালবাসো। নয়তো খুন করব।"

গুলজার উঠে বসে শান্ত স্বরে বলেছে, "সেটাই বরং কর। ভালবাসি না।"

রেগে গিয়েছে আফসানা। অপমানে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। গুলজারকে ছেড়ে দিয়ে বলেছে, "তবে আমার কাছে আসো কেন?"

সপাটে উত্তর, "তোর শরীরের নেশা লেগে গিয়েছে। এই জওয়ানি দিয়ে বিলালের মাথাটা খেতে পারিসনি। তাই খেপে গিয়ে এখন বুড়োটাকে নিয়ে যখন-তখন টানাটানি করছিস। আর আমারও মাথাটা গিয়েছে, তাই মেয়ের বয়সি হসিনার বিস্তর গরম করছি।"

"তাহলে আমি শুধু আদত?"

ক্রুদ্ধ আফসানার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসেছিল সে, "নহিঁ রে। জরুরত।"

"আর নার্গিস? সে বুঝি তোমার জান-এ-মন?"

আরও জোরে হেসে উঠেছিল গুলজার, "না, ও আমার জিম্মেদারি।"

"তবে ওকে তালাক দাও না কেন?"

"নেশা ছাড়া যায়," অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গুলজার, "দায়িত্ব ছাড়া যায় না। তোকে তো শুরুতেই সাবধান করেছিলাম, বলেছিলাম আমি মোহব্বত করতে জানি না।"

হতাশায় মরে যায় আফসানা। আর কী করলে লোকটার মন পাওয়া যাবে? তার অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। গুলজার সেটা বুঝেই যেন মজা পায়। তার বুক থেকে কখন যেন ওড়নাটা খসে পড়েছিল। চন্দ্রকলার মতো বুকের ভাঁজ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তা দেখে উদ্বেলিত হওয়া তো দূর, সস্নেহে ওড়নাটা তুলে তার বুক ঢেকে দিয়েছে পুরুষটি। মৃদু হেসে বলেছে, "আজকাল আমায় দেখলেই তোর দুখ্যাটা জিহাদ করছে। সামলে রাখ। নার্গিস দেখতে পেলে মারবে কম, দৌড় করাবে বেশি।"

নার্গিস, নার্গিস আর নার্গিস। আফসানার বাহুবন্ধনে, বিছানায়, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলোতেও গুলজার একবারও নার্গিসের নাম ভোলে না। একটু বেশিক্ষণ থাকতে বললেই বলে, "নার্গিস কী বলবে?" অনেকবার নার্গিসকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছে। আজ আরও প্রবল ভাবে হল। আফসানাও আর বসে থাকতে পারে না। কী যেন ভাবতে-ভাবতে নিজের পথ ধরল।

ওদিকে সবার প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে স্বরাজের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের আর্মি ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিনা, পিটাই করেছে কিনা, আরিফা কেন জিহাদের স্লোগান লিখছিল, আরিফার মৃতদেহ কবে ছাড়বে পুলিশ— একের পর এক প্রশ্নের ধাক্কায় জেরবার সে। কোনওমতে তাদের সন্তুষ্ট করে তাড়াতাড়ি ভিতরের ঘরে চলে গেল স্বরাজ। গুলজার আহমেদ কেন আসেনি, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে। শুধু একটা ব্যাপারে তার বারবার খটকা লাগছিল। এত প্রশ্ন করল সবাই, কিন্তু একটা কথা কেউ জানতে চাইল না। আরিফা আর্মির গুলিতে মরেছে, না জিহাদির গুলিতে শেষ হয়েছে, তা নিয়ে কারওর মাথাব্যথা নেই।

আপনমনেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বরাজ। মাথাব্যথা করবেই বা কেন? মৃত্যুটাই ওদের ভবিতব্য। আর্মির গুলি হোক কি জিহাদির— সব সময় ওরাই মরে। তাই বুলেটের জাত নিয়ে চিন্তা করেই বা কী করবে?

বিকেল থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, রাতে একেবারে মারমার কাটকাট। শিশমহলের বাসিন্দারা কখনওই এমন তুমুল বৃষ্টি পছন্দ করে না। জরাজীর্ণ কাঠের ফুটিফাটা ছাত চুঁইয়ে জল পড়ে, বিছানা ভিজে যায়, মেঝেও পিছল হয়ে ওঠে। বেচারিরা জলের পাত্র, বালতি নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ে। যাদের বাড়ি দোতলা, তারা তবু রেহাই পায়। কিন্তু কাঠামো একতলা হলে বেশিরভাগ মানুষই কোনওমতে এককোণে পড়ে থেকে নিজেদের ভেজার হাত থেকে বাঁচায়! তাই বৃষ্টির প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশমহলে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব ওঠে।

চিরদিনের শান্ত শিশমহলে তাই একটু আগেও চেঁচামেচির অন্ত ছিল না। ছোট-বড় গলার নানারকম চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। তার মধ্য থেকেই সুস্পষ্ট শঙ্খধ্বনি। কয়েক ঘর হিন্দু পরিবার থাকে এখানে। তারাই শাঁখ বাজিয়ে প্রকৃতিকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মেঘের ধমক, চমক ও বিদ্যুতের চোখ রাঙানিতে স্পষ্ট— এ দুর্যোগ সহজে থামবে না! এখন অবশ্য শাঁখের আওয়াজ থেমেছে। শিশমহলের আলোগুলোও নিভে গিয়েছে। হয়তো কোনওমতে একটু শুকনো আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে ওরা।

ক্যাপ্টেন দত্তার মুখে চিন্তার ছাপ। এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই। তার উপর এ আবার কী বিপত্তি। যে-হারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তেমনই চলতে থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। শিশমহলের ঘরগুলো এই দুর্যোগ ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আবহাওয়া দফতরের কপালেও চিন্তার ভাঁজ প্রকট। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ফের গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

কাল রাতের ঘটনার পর থেকে শিশমহলে আর্মির প্রহরা আরও বেড়েছে। কাল রাতের ঘটনা যদি আরিফাতেই গিয়ে শেষ হত, তবে সমস্যা ছিল না। কিন্তু জিহাদি অ্যাটাক, আরিফার জিহাদের স্লোগান লেখা ও তার পিছনে একজন মাস্টার মাইন্ডের থাকার সম্ভাবনা, শিশমহলে অপরিচিত মুখের আগমন, জিহাদিদের পকেটে ইমামসাহেবের গতিবিধিসূচক খবরের কাগজের কাটিং— সব মিলিয়ে অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে। আর সেই সঙ্কেত আসছে শিশমহল থেকেই। তাই ঝড় হোক কী ভূমিকম্প, আর্মিকে সচেতন থাকতেই হবে।

"জনাব, শিশমহলটা কোন দিকে?"

প্রশ্নটা যেন হাওয়ায় উড়ে এল। ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কই, আশেপাশে আর কোনও নৌকো নেই তো। আর কোনও নৌকো এলে অন্তত দাঁড়ে জল কাটার শব্দ পেতেন। এমন নিঃশব্দে আসত না। অন্য সময় হলে ভাবতেন নানাবিধ শব্দের মধ্যে তাঁরই শোনার ভুল হয়েছে। কিন্তু মহারাণাও মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নটা সত্যিই কেউ করেছে! ক্যাপ্টেন সচকিত হয়ে বললেন, "কে? কে বলছেন?"

হঠাৎই জলের মধ্যে থেকে একটা ছায়ামূর্তি ভুস করে ভেসে উঠল আর্মি বোটের সামনে। শঙ্কিত হয়ে টর্চটা জ্বালিয়ে ছায়ামূর্তির মুখে ফেললেন ক্যাপ্টেন। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। ভেজা লম্বা চুল মুখের অনেকটাই আবৃত করে রেখেছে। টর্চের আলোয় শুধু ঝিকিয়ে উঠল নীল চোখদুটো। একটু অপ্রকৃতিস্থ হেসে, স্খলিত, নেশাজড়িত কণ্ঠে বলল, "বজিচা-এ-অফতাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে/ হোতা হ্যায় শব-ও-রোজ তমাশা মেরে আগে! এতটুকু দুনিয়া, তবু শিশমহলটা খুঁজে পাচ্ছি না কেন বলুন তো?"

মহারাণা কড়া সুরে বলল, "কে রে অসময়ে শায়রি আওড়াচ্ছিস!"

"ডুবা হুয়া মুসাফির," আবার হেসে উঠল সে, "জিসকা কোই নহিঁ!"

ওই চোখ, কণ্ঠস্বর ও গালিব... চিনতে অসুবিধে হয়নি ক্যাপ্টেনের। কিন্তু কথাগুলো শোনার পর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। কী বলল ও? শিশমহল খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাও এত রাত্রে, এই বৃষ্টির মধ্যে! এভাবে সাঁতরে সাঁতরে।

কথা না বাড়িয়ে ক্যাপ্টেন হাত এগিয়ে দিলেন তার দিকে, "না থা কুছ তো খুদা থা, কুছ না হোতা তো খুদা হোতা।"

বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে বোটে উঠে মানুষটা। চুলগুলোকে মুখের উপর থেকে সরিয়ে সকৌতুকে বলল, "উহুঁ, খুদা নয়, 'ডুবোয়া মুঝকো

হোনি নে, না হোতা ম্যাঁয়, তো ক্যায়া হোতা?'"

মহারাণা আপনমনেই গরগর করে, "জ্বালিয়ে মারল ব্যাটা। একেই অর্ধেক কথা বুঝি না। তার উপর জাতে মাতাল, তালে ঠিক। মরে গেলেও 'খুদা'র নাম বলবে না! হাত ধরে তো তুললেন। কিন্তু আমরা আর্মি বুঝলেই তেড়ে কামড়াতে আসবে।"

ক্যাপ্টেন একবার লোকটার দিকে তাকালেন। সে বোটের ওপর বসার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। নাক অবধি নেশা করে আছে। তিনি নিচু স্বরে বললেন, "এখন কামড়াবে না মহারাণা। যে নিজেই হুঁশে নেই, সে বুঝবে কী করে যে, আমরা কারা?" তারপরই গলা চড়িয়ে বলেন, "জনাব, বসে থাকতে অসুবিধে হলে শুয়েই পড়ুন না।"

"না। আমি ঠিক আছি," অন্যদিক থেকে উত্তর আসে, "শুক্রিয়া। আমাকে একটু শিশমহলে পৌঁছে দিতে পারেন? রাস্তাটা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।"

"তা পাবে কী করে?" মহারাণা ফের গরগর করল, "যেমন নেশা করেছ তারপর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না, কোঠেওয়ালির ঠিকানা ছাড়া। বলো তো সেখানেই পৌঁছে দিই।"

মহারাণা কথাগুলো নিচুস্বরেই বলেছিল। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল সে ঠিকই শুনতে পেয়েছে। জোরে হেসে বলল, "আমার শিশমহলই ঠিক আছে। সেখানেই পৌঁছে দিন। বহোত মেহেরবানি হোগি।"

"বা-বা। এ যে দেখছি বিনয়ের অবতার।" মহারাণা বলে, "তা এ অবস্থা হল কী করে মিঞা? ক'বোতল কুটচি শরাব গিলেছ বল্যো দেখি? গন্ধের চোটে যে টিকতেই পারছি না।"

"বেশি নয়!" মানুষটা বলল, "পেহলে পেহল। তাই একটু বেলাগাম হয়ে গিয়েছি।"

ক্যাপ্টেন বুঝলেন জীবনে এই প্রথমবার ও নেশা করেছে। তিনি মহারাণাকে ইংরেজিতে বললেন, "শিশমহলই চলো। তবে যতক্ষণ না আমি বলছি, ততক্ষণ ওদিকে নেবে না। তার আগে যতবার পারো ডাল লেকের চক্কর কাটতে থাকো।"

মহারাণা মাথা নাড়িয়ে বলে, "ইয়েস স্যার।"

ক্যাপ্টেন দত্তা বুঝেছিলেন, এই সঠিক সময়। এর থেকে দুর্বল অবস্থায় গুলজার আহমেদকে আর পাওয়া যাবে না। যদি পেটের ভিতর রহস্য কিছু থাকে, তবে খুঁচিয়ে বের করার এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি ওর পাশে গিয়ে বসলেন, "এত রাতে এই অবস্থায় কোথা থেকে ফিরছ জনাব? এখন তো ধারেকাছে আর নৌকোও নেই। যদি ডুবে যেতে?"

গুলজার মুচকি হাসল, "ডোবার চেষ্টাই তো করছিলাম। প্রথমে কুটচি শরাব খেয়ে দেখলাম। এই শরাব খেয়ে শ'য়ে শ'য়ে লোক মরেছিল। আমার নসিব দেখুন— মরলামই না। তারপর নৌকোটা যে কোথায় রাখা ছিল, ভুলে গেলাম। ভাবলাম, সাঁতার কাটতে গিয়ে যদি ডুবে মরে যাই... হয়তো যেতামও, কিন্তু আপনি কিছুতেই মরতে দেন না যে। যতবার মওত সামনে এসে দাঁড়ায়, আপনি ঠিক টপকে পড়েন!"

"আমি।" এবার ক্যাপ্টেন হতবাক। মহারাণাও চমকে মুখ ফিরিয়েছে। বলে কী লোকটা। অতগুলো কথা বলে হয়তো একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গুলজার। ক্যাপ্টেন তাকে ফের খোঁচালেন, "আমি আবার কী করেছি?"

"আমায় চিনতে পারেননি আপনি। আমার জিন্দগিতে আপনি কী করতে বাকি রেখেছেন সাব। কখনও আগুনের মধ্য থেকে টেনে বের করে আনেন। কখনও জলের মধ্য থেকে টেনে তোলেন! আমায় শান্তিতে মরতেই দেন না।" গুলজার এবার ভুরু কুঁচকেছে। কিছু যেন মনে করছে, "তখন লেফটেন্যান্ট ছিলেন। এখন দেখছি ক্যাপ্টেন হয়েছেন। কিন্তু হুবহু সেই একই আদত। সেদিনও আপনি বন্দুকে বাঁচিয়েছিলেন। খেমকরণে আপনার পিঠ পুড়ে গিয়েছিল মনে আছে? সে অবশ্য বহু বছর আগের কথা। আপনার এহসান বইতে-বইতে আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আপনি কিন্তু একটুও পালটাননি সাব। এখন জখম ভরে গিয়েছে তো?"

এবার চোখের সামনে গোটা ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের। খেমকরণ অগ্নিকাণ্ডে ছ'বছরের শিশু গুলজারকে নিয়ে জ্বলন্ত বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল যে-জওয়ান, সে ওঁর বাবা লেফটেন্যান্ট দত্তা। আর কয়েক দিন আগে একটা দশ বছরের শিশুর হাত ধরে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। গুলজার আহমেদের সেই দৃষ্টি... যেন কিছু বলতে চায়, যেন কিছু খুঁজছে... সেই সন্দেহ চাউনি... লেগ পুলিং... আজকের সকালের শায়রিটা... আপনমনেই বিড়বিড় করলেন তিনি, "না উসকি খতাহ থি, না মেরি সজা থি/ বস মুকদ্দর থা, উসকি ভি, মেরি ভি।" যার সঙ্গে শত্রুতা করছে তার দোষ ছিল না, ওর নিজেরও শান্তি ছিল না, ভাগ্যের দোষে যাদের বন্ধু হওয়ার কথা তারা শত্রু হয়ে দাঁড়াল। অনেকদিন পরে যদিও বা কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে সংযোগ হল, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই গেল সব ভেস্তে— 'বনি থি কুছ ইক উসসে, মুদ্দত কে বাদ/ সো ফির বিগড়ি পেহলি হি সোহবত কে বাদ।'

ক্যাপ্টেন স্তম্ভিত। এই জন্যই পানওয়ালাটাকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল গুলজার। আসলে ক্যাপ্টেন দত্তাকে নৃশংসতার দায় থেকে বাঁচাচ্ছিল। রাঠৌরের মারকে অগ্রাহ্য করেও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। ক্যাপ্টেন দত্তা হুবহু ওঁর বাবার চেহারা পেয়েছেন। গুলজার শুরু থেকেই জানত তিনি ওর রক্ষাকর্তার ছেলে। তাই শত্রুতার মধ্যেও স্নেহের ছাপ পড়ে গিয়েছে।

"সাব। ঘর মেঁ সব ঠিক হ্যায় না?"

তাঁর সম্বিৎ ফিরল। অন্তরের আবেগকে সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সব ঠিক। তোমার বোনের খবর কী? আরিফা কেমন আছে?"

শেষ প্রশ্নটা করার সময়ে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। এই লোকটার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কী পাপটাই না করছেন। তবু একবার যাচিয়ে দেখতেই হয়।

"উঁহু, গলতি হল," গুলজার মাথা নাড়ছে, "আরিফা আমার বোন নয়, মেয়ে।"

এবার দ্বিগুণ আশ্চর্য হওয়ার পালা। ক্যাপ্টেন দেখলেন মহারাণাও হাঁ করে এদিকেই দেখছে। কোনওমতে বললেন, "আরিফা তোমার বোনের নাম নয়?"

"হ্যাঁ," সে উত্তর দিল, "আরিফা আমার বোনের নাম। কিন্তু আমি আরিফার দাদা ছিলাম না। বাবা ছিলাম।"

বলতে-বলতেই থামল গুলজার। ক্যাপ্টেন তাকে সময় দিলেন। তিনি কোনওদিনই অধৈর্য শ্রোতা নন।

"খেমকরণ থেকে যখন আমরা চলে এলাম, তখন আরিফা এট্টুকু ছিল।" সে হাত তুলে দেখায়, "ইতনি সি ছোটি, দুধ পিতি বচ্চি। আব্বুর আমাদের দিকে খেয়াল করার সময় ছিল না। তখন পেটের সওয়াল। আরিফার জন্য রোজ দো ওয়াক্ত দুধ কেনার সামর্থ্য ছিল না আব্বুর। আরিফা খুব কাঁদত। তখন আমিই ওকে কোলে তুলে নিয়ে লোরি গেয়ে ভোলাতাম। হোশ সামলাবার আগেই বোনকে সামলানো শিখে গিয়েছিলাম সাব। আমিই আরিফার আব্বু, আরিফার আম্মি। এখন যে বাওয়ার্চি গুলজার আহমেদকে দেখছেন, সে তো ওকে খাওয়ানোর জন্য আট-দশ বছরেই রান্না করতে, রসোইয়ের সব কাজ-কাম শিখে গিয়েছিল। হাত পুড়ে গিয়েছে, তবু একদিনও আরিফাকে না খাইয়ে রাখিনি। আব্বু অমরনাথে গেলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ফিরত না। রাতে একা ভয় পেত বলে আমাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোত আরিফা। তারপর যখন জওয়ান হল, সিয়ানা হল, ওকে অনেকবার বুঝিয়েছি, ভাইজানকে এবার ছাড়। নয়তো লোকে কী বলবে।" গুলজারের চোখ চিকচিক করে ওঠে, "আরিফা বুঝত। কিন্তু রাতে বিজলি চমকালে কখন যে আমার বুকের কাছে এসে জাপটে ধরে, গুঁড়িশুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকত, কে জানে। সলমন ওর শওহর ছিল। কিন্তু তার থেকেও বড় ছিল ওর দাদা। ওর দুনিয়া ছিল ভাইজান! আর আমার দুনিয়া ছিল আরিফা। আরিফা বিশ্বাস করত, ভাইজান থাকতে ওর কোনও ভয় নেই। এবার বলুন, আরিফা আমার কে হয়? বোন না

মেয়ে?"

আরও কত কিছু বলে গেল গুলজার। আরিফার ছোট-ছোট অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, সবকিছু। কোনও বাবাও হয়তো নিজের সন্তান সম্পর্কে এত কিছু জানে না। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ক্যাপ্টেনের কিছু করার ছিল না। এই তবে আসল গুলজার আহমেদ। তবে রাত পোহালেই যাকে দেখবেন সে কে? জীবনেও যে কখনও মদ ছোঁয়নি, আর্মির সামনে যে সবসময় উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, আজ সকালেও যে বোনের লাশের সামনে খিদে-ঘুম পাচ্ছে বলে বিরক্ত হচ্ছিল, সেই গুলজার আহমেদ আর এই গুলজার আহমেদ কি একই?

"বড্ড বারিশ হচ্ছে সাব," নেশাগ্রস্ত নম্র স্বরে গুলজার বলে, "আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবেন? আরিফা আজকাল আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ও ঝামেলা করবে।"

মহারাণাও কাতর চোখে তাকায় ক্যাপ্টেনের দিকে। এর মধ্যেই বার দুয়েক গোটা ডাল লেক চক্কর মেরে ফেলেছে। আর ক'বার চক্কর মারতে হবে? ক্যাপ্টেন ইংরেজিতেই বলেন, "শিশমহল চলো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল শিশমহল। ক্যাপ্টেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, "উঠে এসো। শিশমহল এসে গিয়েছে।"

ক্যাপ্টেনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল গুলজার। আপনমনেই বলল, "এটাই আমার বাড়ি সাব। এখন আমি চলি।"

"খুদা হাফেজ।"

কথাটা বলতে চাননি ক্যাপ্টেন, তবু মুখ থেকে বেরিয়েই গেল!

গুলজার মৃদু হাসল। হাত বাড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে-ধরতে বলল, "উস কি ফিকর সে হো গয়ি মেরি আখেঁ নম/ মগর ইয়ে সারি রাঙ্গ, ইয়্যুঁ ছুপা দি বারিশ নে/ তু বেওয়াফা হুয়া তো কেয়া হুয়া সনম?/ আজ মেরে সাথ রো কর ওয়াফা নিভা দি বারিশ নে।"

চার্লি চ্যাপলিন বলেছিলেন, 'I always like walking in the rain, so no one can see me crying.' ক্যাপ্টেন দত্তা বুঝলেন কেন গুলজার বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টিতে ভিজলে কান্না দেখা যায় না!

"লোকটা কী সব ভুলভাল বকে গেল স্যার।" মহারাণা বলে, "খেমকরণ অগ্নিকাণ্ড ১৯৬৫-তে হয়েছিল। তখন আপনি কোথায় ছিলেন যে ওকে বাঁচাতে আসবেন?"

"ভুলভাল বকেনি। শুধু মদের ঘোরে দুই প্রজন্মকে গুলিয়ে ফেলেছে। ও আমার কথা বলছিল না, আমার বাবার কথা বলছিল। ইউ নো মহারাণা..." তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি প্রাণপণ প্রার্থনা করছি, লোকটা যেন সত্যিই জিহাদি হয়।"

"কেন স্যার?" মহারাণা অবাক।

"যাতে আমি ওকে এক গুলিতেই মেরে ফেলতে পারি।" ক্যাপ্টেনের গলায় অদ্ভুত যন্ত্রণা, "লোকটা আর কত দিন এভাবে মরে-মরে বাঁচবে?"

ক্লান্ত শরীরটাকে টানতে-টানতে অবশেষে আরিফার দরজার সামনে এসে পৌঁছল গুলজার। আজ বড় ক্লান্ত সে। মাথাটাও ঠিকঠাক কাজ করছে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মাঝেমধ্যেই ভয় করছে, পড়ে যাবে। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমনোর উপায় নেই। তার দেরি হলে আরিফা নির্ঘাত ঝামেলা পাকাবে, পাগলামি করবে। তারপর ফের সেই এক অশান্তি। নার্গিসের অভিশম্পাত! সারা শিশমহলের কানে যাওয়া।

আরিফার দরজা খোলাই ছিল। ঠ্যালা মারতেই খুলে গেল। গুলজার জানে ভিতরে রোজকার মতোই এক নগ্নিকা জেগে বসে আছে। বড় কষ্টের দৃশ্য। এ দৃশ্য সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও বোধহয় সহজ। তবু রোজ তাকে দেখতে হবেই। এ না-করাই শান্তি। আরিফা সারাদিন তাকে দুশমন বলে যায় ঠিকই, কিন্তু রাতে ভাইজানকে তার চাই-ই। ভাইজানের সামনে নগ্ন হতে তার লজ্জা নেই, কারণ চিরঞ্জীবনই দাদাকে সে মা আর বাবার মতো দেখে এসেছে। পাগল হয়ে গেলেও সে জানে, গুলজারের সামনে নগ্ন হওয়া যায়। গুলজারের বুকে মাথা রেখে ভয়কে তাড়ানো যায়।

সে ঘরে ঢুকতেই অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো হাত ছোঁ মেরে তাকে টেনে নিল কাছে। গুলজার অন্ধকারেও বুঝতে পারে, তার নগ্নিকা আজ একটু বেশিই আদর চায়। এর মধ্যেই পাগলের মতো তার বুকে মুখ ঘষছে। এখন তাকে আস্তে আস্তে ঢেকে দিতে হবে, পোশাক পরিয়ে দিতে হবে। যেমন মাটির প্রতিমার লজ্জা নিষ্পাপ স্নেহে ঢেকে দেয় শিল্পী, তেমন করেই আরিফার লজ্জা, কান্না— সব সযত্নে, সস্নেহে ঢেকে দিতে হবে তাকে। তার যন্ত্রণার জায়গাগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে হবে। কষ্ট হলেও, ক্লান্তি এলেও তাকে কোলে নিয়ে জেগে বসে থাকতে হবে সারারাত। তবেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে।

"আস্তে আরিফা। পাগলামি করে না।" সে খুব নরম কণ্ঠে বলল, "এসেছি তো। একটু ভিজে গিয়েছি। বহুত বারিশ হচ্ছে বাহার। তাই দেরি হল।"

মেয়েটি তাকে ঠেলতে ঠেলতে বিছানায় চিৎ করে ফেলেছে। তার যেন আর তর সইছে না! ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গোঁ মেয়েটার। গুলজার থামানোর চেষ্টা করেও পারল না। তীব্র কুটচি শরাব তাকে ভ্রমগত বিবশ করে দিচ্ছে। চেতনা হারিয়ে ফেলছে মাঝেমধ্যেই। একটা বাচ্চা ছেলের বুদ্ধি কিংবা শক্তিও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

প্রতিদিন এই ঘরে একই নাটক ঘটে চলে। এক নগ্নিকা এমনভাবে এসে দাঁড়ায়, যেন সে সদ্যোজাত এক পৃথিবী। তার দেহ থেকে মাটির গন্ধ পায় গুলজার। মেয়েটি যেন তারই নিষ্পাপ আত্মজা। যাকে ছ'বছর থেকে একটু-একটু করে বুকে করে বড় করে তুলেছে। সেই অভিমানী মেয়েটি এসে বলে, "ভাইজান, এই দ্যাখ, আমার কাপড় কেড়ে নিয়েছে ওরা।" অপমানে, কষ্টের জ্বালায় হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে, "ওরা আমাকে নঙ্গা করেছে, নষ্ট করেছে। এই দ্যাখ... এখানে মেরেছে ... এখানে ব্যথা দিয়েছে। ভাইজান... আমার লজ্জা করছে... আমার শীত করছে... তুই আমায় বাঁচা... তুই আমায় ঢেকে দে... সবাই আমায় দেখে ফেলবে।"

গুলজার তখন আস্তে-আস্তে তাকে ঢেকে দিতে থাকে। ঘরে যত জামাকাপড় থাকে, সব দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দেয় তাকে। সমস্ত পোশাক, চাদর, রজাই, বেডকভার, এমনকী, নিজের পাঞ্জাবিটাও খুলে পরিয়ে দেয় আরিফাকে। যতক্ষণ না মাথা থেকে পা অবধি ঢাকা হচ্ছে ততক্ষণ সে কাঁপতেই থাকবে, বলতেই থাকবে, 'আমি নঙ্গা... আমার শীত করছে ভাইজান। শীত করছে... শীত করছে।'

"আর শীত করবে না। আমি আছি তো।"

আরিফা গুটিশুটি মেরে তার বুকে মুখ গুঁজে ভয়ে-ভয়ে বলবে, "দাদা, তুই কোথাও যাবি না তো? তুই চলে গেলেই ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে।"

গুলজার সস্নেহে তার মুখ বুকে চেপে ধরবে, "আমি কোথাও যাব না পাগলি। এই তো বসে আছি।"

দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরবে আরিফা, "যাবি না তো? ঠিক যাবি না? তুই চলে গেলে ওরা আমায় ধরে নিয়ে যাবে।"

"না রে বাবা।"

তবেই ঘুমোবে পাগলি! যখনই ঘুম ভেঙে যাবে তখনই হাতড়ে-হাতড়ে দেখবে দাদা অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে কিনা। ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইবে, "ভাইজান! আছিস?"

"আছি।"

"থাকবি তো সবসময়?"

"থাকব।"

এ কথা বলা যায় না। এ সম্পর্ক কাউকে বোঝানো যায় না। কেউ বুঝবেও না। তাই কখনও চেষ্টা করেনি গুলজার। সবাই ভুল বুঝেছে, নার্গিস কিছু বলতে বাকি রাখেনি, তবু চুপ করে থেকেছে। আরিফা ও তার সম্পর্কের রহস্য এই চার দেওয়ালের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে। কানের মধ্যে, মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষে আগুন ছড়াতে-ছড়াতে ঘুরে বেরিয়েছে আরিফার কান্নাবিকৃত মর্মান্তিক হাহাকার।

'ভাইজান... আমি নাঙ্গা। আমি নষ্ট... আমার ব্যথা লেগেছে... ওরা

AMARBOI.COM

আমাকে মেরেছে ভাইজান।'

গুলজারের বুক ফেটে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি জেহাদ জানানোর জন্য উদ্যত হয়। মনের মধ্যে কয়েকটা ঘৃণা মাখানো শব্দ ছটফট করতে থাকে, 'মাফ করব না। কোনওদিন মাফ করব না। ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।'

কিন্তু আজ যে কী ঘটল কে জানে। যা ঘটল তা অন্য দিনের মতো নয়।

কুটচি শরাবের প্রভাবে বিছানায় পড়েই ক্লান্ত চোখদুটো একটু বুজে এসেছিল। কিছুক্ষণের জন্য একটা ঘোরে ডুবে গিয়েছিল সে। আরিফা তাকে একমুহূর্তও ঘুমোতে দেবে না। তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঘুম ভাঙল অন্য একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে।

নগ্ন নারীটি কখন যেন পোঁয়াজের খোসার মতো একে-একে ছাড়িয়ে নিয়েছে তার সমস্ত আবরণ। ভিজে পাঞ্জাবিটা আর তার গায়ে নেই। গুলজারের সিক্ত নগ্ন দেহের সমস্ত আমেজটুকু মহা আরামে নিজের উষ্ণ কমনীয় ত্বকে শুবে নিচ্ছে সেই নারী। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে মুখে, বুকে। গুলজার শিউরে উঠল। কী হচ্ছে এসব। সে লাফ মেরে উঠে বসতে চায়, কিন্তু নারীদেহটি তাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

"আ-রি-ফা। কী করছিস।"

সে আরও কিছু বলার আগেই একজোড়া নরম ঠোঁট দস্যুর মতো তার বাকশক্তি কেড়ে নিয়েছে। গুলজার তাকে দু'হাতে ধরে প্রাণপণে ছাড়াতে চাইছে। কিন্তু মদের নেশা বারবার ব্যাহত করছে তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে। নারীটি তাকে ফের বিছানার উপরে চিৎ করে ফেলে। এ কী অদ্ভুত যুদ্ধ। একবার নেশায় ডুবে যাচ্ছে গুলজার, আবার ভেসে উঠছে। কোনও মতে ভয়ার্ত স্বরে বলে, "আরিফা। এ কী।"

"আমি আরিফা নই।" জীবটি সাপের মতো হিসহিসিয়ে বলল, "বলো, বলো আমাকে ভালবাসো।"

গুলজার চরম ভয়ে পালিয়ে যেতে চায়। আচমকা চোখের সামনে বিষাক্ত সাপ দেখলে যেমন ভয় পায় মানুষ, তেমন ভয় সেও পাচ্ছে। ছিটকে যেতে চাইছে। কিন্তু পারছে কই? তবু কোনও মতে বলে, "তুই আরিফা কোথায়? আ-রি-ফা। তুই কে?"

"আরিফা নেই।" মেয়েটি ফের হিসহিস করে তীব্র আক্রোশে বলল, "কখনও আরিফা, কখনও নার্গিস। আমার নাম একবারও ভুলে মুখে আনবে না কেন তুমি?"

আরিফা নেই! এই প্রথম কয়েকটি শব্দগুচ্ছ তার মাথায় গেঁথে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! আরিফা নেই। আজ সকালেই তার ঝঁঝরা হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা স্বচক্ষে দেখে এসেছে। একফোঁটাও কাঁদেনি গুলজার। এখন হয়তো লাশকাটা ঘরে শুয়ে আছে আরিফা, একদম একা। আজ তাকে রক্ষা করার জন্য তার ভাইজান কাছে নেই। তার মনে হল, আরিফা ভয় পাবে।

নাগপাশের মধ্যেই গুলজার ছটফটিয়ে ওঠে, "ছেড়ে দে। আমি আরিফার কাছে যাব।"

"আগে বলো, তুমি শুধু আমার। আর কারও নও।"

স্তিমিত তবু দৃঢ় গলায় জানাল গুলজার, "গুলজার আহমেদ কখনও কারও হয়নি। হবে না কখনও।"

"বাজে কথা।" মেয়েটি প্রায় নিভে আসা গুলজারের মুখ চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসে, "দেখো, দেখো আমাকে। কী কমি আছে আমার মধ্যে? দেখো ভাল করে।"

বৃথাই বলা। গুলজারের অপলক চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। অসাড় দেহে উত্তেজনার লেশমাত্রও নেই। ক্রমাগতই নেশায় তলিয়ে যাচ্ছে। শুধু এটুকুই বুঝতে পারছে —'আরিফা নেই।' আরিফা ছাড়া আর কেউ যেন কখনও কোথাও ছিল না। ক্রমাগতই সে বিরক্ত হয়ে উঠছে তার দেহে ভর করা এই জীবটির ওপর। কী চায় ও! ক্রমাগত আঁচড়ে কামড়ে উত্ত্যক্ত করছে শুধু।

"আমাকে ভালবাসো না তুমি?"

"না। কোনওদিন না।"

গুলজারের কিছু করার ছিল না। যখন এ ঘরে তার টলমলে পা পড়েছিল, সে পদক্ষেপ বড় শুচিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন কেউ তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে চূড়ান্ত অপবিত্রতার দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবু যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ নিষ্ফল যুদ্ধ করে গেল সে। বারবার ঘনিয়ে আসা মুখটাকে দু'হাতে সরিয়ে দিতে-দিতে একটা শব্দই বলে গেল, "না। না। না। কভি নহি... কভি নহি..."

তারপর একসময়ে চোখের সামনে ঝুপ করে একটা পরদা পড়ে গেল। জ্ঞানের শেষ সুতোটুকুও হাত ছেড়ে গেল গুলজারের।

রোজ ভোরে ওঠা ছোটবেলা থেকেই নার্গিসের অভ্যাস। গুলজার বিশ্বাস করে না, তবে তার খুদার উপর বিশ্বাস আছে। স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তার খুদার প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধায় কখনও হৃদ্যন্ত্রণা করেনি গুলজার আহমেদ। তাই নার্গিস নিয়ম করে নামাজ পড়ে। কাল রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। ভেবেছিল, আজ অন্তত লোকটা তার ঘরে আসবে। কিন্তু কোথায় কী। গোটা রাত তার দেখাই নেই। কোথায় গিয়ে ফুর্তি করছে কে জানে। বোনটা মারা গেল, তবু কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। পাথর না হলে কেউ এত নির্লিপ্ত হতে পারে?

"কমিনা কোথাকার।" আপনমনেই নামাজ পড়া শেষ করে গজগজ করতে-করতে বাইরে চলে এল নার্গিস। এখনও জোরাল বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাল সারারাত অবিশ্রান্ত বর্ষণের পরও বৃষ্টি ধরেনি। বরং তার তেজ আরও বেড়েছে। এতটাই তীব্র বৃষ্টির ছাঁট যে, জলবিন্দুগুলোকেও ঠিকভাবে দেখা যায় না। মনে হচ্ছে আকাশ থেকে ধোঁয়া পরতে পরতে নেমে এসেছে জলের উপর।

অন্যমনস্কভাবেই আরিফার ঘরের দিকে তাকায় নার্গিস। কী ব্যাপার। ঘরের দরজা খোলা যে। অন্যান্য দিন দরজা বন্ধ থাকে। আজ খোলা কেন? তবে কি গুলজার রাতে ফিরেছে? সে কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। ঘরে পা রাখতেই স্তিমিত, শান্ত অথচ অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বরে 'মীর তকি মীর' ভেসে এল—

"অশক আখোঁ মেঝ কব নহি আতা?/ লহ আতা হ্যায় জব নহি আতা/ হোশ যাতা নহি, রাহা লেকিন/ জব উয়োহ আতা হ্যায়, তব নহি আতা।"

"গুলজার।" সবিস্ময়ে এগিয়ে যায় নার্গিস। খাটের উপর তখনও চিৎ হয়ে পড়ে আছে গুলজার। বিধ্বস্ত, পরাজিত সৈনিক। উস্কোখুস্কো চুল। চোখদুটোর ঘোর এখনও কাটেনি। চোখে যেন রক্ত জমেছে। কোমর অবধি চাদরে ঢাকা, কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। ভাল করে দেখতেই গলায়, ঠোঁটে, বুকে, কাঁধে ধারালো দাঁত-নখের ভোগচিহ্নগুলো দেখতে পেল সে। ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করে ওঠে নার্গিসের। কাল সারারাত তবে এই করেছে লোকটা। মদের গন্ধে তার বমি আসছিল। বা, চমৎকার। এটাই বাকি ছিল।

সে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু খপ করে তার হাত টেনে ধরল গুলজার। এক বছর বাদে এই প্রথম তার হাত বিনা কারণে স্পর্শ করল। নার্গিস হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে পারত, অথচ পারল না। সে ফের তাকাল নিজের স্বামীর দিকে। আদৌ লোকটার হুঁশ আছে কি? চোখ খোলা, অথচ দেখলে মনে হয়, ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চাউনিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক।

"আমায় একা ফেলে যাস না।" সর্বহারার মতো কাতর কণ্ঠে বলে উঠল গুলজার, "আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

শিউরে ওঠে নার্গিস। সে জানত, গুলজারের হৃদয় বলে কোনও বস্তু নেই। কিন্তু আজ এ কী শুনছে।

গুলজারের পাশে বসে পড়ল নার্গিস। গায়ে হাত দিতেই যেন কয়েকশো ভোল্টের ছ্যাঁকা খেল। এ কী। গুলজারের গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। নার্গিসের রাগ মুহূর্তেই জল হয়ে যায়। তার মুখে আশঙ্কার ছাপ স্পষ্ট।

"গুলজ্বার, উঠো।" নার্গিস তাকে উঠিয়ে বসানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ওকে তুলে বসানো কি নার্গিসের একার সাধ্য! অবশ হওয়ার দরুন শরীরটা আরও কয়েক গুণ ভারী হয়ে গিয়েছে। গুলজ্বার উঠতে গিয়েও ঢলে পড়ল নার্গিসের কোলে। ছেলেমানুষের মতো তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে সে, যেন ডুবন্ত মানুষের সামনে খড়কুটো! অপূর্ব চোখদুটো মর্মান্তিক ব্যথা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জড়ানো গলায় অনন্ত জিজ্ঞাসা, "কিস ওয়াস্তে হথেলি মেঁ লিকখা হ্যায় মেরা নাম,/ ম্যার্ড হর্থ-এ-গলত হুঁ, তো মিটা কিউঁ নহিঁ দেতে?/ যব প্যায়ার নহিঁ হ্যায়, তো ভুলা কিউঁ নহিঁ দেতে?"

জ্বরে পুড়ে যাওয়া দেহটা শীতে কাঁপছে। শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো সুন্দর শরীরটা তার বাহুতে এলিয়ে পড়েছে। এক বছর গুলজ্বারকে এভাবে দেখেনি সে। অথচ একটুও কাম বোধ করল না নার্গিস। সে সাধারণ নারী। তাই সাধারণ নারীর মাতৃত্ববোধই দখল করে নিল হৃদয়। পরম মমতায় সে একটু-একটু করে ঢেকে দিল স্বামীকে। ছোট্ট শিশুর মতো গুলজ্বার তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তার কাঁধে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, "আরিফা নেই। আরিফা নেই। নার্গিস, আরিফা নে-ই। আমি একা! আমার কষ্ট হচ্ছে... কষ্ট হচ্ছে।"

বলতে-বলতেই বমি করে ফেলল সে। নার্গিস সভয়ে দেখল ওর মুখ নীলাভ! কষ বেয়ে সাদা ফেনা বেরিয়ে আসছে।

নার্গিস অসম্ভব ভয়ে দু'হাতে তাকে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে ব্যাকুল স্বরে ডাকল, "শোনো... গুলজ্বার! কী খেয়েছ? কী খেয়েছ তুমি?"

গুলজ্বার অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, "বি-ষ।"

একুশ

মানুষের মন বড় বক্ররেখায় চলে। চলতে-চলতে যে কত ভাঙচুর হয় তার ঠিক নেই। মাত্র ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় এই সত্য মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করল স্বরাজ। মাত্র ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় সে যে কতবার ভেঙেচুরে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

গত চারদিন ধরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে শুধু। এমন বৃষ্টি শেষ কবে হয়েছিল কে জানে। ডাল লেকের জল আস্তে-আস্তে বাড়ছে। ঝিলম নদী এমনিতে শান্তই থাকে। কিন্তু এবার সেও ক্রমাগত ভয়াল রূপ নিচ্ছে। শিশমহলের প্রতিটি বাড়ির বারান্দা ছুঁয়ে ফেলেছে জল। নরম কাঠের ছাত জলের এত চাপ নিতে পারছে না। ঘরে জল ঢুকে পড়ছে ছাত চুঁইয়ে। লোকগুলো প্রাণপণে যে যার আরাধ্য দেবতাকে ডাকছে। তবু বৃষ্টির বিরাম নেই।

এর মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে। বৃষ্টির জন্য ভরতের ট্যুর ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে ফিরে এসেছে। আর ফিরেই দাদাজির অসুস্থতার কথা আর আরিফার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে। অন্য দিকে গুলজ্বারকে ধরে যম টানাটানি করছে। কুটচি শরাবের বিষক্রিয়ায় সে নীল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে ধুম জ্বর। প্রথমে তাকে হসপিটালাইজড করার চেষ্টা করেছিল সবাই। কিন্তু কোনও সরকারি হাসপাতালেই বেড খালি নেই। তার ওপর ডাক্তাররা জানিয়েছেন, এটা সুইসাইড অ্যাটেম্পট! চিকিৎসা তো পরে, আগে পুলিশে খবর দিতে হবে। পুলিশের নাম শুনেই ভয়ে পালিয়ে এসেছে ওরা। পুলিশের সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে যমের সঙ্গে পাঞ্জা কষা অনেক সহজ!

অগত্যা বাড়িতেই আছে গুলজ্বার। দু'দিন ধরে তার বাড়িতে শিশমহলের লোকেরা ভিড় করছে। কৌতূহলে নয়। একটা লোকের অসুস্থতা যে গোটা অঞ্চলকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার প্রমাণ এই ভিড়। ভরত তো খবর পেয়েই গুলজ্বারের শয্যার পাশটাকে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। কন্নু চুপ করে বসে আছে 'চাচার' পাশে। কেউ তাকে বমি করানোর প্রাণপণ প্রয়াস করাচ্ছে। বেশ কয়েকবার বমি হলও। কিন্তু তবু জ্ঞান ফিরল না। কেউ ক্রমাগত মাথার কাছে বসে হাওয়া করে চলেছে। কেউ নানারকম বিষের আয়ুর্বেদিক ওষধি তৈরি করে অচেতন লোকটাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। কেউ বুকে, কপালে বিষ প্রতিরোধক প্রলেপ লাগাচ্ছে। কারওর ঘর থেকে সবচেয়ে মোটা কম্বলটা চলে এসেছে, যাতে বৃষ্টিতে মানুষটার ঠান্ডা না লাগে। নার্গিস দিনরাত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। কিছুতেই মৃত্যুকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেবে না। গুলজ্বারের অচেতন দেহটাকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ছুঁয়ে দেখছে জ্বর কমল কিনা, বিষের প্রভাব একটু হলেও ফিকে পড়ল কিনা!

সব দেখেশুনে স্বরাজের কেমন যেন তাক লেগে যাচ্ছিল। গুলজ্বার কি নিজেও জানত যে, এতগুলো লোক তাকে এত ভালবাসে? সে যে ধাতের মানুষ, তাতে তার স্নান থাকলে নির্ঘাৎ এত আদরে অতিষ্ঠ হয়ে তাড়া করত! কোনওদিন কারও সহানুভূতির তোয়াক্কা করেনি সে।

বলাই বাহুল্য, পালাতে পারেনি স্বরাজ। চেষ্টা যে করেনি তা নয়। এই বৃষ্টির মধ্যেও রাতে বেরিয়েছিল। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই দেখতে পেল আর্মির বোট চক্কর কাটছে। অগত্যা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতেই হয়েছে তাকে। তখনও তার ধারণা, গুলজ্বারই লালার লোক। অতএব যতদিন গুলজ্বার আহমেদ নিষ্ক্রিয় থাকবে, ততদিনই তার পালানোর পথ খোলা। সে রাস্তা দেখতেও পেয়েছিল স্বরাজ। একমাত্র সে-ই প্রাণপণে গুলজ্বারের মৃত্যু কামনা করছিল!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর বাদ সাধলেন। আর বাদ সাধল স্বরাজের স্বাধীন ইচ্ছে! অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, কখন যেন অজান্তেই ভেঙেচুরে গেছে সে।

পরশু গুরপ্রীতের সঙ্গে সেও গিয়েছিল রোগী দেখতে। অবাক হয়ে দেখেছিল গুলজ্বারের সংজ্ঞাহীন মুখে কোনও নিষ্ঠুরতার ছাপ নেই, বরং শিশুর মতো নিষ্পাপ লাগছে তাকে! বোঝাই যাচ্ছে শিয়রে শমন। হালকা-পলকা বান্দা হলে কয়েক ঘণ্টাতেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু লোকটার জীবনীশক্তির জোরে এখনও লড়াই চলছে! তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল স্বরাজ। কী অদ্ভুত ব্যথাতুর, অসহায় মুখ! ও তো শঙ্কর ভগবানের মতো জেনেশুনেই বিষ খেয়ে নিয়েছে। আর সে কিনা এই অর্থমৃত মানুষটার মৃত্যুকামনা করছে! এমন 'কমিনা' তো স্বরাজ কখনও ছিল না! তবে লালার সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়?

কে যেন সপাং করে চাবুক মারল। বলল— ছিঃ!

ঘরে তখন তিলধারণের জায়গাও নেই। তবু গুরপ্রীত ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়েছিল নার্গিসের দিকে। স্বরাজ হতবাক হয়ে দেখেছিল যে-নার্গিস এমন মুখরা, সে গুরপ্রীতকে দেখেই কেঁদে ফেলল। অসহায়ভাবে বলল, "সব আমার দোষ দিদি। লোকটাকে কম বদদুয়া দিইনি। আরিফাকেও অনেকবার মরতে বলেছি। আরিফা তো গেলই, এখন দাদাকেও বুঝি টেনে নিয়ে যায়! আমার জিভটা কেটে ফেলো! আমি যতই যা বলি, আমার খুদা জানে, এমনটা চাইনি!"

গুরপ্রীত নীরব সান্ত্বনায় তার পিঠে হাত বোলায়। এই কথার কোনও উত্তর হয় না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, "এর মধ্যে বুখার একটুও কমেনি?"

"এক-একবার ঘাম দিয়ে ছাড়ছে। আবার হু-হু করে উঠছে।" নার্গিস অশ্রুসিক্ত চোখদুটো তুলল, "বেশ কয়েকবার উলটি করল। তারপর সেই যে চোখ বুজেছে, আর একবারও চোখ খোলেনি! চোখের পাতাও নড়ছে না। অমন শক্তপোক্ত লোকটা আস্তে-আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। নব্জ ধিমে! মুখটা কেমন নীল হয়ে গিয়েছে দেখো!" একটু থেমে আশঙ্কিত কাঁপা স্বরে বলে, "মানুষটা বাঁচবে তো দিদি?"

গুরপ্রীত এবারও কোনও উত্তর দেয়নি। নিস্তব্ধ হয়ে থেকেছে। কিন্তু সেইদিন রাতে তাকে ওয়াহেগুরুর ছবির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল স্বরাজ। গুরু নানকের শান্ত সৌম্য মূর্তির উদ্দেশে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন প্রার্থনা করছে সে! কানখাড়া করে তার কথাগুলো শুনেছিল স্বরাজ। গুরপ্রীত কান্নাজড়ানো স্বরে বলছিল, "ফিরিয়ে দাও ওয়াহেগুরু, এভাবে কেড়ে নিও না! ওই লোকটা নিজের জন্য বাঁচে না। কেউ জানে না, যেদিন আরিফা মারা গেল, সেদিন সকালে ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে আর্মি অফিসে যাওয়ার আগে ও নিজের জমানো যথাসর্বস্ব চুপিচুপি আমাদের দিয়ে গিয়েছে।

বলেছে, যসসির বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবি না। কন্নু যেন আর কখনও হোটেলে চাকরি করতে না যায়। দাদাজির চিকিৎসা করাতেও অসুবিধে হবে না। মানা করেছিল বলে কাউকে বলিনি। ভরতকেও নয়। ওর প্রাণভিক্ষে দাও। সবই তো নিয়ে নিয়েছ! যা বাকি ছিল তাও নিজেই হাসতে-হাসতে দিয়ে দিয়েছে। এখন শুধু জানটুকুই বাকি আছে। সেটুকুও যদি কেড়ে নাও তবে বুঝব ভাইজানের কথাই ঠিক— তুমি নেই! আর কোনও দিন মুখ দেখব না তোমার।"

স্বরাজ স্তম্ভিত হয়ে যায়। আবার মনের মধ্যে একই দোলাচল— কে এই গুলজার আহমেদ? সত্যিই কি লালার লোক! লালার গোত্রের মানুষ কি একটা গোটা অঞ্চলের 'ভাইজান' হয়ে উঠতে পারে? লালাকে ভয় করা যায়, ভালবাসা যায় না। তার ধারণা ছিল গুলজারও একই প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু গত দু'দিন ধরে যা দেখছে ও শুনছে তাতে তার এত দিনের ধারণা ক্রমাগতই ধাক্কা খাচ্ছে! ওর মৃত্যুকামনা করে পাপ করছে না তো?

একা গুরপ্রীত নয়, আজানের সুর জাগ্রত হতে না হতেই কত মানুষ যে নতজানু হয়ে একই প্রার্থনা করে চলেছিল কে জানে। কত হাত যে ওয়াহেগুরুর সামনে প্রসারিত হল ঠিক নেই। যে-খুদাকে কোনও দিন বিশ্বাস করেনি গুলজার, সেই খুদার দরবারেই তার প্রাণভিক্ষের আবেদন পৌঁছে দিল গোটা শিশমহল!

স্বরাজ হতবাক হয়ে শুধু দেখেছিল! লালা তাকে বলেছিল, 'যা, নিজের চোখে দ্যাখ, শিশমহল কত বড় নরক!' প্রথম-প্রথম সে তাই দেখেছিল! কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, তত যেন দৃশ্যটা পালটে যাচ্ছে। তত পালটে যাচ্ছে সে নিজে। এই মুহূর্তে তার বলতে ইচ্ছে করছিল, 'কোথায় তোমার কৌম লালা? কোথায় তোমার মজহব। শিশমহল যদি নরক হয়, তবে স্বর্গ কাকে বলে! লোকগুলো প্রতিটি দিন গরিবির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে, আর্মির অত্যাচার আছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখেও বুঝলাম না তোমার মজহব এর মধ্যে কোথায়। ওরা গরিব, তবু ভালবাসতে, বিশ্বাস করতে আজও ভোলেনি কেউ! তুমি আমায় এখানে মরতে পাঠিয়েছ। কিন্তু ওদের দেখে যে আমার তীবণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমায় ঘৃণা করতে শিখিয়েছ। কিন্তু আমি ওদের ভালবাসতে শুরু করেছি!'

স্বরাজ এর মধ্যে কোনওদিন নিজের ও নিজের পরিবার ছাড়া আর কারওর কথা ভাবেনি। যতবার কেঁদেছে, নিজের কথা ভেবে কেঁদেছে! এই প্রথম তার চোখ বেয়ে অন্যের জন্য জল এলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সেও প্রার্থনা করল, "আমি গুলজারের ঘোরতর শত্রু! আমিই একা প্রাণপণে ওর মৃত্যু কামনা করছিলাম। আজ আমিই বলছি, ওকে বাঁচিয়ে দাও ঈশ্বর! তার জন্য যদি আমি মরেও যাই, ক্ষতি নেই।"

দু'দিন প্রাণপণ যমে-মানুষে টানাটানির পর তৃতীয় দিনের মাথায় অক্লান্ত লড়াইয়ের অন্ত হল।

সেদিন আলো ফোটার আগেই ভরতের ঘুম ভেঙে গেল একটা অস্ফুট আওয়াজে! দুর্বল কিন্তু খুব পরিচিত একটা শান্ত গলা বলছে, "বহৎ উদাস হ্যায় হম ইস জিন্দগি সে/ কিসমত ভি তড়পানে সে বাজ নহিঁ আতি/ জিনা চাহতে হ্যায়ঁ, মগর জিন্দগি রাস নহিঁ আতি/ মরনা চাহতে হ্যায়ঁ, মগর মওত পাস নহিঁ আতি।"

ভরত ধড়মড় করে উঠে বসে সবিস্ময়ে গুলজারের দিকে তাকায়। সে চোখ মেলে তাকিয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে লাফ মেরে গুলজারকে জাপটে ধরেছে ভরত! জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলে বলল, "ওয়ে জাকে! তুম তো ওয়াপস আ গয়ে! আমাদের ফাঁকি দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে! শিশমহলের কেউ তোমায় ছাড়বে না! সবাই মিলে ধরে রাখব তোমায়!"

সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। তার উপর ভরতের উচ্ছ্বসিত ভীম আলিঙ্গন। গুলজার বলে উঠল, "সবার কথা তো দূর, তুই একাই এমনভাবে ধরেছিস যে, তার চাপেই মরে যাচ্ছি! গলা টিপে মারবি বলেই ফিরিয়ে এনেছিস নাকি?"

ভরত সজোরে হেসে উঠল। সবাইকে ঘুম থেকে তুলে জানিয়ে দিল সুসংবাদ। ভাইজানকো হোশ আ গয়া। উয়োহ সলামত হ্যায়ঁ!

স্বরাজের বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। গুলজার আহমেদ মারা গেলে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না। ভোরের গোলাপি আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "ধন্যবাদ ঈশ্বর!"

এদিকে বৃষ্টি ক্রমশ উগ্র থেকে উগ্রতর রূপ নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ইমামসাহেবও প্রবল বৃষ্টির জন্য তাঁর জম্মু-কাশ্মীর ভ্রমণ বাতিল করলেন।

স্বরাজ খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কোথাও পালাবে না! যেদিন থেকে বুঝেছে পালাবার পথ নেই, সেদিন থেকেই আশ্চর্য এক শান্তি নেমে এসেছে তার হৃদয়ে। এখন আর কোনও ভয় নেই। নিকুচি করেছে রিমোটের। নিকুচি করেছে পরিবারের। বরং সরাসরি আর্মির কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। তারপর ওরা মারুক, কী রাখুক, কিছু এসে যায় না। মৃত্যুর চেয়েও বড় মনুষ্যত্ব! যে-চেতনা আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, মৃত্যু তার কাছে নিতান্তই সস্তা ঘটনা মাত্র।

সে ধীরেসুস্থে নিজের ব্যাগ গোছাচ্ছিল। আজ রাতেই আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। ভাগ্যিস গুরপ্রীত আর ভরত এখনও গুলজারের বাড়িতে ব্যস্ত। নয়তো কৈফিয়ত দিতে-দিতে প্রাণ যেত। স্বরাজ দেখেছে, একটু রাত হলেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আর্মি বোট শিশমহলের চতুর্দিকে চক্কর লাগায়। শুধু একটু কষ্ট করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বলতে হবে, 'আমি একজন মানব-বোমা। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছি তোমাদের কাছে। আমি জঙ্গি নই। জিহাদ কী জিনিস, কেন করব তাও জানি না। তবুও আমাকে সবাই জঙ্গি কিংবা জিহাদিই বলবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিরুপায়। নিজে বাঁচতে চাই না, পারলে শুধু আমার পরিবারকে বাঁচিও...'

শিশমহল অন্ধকার হয়ে যেতেই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল স্বরাজ। খুব সাবধানে পা ফেলল বারান্দায়। বারান্দা তখন এক হাঁটুর জলের নিচে। একটু এগোতে গেলেই ছপছপ শব্দ উঠছে। তবু সন্তর্পণে এগিয়ে গেল এক পা।

"দাঁড়াও।"

পিছন থেকে আকস্মিকভাবে একটা কড়া নারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

স্বরাজ থমকে যায়। কার কণ্ঠস্বর? এত রাতে কোন মেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেনই বা দাঁড়িয়ে আছে! সে বিস্মিত স্বরে বলল, "কে?"

নারীকণ্ঠ সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। বরং হিসহিসে গলায় বলল, "আমি জানতাম তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যখন বলা সত্ত্বেও রিমোটটা দাওনি তখনই বুঝেছিলাম। পালাচ্ছ? কোথায় পালাবে? রিমোটটা দাও!"

স্বরাজ আঁতকে ওঠে। লালার এজেন্ট হিসেবে কোনও পুরুষকেই কল্পনা করেছিল স্বরাজ। একবারও ভাবেনি যে, এজেন্টটি মহিলাও হতে পারে। কে এই নারী? গুরপ্রীত নাকি?

স্বরাজ বলল, "রিমোট আমার কাছে নেই।"

"ঝুঠ।" মেয়েগলা বলে, "বাজে কথা বোলো না। রিমোটটা আমায় দিয়ে দাও। চালাকি কোরো না।"

"ইমামসাব তো আসছেন না।" স্বরাজ মরিয়া, "এখন রিমোট দিয়ে কী করবে তোমরা? আমায় যেতে দাও।"

"যেতে দেব?" নারীটি জোরে হেসে ওঠে, "তুই আমাদের সব কিছু জানিস। আস্ত একটা মানববোমাকে ছেড়ে দেব। উতনি আসানি সে নহিঁ। ইমামসাবের জন্য পরে অন্য ইন্তেজাম করা যাবে। আর কিছু না পারি, গোটা শিশমহলটাকেই উড়িয়ে দেব। আর্মির শালারা এখানে চক্কর

লাগাচ্ছে। ওগুলোও মরবে! আক্কাদ কাশ্মীরের জন্য সব কিছু করতে পারি আমি। রিমোটটা দে।"

স্বরাজ স্তম্ভিত! নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে। ইমামসাবকে মারতে পারেনি বলে গোটা শিশমহলকেই উড়িয়ে দেবে! এ কী আশ্চর্য যুক্তি! জিহাদ না পাগলামি!

সে দৃঢ় গলায় বলে, "রিমোট আমার কাছে নেই। থাকলেও দিতাম না!"

"ফির সে ঝুঠ!" মেয়েটি ফের হিসহিসিয়ে বলে, "ঝুঠ বলে পার পাবি না! আমি..."

নারীমূর্তি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই তার পিছন থেকে ভেসে এল শান্ত কণ্ঠস্বর, "ও ঝুঠ বলছে না। ওর কাছে সত্যিই রিমোট নেই। কারণ সেটা শুরু থেকেই আমার কাছে আছে।"

আর কিছু বলার আগেই একটা টর্চ জ্বলে উঠেছে। স্বরাজ হতভম্বের মতো দেখল, তার সামনের নারীমূর্তিটি আর কেউ নয়— আফসানা। আর তার ঠিক পিছনেই হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে—

গুলজার আহমেদ! গুলজারের অন্য হাতে মোবাইলের মতো দেখতে রিমোটটা। বিস্ময়ে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এল স্বরাজের।

"পকড়ো জ্বরা।" টর্চ আর রিমোটটা স্বরাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে আফসানার মুখোমুখি দাঁড়ায় গুলজার, "তোর সঙ্গে হিসাব আছে আমার। আমি এখনও দুর্বল, কিন্তু মরে যাইনি।"

টর্চের পীতাভ আলোয় অলৌকিক লাগছিল গুলজারকে। সদ্য যমের দুয়ার থেকে ফিরেছে, অথচ কী সজীব! অসুস্থতা যেন লোকটাকে চরম সৌন্দর্যের সীমায় টেনে নিয়ে গিয়েছে। মোমের মতো অচ্ছাভ মুখে অদ্ভুত মৃদু হাসি। চোখদুটোর নীল রং যেন আরও তীব্র, আরও জ্বালাময়ী! রোম্যান্টিক উষ্ণ গলায় চূড়ান্ত আবেদন নিয়ে উঠে এলেন গালিব।

"অপনি গলি মেঁ মুঝকো না কর দফন বাদ-এ-কতল/ মেরে পতে সে খালাক কো কিউঁ তেরা ঘর মিলে?" একইরকম নিরুত্তাপ স্বরে গুলজার বলল, "কত দিন হল এ কাজ করছিস আফসানা? তোর বাপেরা তোকে শেখায়নি, যখন শত্রুকে মারবি, তখন এমনভাবে মারবি যাতে শত্রুও মরার আগে টের না পায়? কোনও 'সুরাগ', 'সবুত' ছাড়তে নেই!"

আফসানা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো স্থির! চোখ সরাতে পারছে না গুলজারের চোখ থেকে। সম্মোহিতের মতো বলল, "গুলজার!"

গুলজার মৃদু হাসে। পরম স্নেহে আফসানার ভেজা চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে সে, "সবাই ভাবছে আমি কুটচি শরাব খেয়ে মরতে বসেছিলাম। কিন্তু আমি জানি, কুটচি শরাবে আমার কিস্যু হয়নি। হলে ওই রাতেই হত। কেউ জানে না, সে রাতে তুই আমায় সব দিক দিয়ে মারবার ইন্তেজাম করেছিলি। আমার হোশ না থাকলেও এইটুকু টের পেয়েছি তুই আমার মুখে কিছু একটা ঢালছিস। কী বিষ ঢেলেছিলি রে? পয়লা নম্বরের ঘটিয়া জ্বহর! দু'তিনবার উলটি হয়েই বেরিয়ে গেল!"

আফসানার চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে। সে গুলজারের কলার চেপে ধরেছে, "তুমি যদি আমার না হও, তবে কারও হবে না গুলজার! নার্গিসেরও নয়। আমি তোমাকে খুন করেই ছাড়ব।"

সস্নেহ হাসল গুলজার, "সেই জন্যই তো শুরুতেই বলেছিলাম— খুন কর। বারবার সাবধান করেছি। তুই বুঝিসনি। গুলজার মরে যেতে পারে, কিন্তু তোর মতো ঘটিয়া লড়কির সঙ্গে মোহব্বত কখনও করবে না।"

স্বরাজ হাঁ করে নাটক দেখছে! সে বুঝতে পারে না, এখন ঠিক কী করা উচিত। একা সে নয়, বিস্মিত আফসানাও, "তুমি শুরু থেকেই জানতে!"

সজোরে হেসে উঠল গুলজার, "তুই কী ভাবিস? সব বুদ্ধি একা তোরই আছে? যেদিন থেকে তুই নির্লজ্জের মতো আমার পিছনে লেগেছিস সেদিন থেকেই বুঝেছি। তোর বাপ বুঝেছিল শিশমহলে কেউ একটা গলার কাঁটা হয়ে বসে আছে। তুই তো সেদিনকার মেয়ে! তোর আগে কত এল, কত গেল! তোর বাপেরা যতগুলো সুন্দরী-সুন্দরী 'বলা'কে এখানে ফিট করেছে তার প্রত্যেকটাকে আমিই ধরে-ধরে নিকেশ করেছি গত চোদ্দো বছর ধরে। তোর আগে আরও পাঁচটা গিয়েছে। প্রত্যেকবার একইভাবে আসিস তোরা। কোনও না কোনও মর্দকে পটিয়ে শাদি করে শিশমহলে ঘাঁটি গাড়িস। তোদের ধাত, তোদের রং ঢং, তোদের জিসমের ফাঁদ পাতার ধরন চোদ্দো বছর ধরে দেখে-দেখে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। একটাই দুঃখ, আগের গুলো আমার আসল পরিচয়টা জানত না। ওদের থেকে তুই বেশি বুদ্ধি ধরিস। ঠিক ধরে ফেললি। জেনে ফেলেছিলি বলেই আমাকে লোভ দেখিয়ে পাগল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলি, তাই না? জালটা ভালই পেতেছিলি! কাবিল-এ-তারিফ!"

আফসানার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, "আমার গলতি হয়েছিল। আমি তোমায় সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো বুঝেছিলে। তবে এলে কেন আমার কাছে?"

"কর লো বাত!" গুলজার হাসছে, "শুরুতেই কোথায় এসেছি? সন্দেহ ছিল। কিন্তু তোর একটা বাচ্চা আছে বলে বুঝে উঠতে পারিনি। এখানেই স্টাইল বদলেছে তোদের বাপ! বিচারা মেয়ে, কোলে বাচ্চা, মরদ আর একটা বিয়ে করেছে! সে কি জিহাদি হতে পারে? তাই তোকে বারবার ভাগিয়ে দিচ্ছিলাম! কিন্তু যখন মুখ ফসকে বলে ফেললি আরিফা আর আমার মধ্যে কী কহানি তা তুই জানালার ফোকর দিয়ে দেখেছিস, তখনই বুঝে গেলাম তুই কী চিজ়! বুঝলাম তুই সালি আমার উপরে জাসুসি করছিস। আর তাই টানলাম তোকে!"

আফসানার চোখের সামনে সব স্পষ্ট হয়ে যায়। ঠিক! একদম ঠিক বলছে গুলজার। প্রত্যেকবার সে বলেছে 'ভালবাসি না।' বলেছে, 'নফরত করে তোকে।' বলেছে, 'খুদা কে ওয়াস্তে, পরদা না কাবে সে উঠা জ্বালিম/ কই আয়সা না হো ইহাঁ ডি ওহি কাফির সনম নিকলে।' ঈশ্বরের দোহাই, নিজের আসল মুখটা পরদার বাইরে আনিস না! আবার সেই বিশ্বাসঘাতিনীকে দেখতে চাই না আমি! হ্যাঁ, একথা একমাত্র গুলজারই বলতে পারে। কারণ এর আগেও সে বারবার এমন অবিশ্বাসী প্রেমিকার মুখোমুখি হয়েছে।

"তোদের সমস্যা কী বল তো?" ভীষণ আদরে আফসানার মুখ দু'হাতে ধরে কাছে টেনে আনে গুলজার। তার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে-করতে বলে, "তোরা ঠিক কিছু না কিছু গড়বড় করেই ফেলবি! আমি যখন বাড়িতে থাকতাম না, তখন প্রায়ই তুই এসে হাজির হতি। নার্গিসের সঙ্গে গল্প করতি। আর আরিফার মাথায় জিহাদের ভূত তুই-ই ঢুকিয়েছিলি না! মনে করে দ্যাখ, যেদিন ভরতের দাদাজি বিমার হল, সেদিন তোকে আরিফার কাছে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু আরিফা যখন আর্মির হাতে ধরা পড়ল, তখনই পাক্কা বুঝলাম, তুই ওর সঙ্গে ছিলি না। থাকলে আরিফা বেরিয়ে আসতে পারত না! কী করে থাকবি? তুই তো তখন তোর বাপকে জানাতে ব্যস্ত ছিলি যে, কাটরাসাব কোথায় আছে! এমন কাঁচা কাজ করে ঠিক করিসনি। তোর একটা গলতির জন্য আমার বোনটা মরল। তোকে মাফ করি কী করে বল তো?"

মট করে একটা শব্দ! স্বরাজ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল লোকটা আদর করতে-করতেই বিদ্যুৎগতিতে আফসানার মাথাটা ধরে ঘুরিয়ে দিল! আফসানা টুঁ শব্দটিও করার সময় পেল না! কিছু বোঝার আগেই সে শেষ।

"মারতে হলে এই ভাবে মারতে হয়।" গুলজার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "বড় দেরিতে শিক্ষাটা পেলি! তোর কাজে আসবে না!"

স্বরাজের তখন সারা দেহ কাঁপছে। মনে হচ্ছে গায়ে আর জোর নেই! লোকটা চোখের সামনেই হাসতে-হাসতে খুন করে দিল মেয়েটাকে!

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল গুলজার, "চলো কাটরাসাব। আর্মির কাছেই যাচ্ছিলে তো? চলো, তোমাকে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কিন্তু... আমি..." স্বরাজের মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

"কী?" গুলব্দার পা দিয়ে ঠেলে অবহেলাভরে আফসানার লাশটাকে জলে ফেলে দিল, "ভয় পেলে নাকি? ডরো মত। এ তো আমার বাঁ হাতের খেল। প্রথমবার অবশ্য হাত কেঁপেছিল। এ জন্যই তো আর্মি আমাকে যত্ন করে পুষছে। আমি ওদের খাস এজেন্ট। খাস ইনফর্মার। আমার কাজই হল এই আগাছাগুলোকে সাফ করা। ওদের মুশকিল হল ওরা মোহব্বত করে ফেলে। আর আমার সমস্যা হল, মোহব্বত শব্দটা আমার জীবনেই নেই।" তার মুখ নির্লিপ্ত, "কত করে সাবধান করি, বোঝেই না। আর্মির ফাইলে আমার কোডনেম 'বিষপুত্র'। 'বিষকন্যার' মেল ভার্শন। আমার চক্করে পড়া মানে মরা। সমঝতি হি নহিঁ সালি!"

"কিন্তু রিমোটটা?"

"ওহ। ওটা।" দুষ্টু হাসি হাসছে গুলব্দার, "আর্মির সঙ্গে চোদ্দো বছর ধরে কাজ করছি ভাই। আমি চিনে গিয়েছি ইনসানি বমের ট্রিগার দেখতে ঠিক কেমন হয়। প্রথম নজরেই শক হয়েছিল। তাই সরিয়ে রেখেছিলাম। আমার ঘরে না রেখে আরিফার ঘরে রেখেছিলাম বলে খুঁজে পাওনি। আর আফসানা ভাবেইনি এমন হতে পারে। দুশমনকে কখনও বোকা ভাবতে নেই জনাব।" বলতে বলতেই তাড়া দিল, "চলো, বেকার সময় নষ্ট করে লাভ নেই... আর্মিকে সব কথা খুলে বললে তোমার উপকার ছাড়া অপকার হবে না। হারামিরা কখনও-কখনও ভুল করে ভাল কাজ করে ফেলে..."

সে আরও কিছু বলার আগেই কানের কাছে অসম্ভব জোরাল একটা শব্দ! মনে হল পাহাড়ের শিরা বেয়ে সহস্র সফেন সমুদ্র গর্জন করে উঠেছে। শিশমহলে যেন সজোরে কয়েক লক্ষ কাচ ভাঙল! আর কিছু বোঝার আগেই ভীমকল্লোলে ওদের দু'জনের উপরই আকস্মিকভাবে লাফিয়ে পড়ল জলস্রোত, ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওদের দু'জনকে।

ডুবে গেল স্বরাজ!

বাইশ

আজ থেকে চোদ্দো বছর আগে শুরু হয়েছিল 'প্রোজেক্ট বিষপুত্র'।

সবাই ভাবে, যুদ্ধটা শুধু সীমান্তেই হয়। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আর্মি আর জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে যে গোপন যুদ্ধ চলতেই থাকে অবিরাম, তার খোঁজ কেউ রাখে না। শুধু আর্মির লোকেরা জানে এ এমন এক যুদ্ধ যা কখনওই বাইরে প্রকাশ পায় না।

জিহাদি গোষ্ঠী চিরকালীন নিয়ম মেনেই খেলছিল। ওদের কনসেপ্ট ছিল 'বিষকন্যা'র। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের ইনফর্মার করে পাঠাত ওরা। সেই সব বিষকন্যারা তাদের বিষাক্ত রূপ, কাম-কৌশলে আর্মির জওয়ানদের বশ করে ফেলত। আর্মির সব অফিসারের চরিত্রই যে লোহার হবে এমন কোনও কথা নেই। তাই ওদের জালে ফেঁসে যেত অনেক জওয়ান। অনেক ভিতরের তথ্য পাচার হয়ে যেত শত্রুর কাছে! মিথ্যে প্রেমের ফাঁদে পড়ে অনেক জওয়ান খুনও হয়েছে। আর্মির ওপরতলার অফিসাররা বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে এই সুন্দরী গুপ্তচরদের দলকে ঠেকানো যায়।

তখনই অদ্ভুত একটা সুযোগ এসে গেল আর্মির হাতে। বলা যেতে পারে ট্রাম্প কার্ড। অমরনাথ ম্যাসাকারের পর দুই ভাই-বোনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে প্রায় মেরেই ফেলতে যাচ্ছিল প্রতিহিংসাপ্রবণ আর্মি। আচমকা এক বড়সড় অফিসারের চোখ পড়ে গেল ওদের উপর। তাঁর চোখ আটকে গেল দাদাটির দিকে। কী অদ্ভুত বিষাক্ত সৌন্দর্য। এবং অদ্ভুত সহ্যশক্তি। আর্মির লোকেরা ওকে টর্চার করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, অথচ ছেলেটার মুখে কোনও আওয়াজ নেই। ছেলেটির রেকর্ড ঘেঁটে দেখলেন। ছেলেটির অসুস্থ স্ত্রী আর বোন ছাড়া কেউ ছিল না পৃথিবীতে।

তিনি পহেলগাঁও পুলিশ ও আর্মিকে অর্ডার করলেন, "ওই ছেলেটাকে চাই আমার। জিন্দা। বাই হুক অর ক্রুক।"

দায়িত্বপ্রাপ্ত অধস্তন অবাক, "ওকে নিয়ে কী করবেন স্যার? জঙ্গি-টঙ্গি কিন্তু ঠিক নেই!"

আর্মি অফিসার হেসে বললেন, "ওকে ভাল করে দেখেছ তুমি? এতদিন ধারণা ছিল মেয়েরাই শুধু সুন্দর! ওকে দেখে বুঝলাম পুরুষের চেয়ে সুন্দর জীব আর নেই! যেমন চেহারা, তেমনই মুখ। একদম ডিফারেন্ট! পুরুষ হয়েও আমার মাথা ঘুরছে। ভেবে দেখো, মেয়েদের কী হবে। সোচ বদলাও অফিসার! এই লোকটাকেই ট্রেনিং দিয়ে মাঠে নামাব। বিষকন্যাদের ঘায়েল করার জন্য একদম পার্ফেক্ট জিনিস। বিষপুত্র!"

ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে তখনও মুখ এঁটে বসে আছে। কোনও কথারই জবাব দেয় না। কিছুতেই যখন বাঁকানো গেল না, তখন অভিজ্ঞ অফিসার বললেন, "ওর সামনে ওর বোনকে নিয়ে এসো। অবস্থাটা একবার দেখুক।"

এইবার কাজ হল। বোন ততক্ষণে আর্মির গ্যারেপে পাগল হয়ে গিয়েছে। যে ভাই এতক্ষণ একটাও শব্দ করেনি, সে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। অফিসার বললেন, "আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। যা বলছি, তেমন করো। নয়তো আমাদের অনেক জওয়ান আছে। আর তোমার বোনের শরীরে এখনও জান আছে। কিন্তু আর কয়েকদিন পরে থাকবে কিনা বলতে পারছি না!"

ছেলেটা তাঁর পায়ে পড়ে গেল, "যা বলবেন করব স্যার। আমি মরতে রাজি আছি। কিন্তু আমার বোনকে ছেড়ে দিন!"

"মরতে বলছি না," তিনি জবাব দেন, "এখানে সকলেই তোমাকে জঙ্গি ভাবছে। তোমার হাতে একটাই সুযোগ আছে। আমাদের ভুল প্রমাণ করো। প্রমাণ করো যে, তোমার মৃত বাপ, বহিনের স্বামী কেউ জঙ্গি ছিল না। না পারলে তোমাদের দু'জনকে উড়িয়ে দিতে দু'সেকেন্ডও লাগবে না।"

ছেলেটা মেঝেতে মাথা খুঁড়তে থাকে, "করব... সব করব। শুধু বোনকে ছেড়ে দিন। আপনার সব হুকুম সরআঁখো পে। শুধু আমার বোনকে..."

বলতে-বলতেই তাঁর পায়ের উপর অবশ হয়ে পড়ে গেল। অফিসার অর্ডার করলেন, "দু'জনকেই হাসপাতালে পাঠাও। মেয়েটার পরোয়া করি না। কিন্তু ছেলেটাকে আমার চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ করো।"

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। হসপিটালাইজড করার পরেই শুরু হল তার ব্রেনওয়াশ। তাকে বোঝানো হল, আজ থেকে তোমার কেউ নেই। আজ থেকে তুমি আর্মির ক্রীতদাস। যেভাবে ওঠাব উঠবে, যেভাবে বসাব বসবে। যেখানে শোওয়াব শোবে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছে নেই। কাউকে ভালবাসার, বিশ্বাস করার অধিকার তোমার নেই। কোনওরকম দুর্বলতা থাকবে না তোমার। স্ত্রী থেকেও থাকবে না, প্রেম বলে কিছু বুঝবে না তুমি। যে-জিহাদিরা তোমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে, তাদের খতম করাই তোমার জীবনের একমাত্র মানে। তোমার শরীর, মন, মস্তিষ্ক— সব কিছুতে আর্মি ছাড়া আর কারও অধিকার নেই! তুমি কারও নও, ছিলে না কখনও! তোমার একমাত্র পরিচয়, তুমি বিষপুত্র!

ছেলেটা শুধু সম্মোহিতের মতো বলল, "আমি কারও ছিলাম না... কারও নই...!"

অফিসার এর পর হাসপাতালের ডাক্তারদের বললেন, "আই ওয়ান্ট দিস ম্যান টু বি স্টেরিলাইজড!"

ডাক্তাররা আঁতকে উঠল, "কী বলছেন! পেশেন্টের তো কোনও সন্তানই নেই!"

"দরকারও নেই।" তাঁর বক্তব্য, "যাদের সঙ্গে উঠবে বসবে, বাই এনি চান্স তাদের মধ্যে কেউ যদি গর্ভবতী হয়ে যায়? সন্তানের দুর্বলতা কী জিনিস তা আমরা সবাই জানি। সন্তান দিয়েই যে-কোনও পুরুষকে কাত করা যায়। ওই দুর্বলতাটা থাকা চলবে না।"

ডাক্তারদের কিছু করার ছিল না। তবু বিবেক দংশনের খাতিরে অপারেশনের আগে পেশেন্টকে জানিয়ে দিলেন তাঁরা, "তুমি জানো তোমার কী অপারেশন হতে চলেছে? এর পর সারা জীবনেও তুমি

http://boierpathshala.blogspot.com

কখনও বাবা হতে পারবে না।"

ক্লান্ত চোখদুটো মেলে জানিয়েছিল সে, "যা খুশি করুন। আমার কেউ নেই... আমার কেউ নেই... আমি একা।"

এর পরই আর্মি তাকে মাঠে নামিয়ে দিল। এবং হাতে-নাতে ফল পেল। সেই মোক্ষম অস্ত্রে নারী ইনফর্মাররা একের পর এক কাত হতে শুরু করল। তাকে বলা হয়েছিল, শত্রুর শেষ রাখবে না। তোমার ফাঁদে যারা পড়বে, তারা যেন বেঁচে না ফেরে।

সে বিহ্বলের মতো বলে, "আমি মানুষ খুন করতে জানি না।"

"আমরা শিখিয়ে দেব।"

আর্মি এর পর ট্রেনিং দিয়ে তাকে খুনিও বানিয়ে দিল। চোদ্দো বছর ধরে সেই জিদ্দি লোকটা বারবার প্রমাণ করে এসেছে যে, তার আব্বু জঙ্গি ছিল না। সে জঙ্গি নয়, তার বোন জঙ্গি নয়!

বলাই বাহুল্য, লোকটার নাম গুলজার আহমেদ পাঠান!

অসম্ভব রাগে ও ক্ষোভে জ্বলে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন দত্তা। মেজর ভার্মা তাঁর মুখের দিকে আলতো দৃষ্টিপাত করলেন, "কন্ট্রোল ইওরসেলফ ক্যাপ্টেন। এত রেগে যাচ্ছ কেন? গুলজার আহমেদই আমার খাস ইনফর্মার। বিষপুত্র।"

"এটা কী স্যার?" অসম্ভব জ্বালায় বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন, "এতখানি নিষ্ঠুরতা। এতদিন ধরে শুনে আসছি জিহাদিরা নিরুপায় মানুষগুলোকে ব্ল্যাকমেল করে ব্যবহার করে। এখন দেখছি আর্মিও কিছু কম যায় না। একটা নিরুপায়, অসহায় মানুষ— তাকে এত বড় শাস্তি কিসের জন্য দিলেন?"

"ওটা আমার ডিসিশন ছিল না। হাইকমান্ডের ব্যাপার। তাদের রণনীতি।" মেজর নিরুত্তাপ স্বরে বললেন, "এবং এখনও পর্যন্ত দারুণভাবে সফল।"

"হাইকমান্ডের রণনীতি।" তিনি বলেন, "হাইকমান্ড কি নিজের কোনও কাছের মানুষের এই পরিণতি ভাবতে পারবে?" তাঁর গলায় অব্যক্ত যন্ত্রণা, "একটা মানুষ যে আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো বেঁচে থাকতে চাইছিল, তার হৃদয়ে হয়তো কখনও ভালবাসা ছিল, ভালবাসার প্রয়োজনও ছিল, তাকে আপনারা কী বানিয়ে দিলেন স্যার? একেই জিহাদিরা তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার ওপর আর্মি তার কফিনে শেষ পেরেকটাও ঠুকে দিল। যাকে ভালবাসে, তার কাছে যাওয়ার উপায় নেই। তার কাছেই যেতে হবে যাকে ভালবাসে না। যদি কোনওভাবে দুর্বলতা এসেও যায়, তবু তাকেও গলা টিপে মারতে হবে। জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ, বাবা হওয়া..." ক্যাপ্টেনের গলা কাঁপছে, "আপনার তো নিজের ছেলে মেয়ে আছে স্যার। বাবা হওয়ার মানে আপনি জানেন..."

"উপায় ছিল না ক্যাপ্টেন। শত্রুকে শত্রুর চালেই মাত করতে হয়। 'লোহা হি লোহে কো কাটতা হ্যায়।'"

"ও বোড়ে নয় স্যার।" ক্যাপ্টেন প্রচণ্ড ক্ষোভে বলে, "একটা মানুষ। লোহার তৈরিও নয়। আগে ভেবেছিলাম ওর বোনটা সবচেয়ে দুর্ভাগা। এখন দেখছি, আরিফার চেয়েও বদতর জিন্দগি দিয়েছেন আপনারা গুলজারকে। জীবন্মৃত করে রেখেছেন। যদি পুরোটাই স্ট্র্যাটেজি হয়, তবে জঙ্গিদের সঙ্গে আর্মির পার্থক্য কোথায়?"

"কোনও পার্থক্য নেই। এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।" মেজর চুরুটে টান দিয়ে বললেন, "আমাদেরও কিছু করার নেই। উই হ্যাভ পেইড দেম ব্যাক ইন দেয়ার ওন কয়েন।"

"আর সেই পেব্যাক একটা লোককে চোদ্দো বছর ধরে একটু-একটু করে শেষ করে আসছে। চোদ্দো বছর ধরে সে প্রমাণ করেছে যে, তার আব্বু জঙ্গি ছিল না। তারপরও ওর মুক্তি নেই।" ক্যাপ্টেন দত্তা ফাইলটা মেজরের টেবিলে রেখে বললেন, "থ্যাঙ্কস স্যার। কিন্তু এই ফাইলটার কথা আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যেতে চাই। নয়তো আর্মির উপরে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলব।"

"নো ক্যাপ্টেন," মেজর বলেন, "এখনও একটা কাজ বাকি আছে। তোমাকে আমি এমনি-এমনিই ফাইলটা পড়তে দিইনি। দরকার আছে। ক্লজ অনুযায়ী 'বিষপুত্র' ততক্ষণই বেঁচে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ তার পরিচয় জানতে পারছে। এতদিন লোকটা ধরা পড়েনি। কিন্তু এবার জিহাদিদের এজেন্ট ওকে চিনে ফেলেছিল। নিশ্চয়ই ওপর মহলে সে জানিয়েছে যে, গুলজার আহমেদ আর্মির খবরি। জঙ্গিরা ওকে তুলে নিতে পারে। যেমন ভাবে আমরা ওকে বাধ্য করেছিলাম আমাদের হয়ে কাজ করতে, তেমন ভাবেই হয়তো আমাদের গুপ্ত খবরগুলো বের করে নেবে। ওকে আর বাঁচিয়ে রাখার রিস্ক নিতে পারি না আমরা। সো..."

ক্যাপ্টেন বজ্রাহতের মতো বসে পড়লেন। কোনওমতে বললেন, "ও জানে?"

"জানে। নিজেই জানিয়েছে যে, ওর পরিচয় পেয়ে গিয়েছে প্রতিপক্ষের খবরি।"

মর্মান্তিক কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, "বাট হোয়াই মি?"

চুরুটের দগ্ধাবশেষ অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়েছেন মেজর, "কারণ এটাই গুলজারের একমাত্র স্বাধীন ও শেষ ইচ্ছে। সে নিজেই নিজের ঘাতককে বেছে নিয়েছে। ও তোমার হাতেই মরতে চায়।"

ক্যাপ্টেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল। একজন জওয়ান উন্মাদের মতো দৌড়তে-দৌড়তে এসে ঘরে ঢুকল, "সত্যনাশ। ঝিলম নদী ভেসে গিয়েছে স্যার। বান আসছে।"

শিশমহলে তখন বন্যা তাণ্ডব চালাচ্ছে। অজস্র নারী-পুরুষের আর্ত-চিৎকারে ভরে উঠেছে চতুর্দিক। কিছু বোঝার আগেই জলের তোড় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কাউকে। কেউ প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভেসে ওঠার আগেই তার মাথার উপরে শিশমহলের কাঠের বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। বয়স্ক মানুষগুলো একজনও বাঁচেনি। কলকল খলখল করে মৃত্যু হেসে উঠছে বারবার। শিশমহলের কাঠের বাড়িগুলোকে এক ধাক্কায় চুরমার করে ভেঙে দিয়ে তীব্র গতিতে তাণ্ডব করছে বন্যা।

স্বরাজও ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছিল। গুলজারকে জল কোথায় টেনে নিয়ে গেছে তার জানা নেই। একটু আগেই দেখল কল্লু আর্ত চিৎকার করতে-করতে ভেসে যাচ্ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল বাচ্চা ছেলেটাকে টেনে আনার। কিন্তু পারেনি। নিজেই বারবার হাঁকপাক করে ভেসে উঠছে, ফের ডুবে যাচ্ছে।

মানুষের আর্তচিৎকারের মধ্যেই স্পষ্ট শোনা গেল আর্মির হুইসল। আর্মি বোট রেসকিউ অপারেশনে নেমে পড়েছে। সে অবাক হয়। এত তাড়াতাড়ি। স্বরাজ প্রাণপণ চেষ্টায় ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, ওই তো জ্বলে উঠেছে আর্মির ফ্ল্যাশ লাইট। ঊর্ধ্বে পরা জওয়ানরা বোট নিয়ে চলে এসেছে। হাত ধরে টেনে-টেনে তুলছে জলমগ্ন আর্ত লোকগুলোকে। ঝিলম নদী বৃষ্টির তোড়ে খেপে গিয়েছে। বিপদসীমা ছাপিয়ে উঠে এসেছে ৪.৪০ মিটার ওপরে। ডিসচার্জ রেট যেখানে পাঁচিশ হাজার কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড ছিল, সেখানে এখন সত্তর হাজার কিউবিক মিটার পার সেকেন্ডে দাঁড়িয়েছে। লিডার, চেনাব হয়ে উঠেছে বিধ্বংসী। এক ঝটকায় ভাসিয়ে দিয়েছে পঞ্চশটারও বেশি ব্রিজ। দিল্লি থেকে মুহুর্মুহু ফোন আসছে। দশ ব্যাটেলিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, তিনশো উনত্রিশ কলাম আর্মি, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ফোর্স— সবাইকে নামিয়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। দিল্লি থেকেও সাপোর্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী নাকি স্বয়ং স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'সব বোট, হেলিকপ্টার নামাও। কম পড়লে দিল্লি থেকে আরও সাপোর্ট যাবে। জান লড়িয়ে দাও। তবু কমসে কম ক্যাসুয়ালটি চাই আমার।'

অতএব হুকুম মেনেই জান লড়িয়ে দিচ্ছে আর্মি ও বি এস এফ। একের পর এক আর্মি বোট নেমে পড়েছে বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষগুলোকে টেনে তোলার জন্য। অনেক জওয়ান জলের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডুবন্ত মানুষগুলোকে জলের ঘূর্ণি থেকে বাঁচাতে। আর্মির ডুবুরিরা জলের তলা তোলপাড় করে খুঁজছে কোনও জীবন্ত

অফিসার বললেন, "আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। যা বলছি, তেমন করো..."

মানুষকে। বলা যায় না, যদি তলিয়ে যাওয়া কাঠের বাড়ির ভিতরের ঘুমন্ত মানুষগুলো কোনওভাবে চাপা পড়ে থাকে। যদি একজনও বেঁচে থাকে...

প্রাণপণ চেষ্টায় বারবার ভেসে উঠতে-উঠতে এই দৃশ্যগুলো দেখছিল স্বরাজ! হায় লালা! এখন কোথায় তোমার কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধা! কাশ্মীরকে উদ্ধার করতে চাও না তোমরা? কাশ্মীরি ভাই-বোনের দুঃখে সব সময়ই প্রাণ কাঁদছে তোমার! এই মুহূর্তে তোমার ভাই-বোনেরা চরম বিপদে। এখন কাশ্মীরের বিপন্ন মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য যে হাতগুলো এগিয়ে আসছে, সে হাত তোমার নয়, কোনও জিহাদির নয়। সে হাত সেই চূড়ান্ত অত্যাচারী আর্মির! তুমি, শ্রীমান স্বঘোষিত দেশপ্রেমী হয়তো এখন নরম বিছানায় আরামে ঘুমোচ্ছ! আর এদিকে নিজেদের প্রাণের তোয়াক্কা না করে চিরশত্রু জওয়ানরা কাশ্মীরের মানুষগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে! এরপরও তুমি বড় বড় ডায়লগ ঝাড়বে! কী হাস্যকর!

স্বরাজ ক্রমাগত জলের তোড়ে ডুবে যাচ্ছিল। জল এখনও গুবগুবিয়ে বাড়ছে। সে তলিয়েই যাচ্ছিল! আচমকা দুটো হাত তাকে পিছন থেকে জাপ্টে ধরল! সে হাত সেনাবাহিনীর এক জওয়ানের। শক্ত হাতে তাকে জলের উপরে টেনে তুলতে-তুলতেই বলল, "ডর মত! আ জা!"

পিক!

ভয়ার্ত চোখে জওয়ানের দিকে তাকাল স্বরাজ। গুলজার তাকে রিমোটটা দেওয়ার পর সে পকেটে রেখে দিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল, আত্মসমর্পণ করার সময় আর্মির হাতে তুলে দেবে! কিন্তু এই জওয়ানটি যখন পিছন থেকে তাকে জাপ্টে ধরল, তখনই অজান্তে ট্রিগারে চাপ পড়ে গিয়েছে! স্বরাজ উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, "হ-টো! ন-হি! ন-হি!"

বলতে-বলতেই জওয়ানটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সে ডুব মারল জলের মধ্যে। যতখানি গভীরে যাওয়া সম্ভব, চলে গিয়েছে স্বরাজ! না, আর ভয় করছে না তার! বরং হাসি পাচ্ছে! ঈশ্বর একেবারে পাকা গণিতজ্ঞ! আর কারও কাজে আসবে না সে! আর কেউ তার জীবনের দাঁও লাগাবে না! তার মজবুরির ফায়দা তুলতে পারবে না! স্বরাজ আর কারও নয়! না লালার, না আর্মির!

কয়েক মুহূর্ত যেন চতুর্দিকে সব স্থির হয়ে গেল! তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ!

বিস্ফোরণের আওয়াজটা ক্যাপ্টেন দত্তার কানেও গিয়েছিল। তিনি তখন রেসকিউ অপারেশনে ব্যস্ত। একের পর এক আর্মি বোট তখনও নেমে চলেছে। চলে এসেছে হেলিকপ্টারও। জলমগ্ন মানুষগুলোকে টেনে তোলাই এখন একমাত্র উদ্দেশ্য ওদের।

এমন সময়ই জোরাল আওয়াজ! তিনি চমকে উঠলেন!

"বোমা ফাটল সাব!" একটা পরিচিত মানুষ তার বোটের সামনে এসে ভাসছে। তার কোলে এক দশ বছরের শিশু। কনোয়ালজিৎ শেরগিল ওরফে কন্নু!

"গুলজার! তুমি!" বিস্ময়ে হতবাক ক্যাপ্টেন দত্তা! তিনি এতক্ষণ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিলেন, বন্যায় যেন ও ভেসে যায়। যেন ডুবে যায়... মরে যায়...

বিস্ফোরণের শব্দ লক্ষ করে সেদিকেই তাকাল গুলজার। স্বরাজ জলের ভিতরে ডুবে গিয়েছিল বলে বোমা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। জ্বলে ওঠার আগেই বন্যার জলের তোড়ে নিভে গেছে!

"ইনসানি বম। ও আত্মসমর্পণ করতেই যাচ্ছিল। আপনাদের আমি এত্তেলা করতেই যাচ্ছিলাম। তার আগেই..." কথা বলতে-বলতেই কন্নুকে নৌকোয় তুলে দিল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জিন্দগি ঔর মৌত উপরওয়ালে কে হাথ হ্যায় জাহাঁপনা, জিসে ন আপ বদল সকতে হ্যায়, ন ম্যায়। হম সব তো রঙ্গমঞ্চ কি কটপুতলিয়াঁ হ্যায়, জিসকি ডোর উপরওয়ালে কে হাথ বন্ধি হ্যায়। কহাঁ, কৌন, কেইসে উঠেগা কোই নহি

http://boierpathshala.blogspot.com

জানতা।"

ক্যাপ্টেন হাঁ করে তার কথা শুনছিলেন। এ কী! ও আবার ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠল কবে থেকে! গুলজার তাঁর মুখ দেখে হেসে উঠল, "চমকাবেন না! এটা আমি বলছি না! এটা 'আনন্দ' ফিল্‌মের ডায়লগ!" সে এবার আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠে আসে, "একটু দেরি হল সাব। মাফ করবেন। ভরত আর ওর বউকে টেনে তুলে আর্মির হাওয়ালে করেছি। নার্গিসকেও রেখে এসেছি নিরাপদে। কন্নুকেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই দেরি হল। ছেলেটাকে ওর বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন সাব?"

ক্যাপ্টেনের কষ্ট হচ্ছিল, তবু মাথা নাড়লেন।

'তাহলে কাম খতম করা যাক,' গুলজার মৃদু হাসল, "অর্ডার পেয়েছেন তো?"

দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। অর্থাৎ পেয়েছেন।

"কন্নু বেহোশ। এই ফাঁকেই কাজ সেরে ফেলুন সাব।" সে মৃদুস্বরে বলল, "আমি চাই না ও এসব দেখুক।"

ক্যাপ্টেন দত্তার হাত কাঁপছিল। তবু তিনি রাইফেলটা তুলে ধরলেন ওর বুক লক্ষ করে। গুলজার ফিক করে হেসে ফেলে, "একটাতে হবে না সাব। দু'তিনটে মারুন। আপনার হাত কাঁপছে!"

ক্যাপ্টেন এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন গুলজারের দিক থেকে। তাঁর বন্ধ চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। আঙুল যেন কয়েকমণ ভারী। তবু শ্বাস বন্ধ করে ট্রিগারে চাপ দিলেন। গর্জে উঠল অটোম্যাটিক রাইফেল!

"আ!" গুলজার পরম শান্তিতে চোখ বুজল। নৌকো থেকে টাল খেয়ে জলে পড়ে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন ব্যাকুলভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ ততক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চোখ বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরে পড়ল মৃত্যুপথযাত্রীর কপালে।

"বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া/ থোড়া থোড়া নহিঁ, পুরা পুরা।" গুলজার যেন পরম শান্তি পেয়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু বলল, "আপনার বাপুর বাহোঁ মেঁ আমার জিন্দগি ছিল। আর আপনার ব্যাহোঁ মেঁ মওত। ছোটি সি বাত পে লোগ রুঠ যাতে হ্যায়,/ অনজানে সে দিল টুট যাতে হ্যায়/ কহতে হ্যায়, বড়ি নাজুক হ্যায় অপনেপন কা রিশ্তা,/ ইসমে হসতে হসতে জান ভি ছুট যাতে হ্যায়..."

"গুলজার!" দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবার আর্তকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন দত্তা, "আই অ্যাম সরি... আই অ্যাম সরি!"

"সরি! কেন?" সে হাসবার চেষ্টা করে, "আজ আমার জশন মানানোর দিন। এই জন্মে হল না, পরের বার দোস্তি পাক্কা। আজ তো ওই খুদাকেও আমি মাফ করে দেব!" বলতে-বলতেই চোদ্দো বছরে যে কথা উচ্চারণ করেনি, সেই শব্দটাই শেষ মুহূর্তে উচ্চারণ করল, "খু-দা হা-ফে-জ!"

একটু পরেই ভোর হল। সেনাবাহিনী তখনও সমান বিক্রমে লড়ে যাচ্ছে বন্যার সঙ্গে। মাথার ওপর ফটফট শব্দে উড়ছে হেলিকপ্টার। একদল আর্মি বোট বন্যার্তদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে, আবার একদল আর্মি বোট ত্রাণকার্যে নেমে পড়ছে। ডাল লেক ভেসে গিয়েছে। ভেসে গিয়েছে শ্রীনগরের রাস্তাঘাট। শিশমহল যেখানে ছিল, সেখানে আর কিছু নেই। সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। হাউজবোটগুলো সব উলটে গিয়েছে। মীনাবাজার শপিং কমপ্লেক্স কয়েক হাত জলের তলায়!

শিশমহল! কাচের ঘর! তার চতুর্দিকে দুর্বৃত্তেরা আধলা ইট নিয়ে সব সময়ই সুযোগের অপেক্ষা করছে। সবসময় যুদ্ধ চলছে তলে-তলে। এরপরও এই যুদ্ধ থামবে না। অশুভ শক্তির প্রচেষ্টা থামবে না। মারামারি-খুনোখুনি চলবেই। এরপরও অনেক বিষকন্যা, বিষপুত্র প্রাণ দিয়ে দেবে অন্যের স্বার্থে! অনেক নিরীহ মানুষ জিহাদি সন্দেহে মারা যাবে। অনেক জওয়ান মরবে সীমান্তে!

তবুও শান্তি ঠিক নিজের মতো জায়গা করে নেবে, ভালবাসা থাকবে, প্রেম-বন্ধুত্ব-বিশ্বাস থাকবে। ধর্মের ভেদাভেদ থাকবে না! আজ স্বরাজ মরে গিয়ে প্রমাণ করল, আতঙ্কবাদের পথে ঈশ্বরকে নেওয়া যায় না, কারণ ওই পথে কোনও মজহব, কোনও ধর্ম, কোনও ঈশ্বর নেই! স্বরাজ আর যাই হোক লালার ধর্মের লোক নয়! গুলজার প্রাণ দিয়ে জানিয়ে গেল, জীবনের সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার পরেও একটা জিনিস কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। মনুষ্যত্ব! সে সব ধর্মের উর্ধ্বে! নিজের প্রাণ দেওয়ার আগে সে ভরত শেরগিলের পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

সবেমাত্র নরম সোনালি রঙের আলো এসে পড়ল শিশমহলে। ক্যাপ্টেন তখনও গুলজার আহমেদের মৃতদেহ কোলে করে বসেছিলেন। তার অপূর্ব মুখের ওপর এসে পড়েছে সোনালি আভা। ক্যাপ্টেনের মনে হল সদ্যছিন্ন অপাপবিদ্ধ হিমযুঁই পড়ে আছে। তিনি দুই বাহুতে তুলে নিয়ে দেহটাকে ভাসিয়ে দিলেন জলে। গুলজারের দেহ পরম আদরে টেনে নিল শিশমহলের জল!

'হাম তো ঘর সে নিকলে হি থে বান্ধকর সর পে কফন,
জান হথেলি পর লিয়ে লো বঢ় চলে হ্যায় ইয়ে কদম।
জিন্দগি তো আপনি মেহমাঁ মৌত কি মেহফিল মে হ্যায়!
সরফরোশি কি তমন্না অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়,
দেখনা হ্যায় জোর কিতনা...'

অঙ্কন: সুমিত্র বসাক

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com